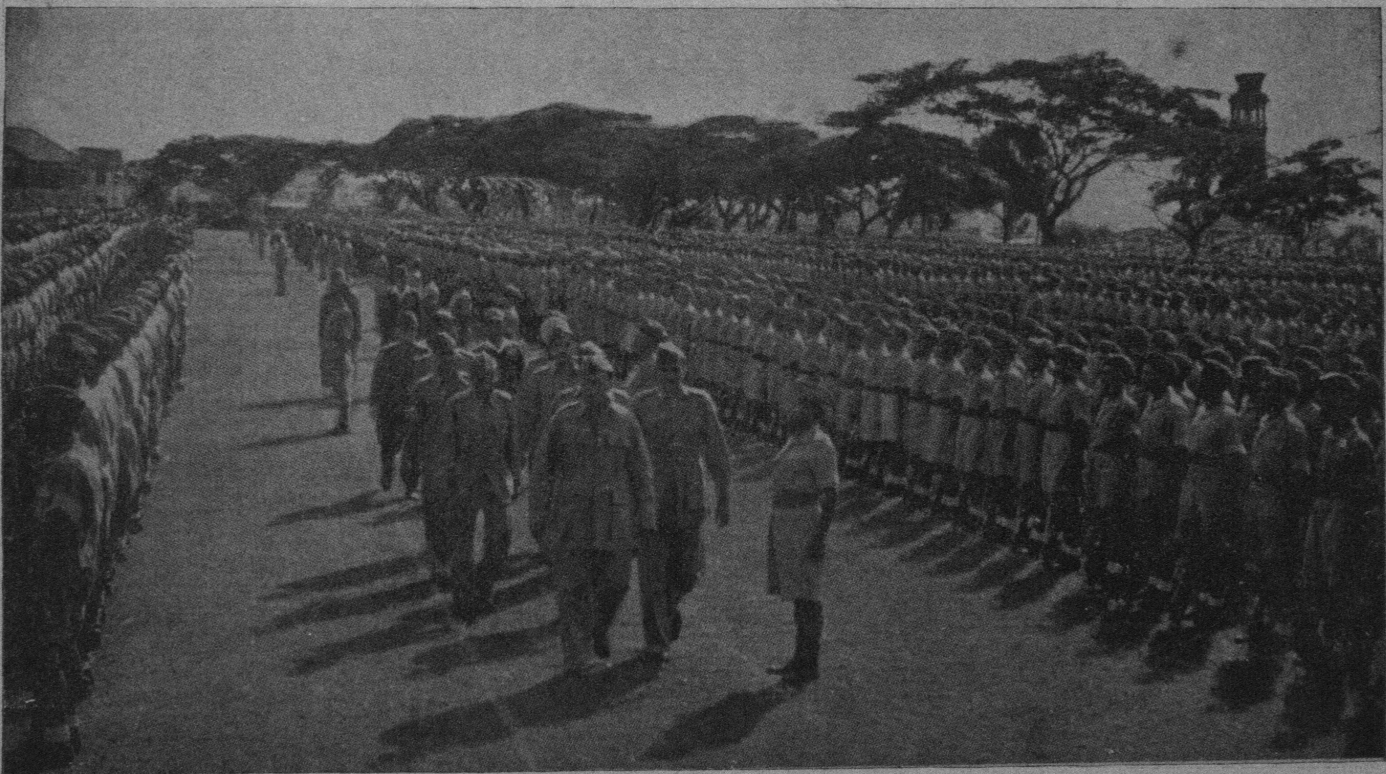
প্রথম প্রকাশ : ১৭ ফালগুন, ১৩৬৭

প্রকাশক : প্রশান্ত তালুকদার
মৌসুমী সাহিত্য-মন্দির
১৫/বি, টেমার লেন
কলিকাতা—৭০০০০৯

গদাধর প্রিন্টার্স
৪১/ডি/১০৩, মুরারিপুকুর রোড
কলিকাতা—৭০০০৬৭



আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শনরত নেতাজী। পাশে শাহ্‌নাওয়াজ খাঁ সহ অন্যান্য সমরনায়কবৃন্দ।

॥ নিবেদন ॥

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ইতিহাসে এক বিস্ময়কর কিংবদন্তী। তাঁর দেশপ্রেম, শৌর্য, বীর্য, ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্বের বহুমুখী কাহিনী নানাভাবে প্রচলিত। ফলে কখনো আবেগ-উচ্ছ্বাসে তা অতিরঞ্জনের দোষে পুষ্ট হয়েছে, আবার কখনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই মহান দেশপ্রেমিকের জীবনেতিহাসের অনেক মহিমাময় ঘটনার বিকৃতি ঘটেছে। ইতিহাসের স্বার্থেই এই মহাজীবনের তথ্যভিত্তিক মূল্যায়ণ প্রয়োজন।

স্বদেশে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক তৎপরতার ইতিহাস বহুল পরিচিত। দেশান্তরী হয়ে সুভাষচন্দ্র যখন নেতাজীরূপে প্রতিষ্ঠিত পরিচিত, সেই অধ্যায়ের বহু তথ্য এখনও অজ্ঞাত। অথচ ভারতের এই মহান সন্তানের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব নিয়ে বিদেশের বহু বিশেষজ্ঞ গবেষণায় ব্রতী। অজ্ঞাতপ্রায় সেইসব ইতিহাস সংগ্রহে আমরাই বরং অনেকাংশে পেছিয়ে।

আফগানিস্তানের পাহাড়ি সীমান্ত পেরিয়ে সুভাষচন্দ্র যে দুঃসাহসিক ও দুর্গম অভিযান করেছিলেন, তার প্রথম ধাপে তিনি মস্কোয় পৌঁচেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বৃটেনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালানোর পরিকল্পনায় তিনি প্রথমেই সাম্যজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়ার শরণাপন্ন হন। কমরেড স্তালিনের সঙ্গে সাক্ষাতের মানসে তিনি দু' দিন মস্কোয় প্রতীক্ষাও করেন কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্রুত বিস্তৃতি ও অস্থিরতা সুভাষচন্দ্রকে অধীর করে তোলে। নিরুপায় সুভাষচন্দ্র এবার তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে দ্বিতীয় যাত্রাপথ ধরেন। বৃটেনের বিরুদ্ধে জার্মান জাপান তখন ঐ লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ। শত্রুর শত্রুকে মিত্ররূপে কাজে লাগাতে সুভাষচন্দ্র মস্কো ছেড়ে রাতারাতি বার্লিনে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে শুরু হয় নতুন তৎপরতা। খোদ বার্লিন সহরে পরাধীন ভারতবর্ষের প্রথম সামরিক বাহিনীর প্রতিষ্ঠা করে সুভাষচন্দ্র নেতাজীরূপে অভিষিক্ত হন। তাঁর নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হিটলার তাঁকে সর্বরকম সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন রোম থেকে ইতালীর প্রেসিডেণ্ট মুসোলিনীও। কিন্তু ভারতবর্ষের মুক্তি যার মূল স্বপ্ন, স্বদেশ চিন্তায় বিভোর সেই নেতাজী সকল শর্ত ও নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে থেকে সখ্যতা বজায় রেখে জার্মানীতে বসেই মুক্তি অভিযানের প্রস্তুতিপর্ব সমাধা করেন।



আজাদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজের পর সাঁজোয়া বাহিনীর অভিনন্দন গ্রহণ করছেন নেতাজী।

বিশ্ব পরিস্থিতি এবং যুদ্ধ বিস্তারের গতিবিধি খতিয়ে যখন নেতাজী বুঝলেন, হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসী বাহিনী রাশিয়ার উপর আক্রমণের পরিকল্পনা করছে, তিনি তখন তাঁর তৃতীয় পর্যায়ের যাত্রাপথ স্থির করে ফেললেন। তার আগে জার্মানীতে গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের উদ্দেশ্যে গোপন নির্দেশ দেন ঃ ভরতের মুক্তি ফৌজ কেবলমাত্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। অন্য কোনও দেশের স্বার্থে তারা যেন অস্ত্র না ধরেন। এরপরই ইউরোপ ছেড়ে এশিয়ার পথে তাঁর গোপন যাত্রা। তিন মাসব্যাপী দুঃসাহসিক ও ঐতিহাসিক সাবমেরিন যাত্রা শেষে নেতাজী অতঃপর জাপান পেঁছুলেন। সেখানে আবার তৎপরতা। এশিয়ার মাটিতে পেঁছেই তিনি দক্ষিণপূর্ব এশিযায় ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সহায়তায় ভারত অভিযানের চূড়ান্ত পরিকল্পনা নেন। নেতাজী জাপানে উপস্থিত হওয়ার আগেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গণে বৃটিশ বাহিনী জাপ সেনাদের হাতে পযুদস্ত হতে শুরু করে। বৃটেনের দম্ভের দুর্গ সিঙ্গাপুরেরও পতন ঘটে। জাপ প্রধানমন্ত্রী তোজো এবং পদস্থ সামরিক অফিসারদের সঙ্গে নেতাজীর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। নেতাজীর বক্তব্য, পরিকল্পনা এবং রণকৌশলে মুগ্ধ জাপ কর্তৃপক্ষ নেতাজীর অনুরোধে সার্বিক সহায়তার জন্য এক চুক্তিতেও আবদ্ধ হন।

দেশান্তরী সুভাষচন্দ্রের নেতাজীরূপে প্রতিষ্ঠা, তাঁর দূরদর্শিতা, ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব, রণকৌশল ইত্যাদির তথ্যভিত্তিক ঘটনাপ্রবাহ সাজাতে দেশবিদেশের বহু গ্রন্থ, সরকারি দলিল, এবং ব্যক্তি বিশেষের সাহায্য নিয়েছি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কিউরেটর সেক্রেটারি প্রবীন ঐতিহাসিক ডঃ নিশীথ রঞ্জন রায় সহ ডাঃ অমিয় কুমার চক্রবর্তী, বীরেন সিমলাই, প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী জিতেন ভট্টাচার্য, যীশু চৌধুরী, প্রদীপ চৌধুরী, সমর মণ্ডল প্রমূখের সহায়তার জন্য তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। গ্রন্থের আলোকচিত্রগুলির জন্য বন্ধুবর শিবপ্রসাদ ঘোষ এবং প্রীতিভাজন রাজীব বসুর সহযোগিতাও অসামান্য। প্রকাশক বন্ধু প্রশান্ত তালুদারের ধৈর্য ও সহায়তা প্রশংসার দাবি রাখে।

এই পর্বে দেশান্তরী সুভাষচন্দ্রের রাশিয়া-জার্মানী হয়ে জাপান অভিযান এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনা প্রবাহের উল্লেখ আছে। পরবর্তী পর্বে পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গণে নেতাজীর তৎপরতা, রণকৌশল ও নেতৃত্বের আনুপূর্বিক ঘটনা ও তার নেপথ্য কাহিনী উত্থাপন করার ইচ্ছা রাখি।

—রমেন দাস

অভিন্নপ্রাণ

রজতকান্তি —রক্তিমের

করকমলে—

AZADHINDER SESH LARAI

By

Ramen Das

আজাদ হিন্দের শেষ লড়াই

এক ঝাঁক বোমারু বিমান সিঙ্গাপুরের আকাশে আচমকা একটা চক্কর খেয়ে নিমেষে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। তখনও আকাশ জুড়ে উৎকণ্ঠিত মানুষের উৎসুক দৃষ্টি। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রের ঝলকেও পলক না-পড়া হাজার চোখের মিছিল এসে ভীড় জমাল। সকলেই তারা নিঃশঙ্ক, নিরাতঙ্ক।

অথচ কী আশ্চর্য, মাত্র কিছুদিন আগেও বিমানের শব্দ পেলে সিঙ্গাপুরের আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ মহা-উদ্বেগে নিরাপদ কোনও আশ্রয় অথবা নিকটতম ট্রেঞ্চের সন্ধানে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে পালাত। চোখেমুখে ফুটে উঠত মৃত্যুর আতঙ্ক, আর ধ্বংসের আশঙ্কা। বৃটিশ বাহিনীর মারমুখী ধ্বংস-যজ্ঞ সিঙ্গাপুরবাসীকে চরম বিপর্যয়ের প্রান্ত সীমায় ঠেলে দিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মৃত্যুমাতাল দিনগুলি শুধুমাত্র সিঙ্গাপুরের কেন, পূর্ব-এশিয়ার সকল মানুষের কাছেই দুঃস্বপ্নের অন্ধকার ছড়িয়ে দিয়েছিল।

১৯৪৩ সাল, ২রা জুলাই। এদিনটা সিঙ্গাপুরের মানুষের কাছে নতুন যুগের এক ইতিহাসের দুয়ার খুলে দিল। সকলেই নির্ভয় নির্ভীক, মৃত্যুভয়মুক্ত। বীরের মত হাসিমুখে শীতল মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেও তারা আর কুণ্ঠিত নয়।

সিঙ্গাপুরের সাধারণ মানুষ এদিন খুব ভোর থেকে বিমান বন্দরের আশে-পাশে জড়ো হতে শুরু করল। সরকারীভাবে যদিও কোন ঘোষণা আগে থেকে প্রচার করা হয়নি, তবু আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের শীর্ষ অফিসার আর নেতাদের আনাগোনা তাদের মনে অদম্য এক বিশ্বাস এনে দিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের সতর্ক প্রস্তুতি দেখে তারা স্পষ্টই বুঝতে পারল, নেতাজী সুভাষ হয়তো সিঙ্গাপুরে আসছেন।

এছাড়া আরও একটি ঘটনার কথা তাদের জানা ছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম হোতা এবং প্রবীন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু সিঙ্গাপুর থেকে জাপানের রাজধানী টোকিও যাত্রা করেছেন। যাত্রার আগের রাত্রে, অর্থাৎ ২রা জুন তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের পদস্থ অফিসারদের তাঁর বাসভবনে এক ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানান। রাসবিহারী বসুর হঠাৎ টোকিও যাত্রার খবর শুনে তাঁরা কৌতূহল প্রকাশ করলে তিনি হাসি মুখে শুধু বলেন: আপনাদের জন্য বিশেষ একটি উপহার আনতেই টোকিও যাচ্ছি।

তারও প্রায় এক পক্ষকাল পরের কথা। তারিখটা ১৯৪৩ সালের ২০ জুন। জাপানের টোকিও বেতার কেন্দ্র ঘোষণা করল: নেতাজী বসু বার্লিন থেকে টোকিও এসে পৌঁছেছেন।

বার্লিন থেকে টোকিও আসবার দুর্গম পথে তাঁর সহযাত্রী এবং দেহরক্ষী হয়ে আসেন আর এক ভারতীয় মুসলিম তরুণ। নাম তাঁর আবিদ হাসান।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ-শক্তি বিরোধী শ্রেষ্ঠবিপ্লবী সুভাষচন্দ্রকে জাপানের নাগরিকরা বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানিয়েছে···ইত্যাদি

পর পর এতসব সংবাদ আর ঘটনায় সিঙ্গাপুরের মানুষের মনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আগমন সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয় জন্মেছিল। তাই বেলা যতই বাড়ল, সিঙ্গাপুরের বিমান বন্দরের চারপাশে জনতার স্রোতও ততই গভীর হতে লাগল।

বেলা তখন প্রায় এগারোটা। পর পর কয়েকখানা সামরিক গাড়ি বিমান বন্দরের সংরক্ষিত এলাকায় ঢুকল। গাড়িগুলি থেকে সামরিক পোষাকপরা কয়েকজন আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্মকর্তার সঙ্গে জাপানী রাষ্ট্রদূতও নামলেন। উৎসুক জনতা দেখল, তাদের অদূরে বিমান বন্দরের চত্বরে বিরাট এলাকা জুড়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েক হাজার সেনা সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে, গার্ড অব অনার জানাতে। তারই সামনের সারিতে আরেকদল রক্ষী অ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়িয়ে। সমাগত অফিসাররা সমবেত সেনা বাহিনীর তদারক শেষ করলেন। বিমান বন্দরের চারদিকে তখন বিরাট জনতার মহাসমুদ্র।

দেখতে দেখতে ঘড়ির কাটা এগিয়ে চলল। কাটায় কাটায় তখন প্রায় বারোটা। হঠাৎ . জনসমুদ্র উত্তাল। আনন্দ উচ্ছ্বাসে চারদিক মুখর। সকলের উৎসুক দৃষ্টি তখন নীল আকাশে। প্রথমে অস্পষ্ট। তারপর বিমানের শব্দ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হল। গ্রীষ্মের আকাশের ভাসমান হালকা সাদা মেঘের বুক চিরে বেরিয়ে এল দুই ইঞ্জিনের ছোটখাটো একটি জাপানী বিমান। দু' একবার পাক খেয়ে তা নেমে পড়ল সিঙ্গাপুরের মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে সামরিক ব্যাণ্ডে বেজে উঠল জাতীয় সঙ্গীত। চারদিকে পুষ্পবৃষ্টি আর করতালি। বিরাট জনসমুদ্র নেতাজী সুভাষের জয়ধ্বনিতে বার বার গর্জন করতে লাগল। গ্রীষ্মের আকাশ বাতাসও বুঝি থমকে দাঁড়াল। তারপর আবার শান্ত। বিশাল জনসমুদ্রে আবার নেমে এল প্রশান্তি আর প্রতীক্ষা।

বিমানের দরজা খুলে নেমে এলেন সুভাষচন্দ্র। ঠিক তাঁর পেছনে সহকারী আবিদ হাসান। তারপর এক এক করে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, কর্ণেল ইয়ামাসোটা, জাপানী এক পদস্থ অফিসার সেগুাও বিমান থেকে নেমে এলেন। তাঁরাও নেতাজীর সহযাত্রী হয়ে জাপানের রাজধানী টোকিও থেকে সরাসরি সিঙ্গাপুরে এসেছেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র !

চারদিকে আবার জয়ধ্বনি। সামরিক ব্যাণ্ডে মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী সুর। পৌরুষদীপ্ত সুভাষচন্দ্রের পরণে বাদামী রঙের অসামরিক পোষাক। মাথায় সাদা রঙের গান্ধী টুপি, আর চোখে মুখে ভরা প্রদীপ্ত হাসি।

সুভাষচন্দ্র এবার এগিয়ে গেলেন গার্ড অব অনার গ্রহণ করতে। আগে থেকেই আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্মানসূচক রক্ষীদল তার জন্য তৈরী হয়েছিল। ঘুরে ঘুরে নেতাজী অপেক্ষামান সেনাদের সঙ্গে করমর্দন ও পরিচয়ের আনুষ্ঠানিক পালা শেষ করলেন।

সেই দিনটির বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি প্রসঙ্গে মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান লিখেছেন: বিমান থেকে নেমেই নেতাজী সরাসরি আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করে তিনি দু' মিনিট ধরে কথাবার্তাও বললেন। আমার সারা শরীর শিউরে উঠলো। জীবনে তাঁকে এই প্রথম দেখলাম। কত কিছুই না তাঁর কাছে আমরা প্রত্যাশা করে বসে আছি। নেতাজীর গতিবিধি এবং হাবভাব আমি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম···

সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে পৌঁছুলেন ১৯৪৩ সালের ২ জুলাই। প্রথমদিন তিনি স্থানীয় জনসাধারণের মনোভাব এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের পদস্থ অফিসারদের কাছ থেকে তাঁদের সুবিধা অসুবিধার কথা জেনে নেন। এছাড়া আনুষ্ঠানিক কতগুলি কাজে দারুণভাবে তিনি ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু তারপর দিন, অর্থাৎ ৩ জুলাই তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকজন কর্মকর্তা এবং সিঙ্গাপুরে আগত শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, হংকং, বোর্ণিও সহ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রবাসী ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন। ঐ বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং খবরাখবর জেনে নেওয়া। দীর্ঘক্ষণ রুদ্ধদ্বারকক্ষের ঐ বৈঠকে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পরাধীন ভারতবর্ষের ইতিকর্তব্য নিয়ে এক ভাষণ দেন। মাতৃভূমির মুক্তির জন্য পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের কর্তব্য সম্বন্ধেও তিনি সকলকে অবহিত করেন। বৈঠকে তিনি আধুনিক যুদ্ধপদ্ধতি ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে লড়াই করার জন্য সামরিক প্রস্তুতি এবং অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কেও খুঁটিনাটি আলোচনা করেন। আধুনিক যুদ্ধনীতি সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের আলোচনা ও পরামর্শ শুনে সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট সামরিক নেতারা পর্যন্ত মুগ্ধ হন।

সিঙ্গাপুরে পৌঁছুবার পর সুভাষচন্দ্র যে কয়টি গোপন বৈঠক করেন, সর্বত্রই তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের কিছু অফিসার এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের প্রতিনিধিদের মধ্যে সন্দেহের একটা চাপা সুর লক্ষ্য করেন। তাদের ধারণা ছিল, নেতাজীর নেতৃত্বের উপর হয়তো জাপান হস্তক্ষেপ করতেও দ্বিধা বোধ করবে না এবং চাপ সৃষ্টি করে তারা নেতাজীকে জাপানের রণকৌশলের কাজে ব্যবহার করবে। ভারতের মুক্তিযুদ্ধে জাপান আন্তরিকভাবে কতটা সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে, দু' একজন অফিসার সসঙ্কোচে নেতাজীর কাছে তাও সবিনয়ে জানতে চান। নেতাজীও অবশ্য এ ধরণের প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। নেতাজী তার উত্তরে বলেন: ডু ইউ বিলিভ দ্যাট আই হ্যাভ ব্রেন এনাফ নট টু বি ফুলড বাই দেম? দেন ট্রাস্ট ইন মাই ওয়ার্ড, হোয়েন আই অ্যাসিওর ইউ দ্যাট আই অ্যাম সিওর জ্যাপস ক্যাননট ডাবল ক্রস আস।

জাপানের আন্তরিকতার প্রশ্নে তিনি আরও বলেন: ইফ এনি বডি হ্যাজ স্টিল এনি ডাউট ইন হিজ মাইণ্ড অন দিস পয়েন্ট, আই স্যাল আসক হিম টু প্লেস হিজ ট্রাস্ট ইন মি—

ইফ দি কানিং বৃটিশ পলিটিসিয়ানস কুড নাইদার ক্যাজোল নর ডিসিভ মি, নো ওয়ান এলস ক্যান হোপ টু ডু সো।...

অর্থাৎ নেতাজী অতি সংক্ষেপে যা' বললেন, তার মর্মকথা হল:

আপনারা আমার উপর অবিচল আস্থা রাখতে পারেন, জাপানীরা ধোকা দিয়ে আমাদের বোকা বানাতে পারবেনা। এই প্রশ্নে যদি কারো কোন দ্বিধা সংশয় থেকে থাকে আমার উপর নির্ভর করে একটু ধৈর্য ধরুন। বৃটিশ ধুরন্ধররাই নানা কৌশলেও যখন আমাকে টলাতে বা ভোলাতে পারেনি, পৃথিবীর আর অন্য কোন শক্তিই তা পারবে না।...

সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগের অবিশ্বাস্য কাহিনীর কথা সকলেই জানতেন। জানতেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সদাসতর্ক গোয়েন্দা পুলিশ আর সামরিক অফিসারদের চোখে ধুলো দিয়ে কী সুনিপুণ কৌশলে তিনি ভারতবর্ষের বাইরে চলে আসেন। মাতৃভূমিকে বিদেশী শাসন মুক্ত করার জন্য তাঁর আন্তরিক উদ্যম আর নিষ্ঠায় কারোরই সামান্যতম অবিশ্বাস ছিল না। তাই নেতাজীর সুস্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ বক্তব্য তাদের সকল সন্দেহের নিরসন করল। উপস্থিত সামরিক অফিসার আর অন্যান্য প্রতিনিধিরা মন্ত্রমুগ্ধের মত সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে সভাশেষে সুভাষচন্দ্রকে তাদের আদর্শ নেতারূপে গ্রহণ করলেন।

সিঙ্গাপুরের সারা শহর জুড়ে যেন এক উত্তেজক এবং রোমাঞ্চকর রঙীন চলচ্চিত্রের উৎসব। একের পর এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে চলেছে। স্বাধীনতাকামী জনতার মুখে মুখে এক কথা। নেতাজী, আজাদ হিন্দ ফৌজ আর মুক্তিযুদ্ধ!

৪ঠা জুলাই। সিঙ্গাপুরের ক্যাথয় ভবন। পুর্ব-এশিয়ার সকল দেশের ভারতীয় প্রতিনিধিরা উপস্থিত। মঞ্চে বসে আজাদ হিন্দ ফৌজের মুল নেতা বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। পরনে সামরিক পোষাক। পাশে নেতাজী সুভাষচন্দ্র। রাসবিহারী বসু উঠে দাঁড়ালেন। তারপর নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ত্যাগ, নিষ্ঠা আর দুঃসাহসী অভিযানের কাহিনী বর্ণণা করে আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্বভার তাঁর উপর অর্পণ করার প্রস্তাব করলেন।

বিপ্লবী রাসবিহারীর প্রস্তাবে উপস্থিত সকল প্রতিনিধি বিপুল হর্ষধ্বনি আর করতালির মাধ্যমে তার সমর্থন জানালেন। সমস্ত সভাকক্ষে বিপুল উদ্দীপনা আর গভীর প্রতীতির ঢেউ খেলে গেল। সভায় আজাদ হিন্দ ফৌজ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র আর বিপ্লবী রাসবিহারীর নামে মুহূর্মুহু জয়ধ্বনি উঠল। মঞ্চে বিপ্লবী রাসবিহারীর পাশের আসনে বসে সুভাষচন্দ্র তখন হয়তো আবেগমথিত। তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠল অতীতের কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা। সিঙ্গাপুরের ক্যাথয় ভবনে বসে যে বীর বিপ্লবী রাসবিহারী তাঁর হাতে ভারত মুক্তির মুক্তিবাহিনীর গুরু এবং পবিত্র দায়িত্ব তুলে দিচ্ছেন, এক সময় ছাত্রাবস্থায় সেই রাসবিহারীর নামেই সুভাষচন্দ্র নিজে এবং তাঁর সহকর্মীরা স্বদেশ সেবার প্রেরণা পেতেন। বিপ্লবী রাসবিহারী ছিলেন তাঁদের প্রেরণার উৎস।

সেটা ১৯১১ সাল। কলকতাসহ সারাদেশে দারুণ উত্তেজনা। স্বদেশী করা মানুষের মধ্যে যেমন প্রবল উচ্ছ্বাস, উৎসাহ আর উদ্দীপনা, তেমনি সাম্রাজ্যবাদ বৃটিশ প্রশাসনের সাহেব-সুবাদের মধ্যে তীব্র ত্রাস, আতঙ্ক আর দারুণ ভীতি। রাসবিহারীর নামে তারা উদ্বিগ্ন। কারণ মাত্র ক' দিন আগে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর তরুণ রাসবিহারী বোমা নিক্ষেপ করেছেন। উদ্দেশ্য : বিদেশী অত্যাচারী শাসকের মূর্ত প্রতীক হার্ডিঞ্জ সাহেবকে হত্যা করে সাম্রাজ্যবাদের শোষণের ভিতটা কাঁপিয়ে দেওয়া।
রাসবিহারীর বোমা নিক্ষেপের ঘটনার অবিশ্বাস্য সংবাদ আগুনের ফুলকি হয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। স্বাধীনতাকামী মানুষ পেল অসীম উৎসাহ, আনন্দ এবং মুক্তির চেতনাবোধ। আর আতঙ্কগ্রস্ত সাহেবসুবারা বুঝল, এদেশে তাদের শোষণ-শাসনের যুগ শেষ হতে চলেছে। তবুও তারা দমল না। রাজদ্রোহী রাসবিহারীর বিরুদ্ধে তাই কঠিন শাস্তি বিধানের জন্য বিদেশী শাসকগোষ্ঠী উদ্যোগী হল।

সরকারী ঘোষণায় বলা হল: জীবিত অথবা মৃত যে অবস্থাতেই হোক রাজদ্রোহী রাসবিহারীকে সরকারের হাতে তুলে দিতে পারলে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

রাসবিহারীকে ধরবার জন্য লোভ দেখিয়ে যেমন দেশের মানুষের সহযোগিতা পাওয়ার চেষ্টা করল, তেমনি পুলিশ আর সামরিক বিভাগের সহায়তায় সারা দেশ জুড়ে চলল গোপন অভিযান। কিন্তু যাঁকে ধরবার জন্য বিদেশী শাসকের এত পরিকল্পনা আর সারাশী অভিযান, সেই রাসবিহারী কিন্তু বৃটিশ প্রশাসনের চোখে ধূলো দিয়ে দেশের সীমানা পেরিয়ে ততক্ষণে জাপানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। বিপ্লবী রাসবিহারীর অবিশ্বাস্য ঐ কীর্তির কথা যখন সারা দেশে সংবাদ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, তখন স্বদেশবাসীর মধ্যে তা' নতুন উৎসাহ আর প্রেরণার সঞ্চার করল।

বিপ্লবী রাসবিহারী ক্রমে সারাদেশে হয়ে উঠলেন বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক। বিপ্লবী ঐ প্রতীকের স্বপ্নে যখন সারাদেশের তরুণ সমাজ বিভোর, বিদেশী শাসকরা তখনও বেপরোয়াভাবে রাসবিহারী এবং তাঁর গোপনসূত্র আবিস্কারে তৎপর।

স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী রাসবিহারীর প্রখর দূরদৃষ্টি ছিল। তিনি জানতেন, মৌচাকে ঢিল ছুঁড়লে তার কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাই তিনি আগেভাগেই তার পরবর্তী কর্মধারা স্থির করে রেখেছিলেন।

পরাধীন ভারতের মাটিতে বিপ্লবের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে সুদূর জাপানে গিয়ে রাসবিহারী সেখানকার এক ধর্মগুরুর শরণাপন্ন হলেন। ধর্মগুরু তোয়েমার সান্নিধ্যে গিয়ে বিপ্লবী তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করলেন। ধর্মশালায় থেকে তিনি জাপানের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ রেখে চললেন। একদিকে ধর্মগুরু তোয়েমার সান্নিধ্য, অপরদিকে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ—এই দুয়ের প্রভাব বিপ্লবীর জীবনকে

এক নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিল। রাসবিহারী তখন বিপ্লবী-সন্ন্যাসী! স্বদেশভূমিকে দেশমাতৃকারূপে দেবীর আসনে বসিয়ে তিনি তাঁর শৃঙ্খল মোচনের জন্য নতুন সাধনা শুরু করলেন। কীভাবে কোন পথে স্বদেশভূমির মুক্তি সম্ভব, ভারতে ফিরে গিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুদ্ধ, না বিদেশে বসে নতুন বাহিনী গড়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভিযান—এনিয়ে চলল তাঁর নীরব ভাবনা, গোপন তৎপরতা।

প্রায় দশ বছর কাটল। ১৯২১ সালের কথা। জাপানে বসেও তিনি পরাধীন ভারতবর্ষের প্রায় সব খবরই রাখতেন। বিপ্লবী রাসবিহারী জানতে পারলেন, সারা দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হতে চলেছে। বৃটিশ শাসকের সঙ্গে সম্পূর্ণ রকম অসহযোগিতা করতে জাতীয় কংগ্রেস নতুন কর্মসূচী নিচ্ছে। তিনি বুঝলেন, বিপ্লবের সময় আগত। তাই তিনি বিদেশে বসে এক গোপন সংস্থা গড়ে তুললেন। উদ্দেশ্য, স্বদেশে সশস্ত্র বিপ্লবের সহায়তার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

বিপ্লবীর গোপন উদ্যোগ সফলতার পথে এগিয়ে চলল। তিনি প্রচুর গোলা বারুদ আর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করলেন। তারপর অতি গোপনে 'কামা-গাতা-মারু' নামে একটি জাপানী জাহাজে ভর্তি করে তা স্বদেশে বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। সারাদেশে যখন অসহযোগ আন্দোলন চলবে, তখন সশস্ত্র বিপ্লবীরা সম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই-এ নামলে ঐসব গোপন আগ্নেয়াস্ত্র তাদের অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে তিনি মনে করলেন।

অস্ত্র বোঝাই কামা-গাতা-মারু জাহাজ জাপানের এক বন্দর থেকে নির্দিষ্ট দিনে ভারতবর্ষের উদ্দেশে অতি সংগোপনে যাত্রা শুরু করল। বিপ্লবী রাসবিহারী নিজে জাপান সরকারের সঙ্গে এক চুক্তি করলেন। তাতে বলা হল, ভারতের মুক্তির জন্য যারা বৃটিশের

বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নামবেন, প্রয়োজনে জাপান তাদের সব রকম সাহায্য দিতে প্রস্তুত থাকবেন। এক অভিজ্ঞ সেনানায়কের মত তিনি তাঁর সমস্ত পরিকল্পনার রূপ দিতে এগিয়ে চললেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, বিপ্লবীর পরিকল্পনা এবং যুদ্ধাস্ত্র বোঝাই জাহাজের গোপন যাত্রার কথা বৃটিশ সরকারের গোয়েন্দারা গোপনসূত্রে জানতে পারল। অবশেষে একদিন সমুদ্রপথে ভারত সীমান্তে গোলা বারুদ বোঝাই জাহাজ কামা-গাতা-মারু বৃটিশ সেনারা আটক করল। শুধু গোলা-বারুদ নয়, জাহাজে যে ক'জন বিপ্লবী ছিলেন, তাঁরাও ধরা পড়লেন। কদিনের মধ্যে দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে রাস-বিহারীর ঐ অবিশ্বাস্য তৎপরতায় খবর প্রকাশ পেল। দেশবাসী সংবাদ শুনে স্তম্ভিত। ধৃত বিপ্লবীদের জন্য দেশ মর্মাহত হল কিন্তু বিপ্লবী অভিযানের পৌরুষদীপ্ত কার্যক্রমের সংবাদ তাদের মনে স্বাধীনতার চেতনাবোধ আরও বাড়িয়ে দিল।

স্বদেশের মুক্তি সাধনার জন্য বিপ্লবী রাসবিহারীর অভিনব অভিযান, নিরলস ও দুঃসাহসী উদ্যমের কথা সারা দেশে এক সময় প্রবাদ হয়ে ঘুরত। স্বপ্ন-বিলাসী রাসবিহারীর কথা স্বয়ং সুভাষচন্দ্র তাঁর ছাত্রাবস্থায় ও যৌবনে শুনতেন আর ভাবতেন, বড় হয়ে তিনিও একদিন স্বদেশ মায়ের মুক্তির জন্য আপোষহীন সংগ্রাম করবেন। প্রয়োজনে বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দম্ভের দুর্গ চূর্ণ করতে দুঃসাহসী অভিযান করবেন। রাসবিহারীর বিপ্লবীজীবন একসময় ছিল তরুন সুভাষচন্দ্রের স্বদেশসেবার মুলমন্ত্র।

অতীতের ইতিহাস সুভাষচন্দ্রকে মুহূর্তে কোথায় কোন ভিন্ন রাজ্যের স্বপ্নিল পরিবেশে যেন নিয়ে গেল। ভাবাবেগাপ্লুত সুভাষচন্দ্র যে মঞ্চে বসে, সেই মঞ্চেই তাঁর পাশে বসে সেই প্রবীন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু! একদা স্বপ্নের নায়ক এই বিপ্লবীর নিবিড় সান্নিধ্য সুভাষচন্দ্রের জীবনে এনে দিল নতুন এক অগ্নিপ্রবাহ! মুগ্ধ সুভাষ অবনত মস্তকে প্রবীন বিপ্লবীর দিকে তাকান। রাসবিহারী কিছুক্ষণ

আগেই তাঁর ভাষণে সুভাষচন্দ্রকে আহ্বান জানিয়েছেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের পবিত্র দায়িত্বভার নিজের হাতে তুলে নিতে। সারা সভায় তখনও সমর্থনসূচক হাততালি। সুভাষচন্দ্র তন্ময় বিভোর। সুভাষ থেকে নেতাজী। নায়ক থেকে মহানায়ক। এক নতুন জীবনে উত্তরণ! রাসবিহারী এবার সুভাষের দিকে তাকালেন। প্রবীন বিপ্লবীর চোখে চোখ পড়তেই নেতাজী চমকে উঠলেন। এক বিপ্লবীর চোখের ভাষার অর্থ আরেক বিপ্লবী সহজেই বুঝতে পারলেন। নম্রনত অথচ তেজোদ্দীপ্ত সুভাষচন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। পরনে সামরিক পোষাক। মাথায় গান্ধীটুপি। চোখেমুখে আনন্দ-উদ্দীপনা আর অগ্নিশপথের কাঠিন্য। পূর্ব-এশিয়ার প্রতিনিধিদের ঐতিহাসিক সম্মেলনে আবার করতালি আর হর্ষধ্বনি। স্থান: সিঙ্গাপুরের কাথয় ভবন। তারিখ ৪ঠা জুলাই—১৯৪৩।

নেতাজী বললেন: স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের আর কালক্ষেপ করার সময় নেই। কাজের দিন সমাগত। সামরিক নিয়মশৃঙ্খলা মেনে আদর্শের প্রতি গভীর আস্থা রেখে মহাযুদ্ধের এই চরম মুহূর্তে সুনির্দিষ্ট কর্মপথ ধরে আমাদের এগোতে হবে। মাতৃভূমির মুক্তির জন্য আমাদের যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে হবে, তার আগে পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের আমি ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানাচ্ছি। আমি জানি, এ-আহ্বানে সকলে উপযুক্তভাবে সাড়া দেবেন।

আগেই বলেছি, ১৯৪১ সালে যখন জরুরী কাজের জন্য ভারতভূমি ত্যাগ করে আমি বিদেশে চলে আসি, তখন দেশবাসীর মনের কথা অনুধাবন করতে পেরেই আমি তা করি। এবং সেই থেকে বৃটিশ প্রশাসন এবং গোয়েন্দাদের সকল সতর্কতা এড়িয়ে আমি দেশবাসীর সঙ্গে গোপন যোগসূত্র রেখে চলেছি। দেশের বাইরে থাকলেও ভারতবর্ষের অভ্যন্তরের দেশসেবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এবং তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েই আমরা মাতৃমুক্তির যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে

চলেছি। দৃঢ়তার সঙ্গেই আজ একথা ঘোষণা করতে পারি যে, এ পর্যন্ত আমরা যা করেছি এবং ভবিষ্যতে যা করব, সে সবেরই উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন—তা' হল মাতৃভূমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। স্বদেশভূমি ভারতবর্ষের যাতে অনিষ্ট হয়, অথবা ভারতবাসীর যা ইচ্ছা নয়—সে কাজ আমরা কখনও করব না, অথবা করার কথা কল্পনাও করব না।...

আমি মনে করি, সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে স্বাধীন ভারতের জন্য একটা সাময়িক সরকার গঠন করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য।... নিজেদের চেষ্টা সাহস এবং ত্যাগ দ্বারা আমরা এমন শক্তি অর্জন করব, যা স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে আমাদের সাহায্য করবে। এযুদ্ধে আমরা যে জয়লাভ করব, তা অবধার্য। তাই বলে শত্রুপক্ষকে ভুলেও দুর্বল বলে গণ্য করা ঠিক হবে না। মাঝে মধ্যে সাময়িক-ভাবে আমাদেরও হয়তো পরাজয় হবে—তা'তে হতোদ্যম হলে চলবে না। যে যুদ্ধে আমরা প্রবৃত্ত হতে চলেছি, তা' হবে অত্যন্ত কঠিন এবং দীর্ঘস্থায়ী। কারণ আমাদের শত্রুপক্ষ প্রবল, ক্রূর এবং নিষ্ঠুর নৃশংস। স্বাধীনতার এই শেষ সংগ্রামে আমাদের অনেক দুঃখকষ্টের পথ পার হতে হবে। এই পবিত্র অভিযানকে সফল করতে আমাদের হাসিমুখে ক্ষুধার জ্বালা, বুকফাটা তৃষ্ণা, অনিদ্রার কষ্ট এমন কি প্রয়োজনে মৃত্যুকেও বরণ করে নিতে হবে। এই কঠিন এবং কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই মিলবে আমাদের পরমা-কাঙ্ক্ষিত পবিত্র স্বাধীনতা।...

নেতাজীর ভাষণ সমাগত প্রতিনিধিদের এক নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করল। তাঁর প্রতিটি কথা প্রত্যেকের অন্তরের অন্তঃস্তলে গিয়ে নাড়া দিল। মাতৃমুক্তির যজ্ঞে জীবনাহুতি দেওয়ার আহ্বান সকলকে মৃত্যুমাতাল করে তুলল। অগ্নিশপথের এক অদৃশ্য শিখা সকলের হৃদয় মনে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে দিল।

গভীর রাত্রে সভা-শেষ হলেও পরের দিনও তার রেশ কাটল না।

ঘরোয়া সভায় দেওয়া নেতাজীর ভাষণের সুর সংবাদপত্রের মাধ্যমে সিঙ্গাপুরের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। সারা সহরে তখন আনন্দ-উত্তেজনা আর অভাবনীয় উদ্দীপনা। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নায়ক সুভাষচন্দ্রের ভাষণ শুনতে সকলেই রুদ্ধশ্বাস। নেতাজীর ঘরোয়া সভার ঐতিহাসিক ভাষণ সিঙ্গাপুর বেতার-কেন্দ্র থেকে প্রচারিতও হল। আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণে নেতাজীর সম্মতির সংবাদ শুধু সেনাবাহিনীকে নয়, পূর্ব-এশিয়ার সকল স্তরের মানুষকেই নতুন করে প্রেরণা দিল।

৫ জুলাই ১৯৪৩। ভোর থেকেই সিঙ্গাপুর ভেঙে পড়ল মিউনিসিপ্যাল ভবনের সামনে। বিরাট ময়দান। চারদিকে সারবেঁধে দাঁড়ানো সুসজ্জিত বিশাল সেনাবাহিনী। আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের ঘন ঘন যাওয়া আসা আর তৎপরতা দেখে সিঙ্গাপুরবাসী বুঝল সিঙ্গাপুর ময়দানে বিশেষ কোনও অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আজাদী বাহিনীর রণবাদ্যে সুর উঠল। সেনারা সটান হয়ে দাঁড়াল। বিশেষ ভাবে তৈরী মঞ্চের উপর ওঠে দাঁড়ালেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। সামরিক পোষাক পরিহিত সুভাষচন্দ্রের আচমকা উপস্থিতি সকলকে বিস্মিত করল। চারদিকে জয়ধ্বনি—আর করতালি। মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হল, আজাদ হিন্দ ফৌজের পতাকা উত্তোলনের পর নেতাজী আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক প্যারেড পরিদর্শন করবেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের পবিত্র দায়িত্বভার গ্রহণে সম্মত হওয়ায় নেতাজীর প্রথম উপস্থিতি সাধারণ সেনাদের মনেও প্রবল আশা আর উদ্দীপনা সৃষ্টি করল।

নেতাজী পতাকা তুললেন। সামরিক বাদ্যে আবার বিজয় সঙ্গীতের সুর ধ্বনিত হল। 'কদম কদম বাঢ়হায়ে যা'—সঙ্গীত সুরের তালে তালে সেনাবাহিনী কুচকাওয়াজ শুরু করল। মঞ্চে দাঁড়িয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র। আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর দায়িত্ব গ্রহণে স্মারক হিসাবে

আনুষ্ঠানিক ভাবে সামরিক বাহিনীর সেলুট নিলেন। চারদিকে পরিবেষ্টিত দাঁড়িয়ে লক্ষাধিক সেনা, হাজার হাজার সাঁজোয়া গাড়ি। সবার উপরে স্বাধীন ভারতের মুক্তির প্রতীক তেরঙা পতাকা। নেতাজী তখন আবেগ-রুদ্ধ। তিনি একের পর এক সেনাবাহিনী পরিদর্শন করলেন। অফিসারদের সঙ্গে পরিচয়ও হল। তারপর তিনি আজাদী ফৌজের উদ্দেশ্যে বললেন: আজ আমার জীবনে পরম গৌরবের দিন। ঈশ্বরের কৃপায় বিশ্ববাসীর কাছে আজ আমি সানন্দে ঘোষণা করার সুযোগ পেয়েছি যে, হিন্দুস্থানের আজাদির জন্য একটা মুক্তি বাহিনী আমরা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি।

এই সিঙ্গাপুর একদিন ইংরাজদের গর্বের বস্তু ছিল, আর সেই সেখানে সিঙ্গাপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে আজাদ হিন্দের বীর সেনারা মাতৃভূমির মুক্তির জন্য ব্যপক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই ফৌজই ভারতবর্ষকে ইংরাজদের হাত থেকে মুক্ত করবে। এই বিরাট ফৌজ যে সম্পূর্ণ ভারতীয়দের নিয়ে গড়ে উঠেছে, তা জেনে প্রত্যেক ভারতবাসীই গর্ববোধ করবেন। তারা আরও গর্ব অনুভব করবেন এই জেনে যে, সম্পূর্ণ ভারতীয় নেতৃত্বেই আজাদ হিন্দ ফৌজ এই মুহূর্তে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে চলেছে। ইংরাজদের এই শ্মশানক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আজ আর কোন বালকেরও বুঝতে বাকী নেই যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসান আসন্ন।

নেতাজী এবার একটু থামলেন। তারপর চারদিকে চোখ বুলিয়ে আবার তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললেন: প্রিয় সেনাগণ, আমাদের রণ-নীতি হবে দিল্লী চলো। জানি না, এই মুক্তিযুদ্ধের পর আমরা কতজন বেঁচে থাকব। কিন্তু একথা ধ্রুব সত্য, এই যুদ্ধে জয়লাভ আমরা করবই। আমাদের অবশিষ্ট সেনাগণ ইংরাজ সাম্রাজ্যের অপর শ্মশান পুরাতন দিল্লীর লাল কেল্লায় বিজয় পতাকা না তোলা পর্যন্ত আমাদের কর্তব্য শেষ হবে না!

রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা

লাভের সকল যোগ্যতাই লাভ করেছে। অভাব শুধুমাত্র একটি সুগঠিত সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর। সৈন্যদল হাতে ছিল বলেই আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করতে পেরেছিলেন। গ্যারিবল্ডি সশস্ত্র সেচ্ছাসেবক দলের অকৃত্রিম সাহায্য পেয়েছিলেন বলেই ইটালী স্বাধীনতা লাভ করেছিল। মুক্তিকামী ভারতের জাতীয় ফৌজ গঠনের কৃতিত্ব ও গৌরব আপনারাই প্রথম লাভ করলেন। যে সব সেনা নিজের দেশের কাছে বিশ্বস্ত থেকে নিজ নিজ কর্তব্য যথাযথ পালন করতে পারে, স্বদেশ ভূমির মুক্তির জন্য যারা প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, জগতে তাদের পরাজয় নেই। সৈনিকের এই মহান আদর্শ আপনারা সর্বদাই মনে রাখবেন।

বন্ধুগণ, আজ আপনারাই ভারতের আশা এবং ভরসা। সুতরাং আপনারা এমনভাবে সৈনিকের কর্তব্য করে যাবেন, যাতে ভারতবাসী প্রাণ ভরে আপনাদের আশীর্বাদ করতে এবং ভবিষ্যতে বংশধররা আপনাদের কথা ভেবে গৌরব অনুভব করতে পারেন। আমি নিজে সুখে-দুঃখে আনন্দে-বিষাদে পরাজয়ে-বিজয়ে সর্বাবস্থায় আপনাদের সঙ্গে থাকব এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আপাততঃ আমি আপনাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা কষ্ট, দুঃসাধ্য অভিযান এবং মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই উপহার দিতে পারছি না। আমাদের মধ্যে কারা এবং কত জন যুদ্ধশেষে বেঁচে থাকব এবং স্বাধীন ভারত দেখব সেটাই বড় কথা নয়। বড় কথা, আমাদের ভারতভূমি স্বাধীন হবে এবং সেই স্বাধীনতা অর্জনে আমরা নিঃসংশয়ে সবকিছু দান করব। ঈশ্বর আমাদের এই মহান ফৌজকে আশীর্বাদ করুন। আশীর্বাদ করুন, আমরা যেন মুক্তিযুদ্ধে বিজয়লাভ করি।

৬ জুলাই। স্থানীয় খবরের কাগজে নেতাজীর ছবি আর তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ বিস্তৃত ভাবে প্রকাশিত হল। নেতাজী এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের নামে জাতিধর্ম নির্বিশেষে তখন পূর্ব-এশিয়ার

সাধারণ মানুষও আত্মহারা। সিঙ্গাপুর সহর তখন যেন এক বিরাট নাটমঞ্চ। একের পর এক দৃশ্য। সংবাদপত্র আর বেতারে বিবরণের পর বিবরণ। রোমাঞ্চকর সেই সব খবরের ঢেউ শুধু প্রবাসী ভারতীয়দেরই নয়, এশিয়ার মানুষের মধ্যেও নিত্য নতুন চেতনার প্লাবন তুলল।

সিঙ্গাপুরের মিউনিসিপ্যাল ভবনের সামনের ময়দানে এদিনও আগের দিনের মত আবার সেনা সমাবেশ। আবার সেই রণবাদ্য। তখনও কেউ জানত না যে জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো সেখানে এসেছেন মুক্তিযুদ্ধের মহান নেতা নেতাজী এবং তাঁর বিরাট বাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজকে অভিনন্দন জানাতে। আর আজাদ হিন্দের সেনারাও মিত্র রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান জানাতে প্রস্তুত।

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্যারেড শুরুর আগে ভারত এবং জাপানের জাতীয় পতাকা তোলা হল। নেতাজী এবং জেনারেল তোজো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। বিদেশী এক রাষ্ট্রপ্রধান এই প্রথম ভারতীয় বাহিনীর অভিনন্দন গ্রহণ করলেন। এবং তিনিও প্রতি-অভিনন্দন জানালেন। সুশৃঙ্খল ভারতীয় বাহিনীর প্যারেডে মুগ্ধ হলেন তোজো। তারপর নেতাজী এবং তোজো, বিশ্বের দুই নেতা এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষপৌরভবনের এক কক্ষে বসে গোপন পরামর্শ করলেন। ঐ পরামর্শ সভার পর জেনারেল তোজো নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের জন্য পুনরায় অভিনন্দন জানালেন এবং স্বদেশভূমির মুক্তির জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধে যেকোনও রকম সহায়তার আশ্বাস দিলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্বভার নৈতিকভাবে গ্রহণ করার পর নেতাজী বেশ বুঝলেন, তাঁর হাতে সময় খুবই কম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি প্রকৃতি এবং প্রসারের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি তাঁর রণকৌশল রচনা শুরু করলেন। ভারত অভিযানের জন্য ব্যাপক

প্রস্তুতির মুখে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে প্রায় ত্রিশ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়ের বসবাস, তিনি তাদের সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথাও অনুভব করলেন।

১৯৪৩ সাল। ৯ জুলাই।

এদিন সিঙ্গাপুরে এক প্রকাশ্য জনসভার আয়োজন হল। শুধুমাত্র সামরিক লোকজনই নয়—আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের পাশে অসামরিক প্রবাসী ভারতীয় নারী-পুরুষও এই সভায় উপস্থিত। বিরাট ঐ জনসমাবেশে একমাত্র বক্তা নেতাজী সুভাষচন্দ্র। তিনি ঐ প্রকাশ্য সভায় যে প্রাণস্পর্শী ভাষণ দেন, তা আজ এক ইতিহাস। তিনি ঐ ভাষণে তাঁর স্বদেশত্যাগ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বগ্রাসী যুদ্ধের জন্য সর্বস্ব পণের ডাক দিয়ে বললেন:

ঘরবাড়ি এবং স্বদেশ ছেড়ে বিপদসঙ্কুল পথে আমি কেন যাত্রা করেছিলাম, প্রাণ খুলে আজ আমি আপনাদের কাছে তা বলতে চাই। ইংরাজ আমাকে কারাগারে বন্দী করে বেশ নিশ্চিন্ত ছিল। জীবনে আমি এগার বার কারাদণ্ড ভোগ করেছি। সুতরাং কারাবাস আমার বেশ গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষবার আমি কারাগারে বসে মুক্তির উপায় চিন্তা করতে লাগলাম। মনে হল, ভারতের বাইরে গিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য কিছু চেষ্টা করা প্রয়োজন। তাতে হয়তো বিপদ আছে, কিন্তু সেই বিপদের ঝুঁকি না নিলেই চলবে না।

প্রায় তিন মাস ধ্যানধারণা করে আমি বুঝতে চেষ্টা করি, মরণপণ করে এই মহান কর্তব্য পালন করার মত মনের বল আমার আছে কিনা। ভারতবর্ষের বাইরে যাওয়ার আগে, আমার কারাগারের বাইরে আসার প্রয়োজন। কারামুক্তির জন্য তখন আমি অনশন শুরু করি। বেশ ভালভাবেই আমি জানতাম, ভারতবর্ষই হোক, অথবা আয়র্ল্যাণ্ডই হোক—কোথাও কোন বন্দী এই পন্থা অবলম্বন

করে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে মুক্তি আদায় করতে পারেনি। আমি এও জানতাম, এইরকম চেষ্টা করতে গিয়েই টেরেন্স ম্যাক-সুইনী আর যতীন দাস জীবন দিয়েছেন কিন্তু তবুও আমার মন বলল, কোনও ঐতিহাসিক কাজ করার জন্য আমার আহ্বান এসেছে। তাই শেষপর্যন্ত আমি অনশন শুরু করলাম। সাত দিন অনশনের পরই বিদেশী শাসকদের টনক নড়ল। আমার অবস্থা দেখে ভয়ে আমাকে মুক্তি দিলেন। তাদের গোপন ইচ্ছাও চাপা থাকল না। তারা ভাবল, দু'একমাস পর একটু সুস্থ হলেই আবার আমাকে জেলে পুরবেন কিন্তু তারা আমাকে পুনরায় ধরবার আগেই আমি নাগালের বাইরে চলে এলাম।...

বন্ধুগণ, ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়বার পর থেকেই আমি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিশ বছর আমি আইন অমান্য আন্দোলন করেছি। তাছাড়া হিংস অথবা অহিংস হোক —যে কোনও ধরণের বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার সংশ্রব আছে সন্দেহ করে বারংবার আমাকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে। এইরূপ নানা অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়েছে যে, ভারতের ভিতরে থেকে চেষ্টা করে কোনদিনই আমরা ভারতবর্ষকে বৃটিশ কবল থেকে মুক্ত করতে পারব না।

সংক্ষেপে বলতে গেলে আমার উদ্দেশ্য ছিল, ভারতের অভ্যন্তরে যে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে, ভারতের বাইরে গিয়ে তাকে সাহায্য করা। বস্তুতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাইরের সাহায্য অপরিহার্য হলেও, তার পরিমাণ অত্যন্ত সামান্য। বাইরে থেকে ভারতবাসীর এখন দুই রকম সাহায্য প্রয়োজন। প্রথমতঃ নৈতিক এবং দ্বিতীয়তঃ সাজসরঞ্জামের। সর্বপ্রথম ভারতবাসীর বিশ্বাস উৎপাদন করতে হবে যে, তারা জয়লাভ করবেই এবং সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে সরঞ্জাম শিক্ষিত সৈনিক পাঠিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করতে হবে।

দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য আমরা কি পন্থা অবলম্বন করতে যাচ্ছি এ কথা বিশ্ববাসীকে, এমন কি শত্রুপক্ষকেও মুক্তকণ্ঠে জানিয়ে দেবার সময় এসেছে। আমরা ঘোষণা করতে পারি যে, ভারতবর্ষের বাইরে ভারতীয়েরা এমন একটা শক্তিশালী বাহিনী গড়তে শুরু করেছে, যারা ভারতের বৃটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করারও ক্ষমতা রাখে। তারা যখন এই আক্রমণ করবে এবং তখন যে বিপ্লব শুরু হবে, তা শুধুমাত্র ভারতের অসামরিক জনগণের মধ্যেই সীমিত থাকবে না, বৃটিশ-বেতনভোগী ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যেও এই বিপ্লব ব্যাপক-ভাবে ছড়িয়ে পড়বে। ভিতর এবং বাইরে থেকে এমনি করে আক্রান্ত হয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটবে। ভারতীয়রা পাবে মুক্তি।

সুতরাং, আমার মতে, অক্ষশক্তিগণ আমাদের এই আন্দোলন কোন দৃষ্টিতে দেখবেন, তা ভাববার প্রয়োজন নেই। শুধু মাত্র ভারতীয়রাই যদি দেশের ভিতর এবং বাইরে থেকে নিজ নিজ কর্তব্য করে যান, তাহলেই বৃটিশকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করে স্বদেশ মাতৃকার মুক্তিসাধন সম্ভব।

বন্ধুগণ, আজ থেকে ত্রিশ লক্ষ পূর্ব-এশিয়াবাসীর শপথ হোক: সর্বগ্রাসী যুদ্ধের জন্য সর্বস্বপণ (টোটাল মোবিলাইজেসন ফর এ টোটাল ওয়্যার)। এই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে আমাদের তিন লক্ষ সৈন্য এবং তিন কোটি ডলার (মুদ্রা) প্রয়োজন।

আমি এখান থেকে একটি ভারতীয় নারী বাহিনীও গড়ে তুলতে চাই। এই বাহিনীর বীরাঙ্গণারা হাসিমুখে যেন মৃত্যু আলিঙ্গণ করতেও পিছপা না হন—তাই আমার কাম্য। ১৮৫৭ সালে ভারতীয় স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রামে ঝাঁসীর রাণী যেমন করে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন, ঠিক তেমনি করে কঠিন হাতে অস্ত্র ধরবেন আমার বাঞ্ছিত নারী-বাহিনীর বীরাঙ্গনারা।

স্বদেশবাসী ভারতীয়েরা আজ নিদারুণ লাঞ্ছনা আর অবহেলার

শিকার। পরাধীনতার গ্লানি মুছে ফেলতে তারা তাই দ্বিতীয় রণাঙ্গণ কামনা করছেন।

আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনারা, পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়েরা, ধনবল আর জনবল আমার হাতে তুলে দিন। আমি পবিত্র এবং বাঞ্ছিত সেই দ্বিতীয় রণাঙ্গণ সৃষ্টি করব—এবং তা হবে পরাধীন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহাসিক রণাঙ্গণ।

গান্ধীজীর নেতৃত্ব সারা ভারতে অসহযোগ আন্দোলন শেষ হল। প্রবীন নেতার নেতৃত্ব, অভূতপূর্ব তার সমর্থন এবং তার ফলশ্রুতি নিয়ে সারা দেশে যখন নানা বিচার বিশ্লেষণ, তরুণ সুভাষচন্দ্র তখন অন্য সাধনায় মগ্ন। ভবিষ্যতের এক সুস্পষ্ট চিত্র তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠল। তাঁর বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল যে, চেয়ে চিন্তে, আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে আর যাইহোক, দেশের স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। সুভাষচন্দ্র ইংরাজদের স্বভাব এবং চরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। পরাধীন ভারতবর্ষে তারা এসেছিল শোষণ আর লুণ্ঠন করতে। দয়া ধর্ম অথবা করুণার জন্য তারা এই ভারতবর্ষের শাসনযন্ত্র দখল করেনি। এরা শক্তের ভক্ত। সৌজন্য, সহনশীলতা অথবা ন্যায়-নীতির বাণীর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ কাপুরুষতার গন্ধ খুঁজে পায়। তাই সম্মানীয় এবং অসম্বাদী নেতারূপে মহাত্মা গান্ধীকে বরণ করে নিয়েও তরুণ সুভাষ প্রবীন নেতার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। গান্ধীজী যখন তাঁর অহিংস আন্দোলন প্রসারের জন্য সচেষ্ট, তরুণ সুভাষের মনে প্রাণে তখন বিদেশী শক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের শপথ।

ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিশ্বরাজনীতির আকাশে আচমকা সঙ্কটের মেঘ ঘনিয়ে এল। দূরদ্রষ্টা সুভাষচন্দ্রের স্থির বিশ্বাস আরও গভীর হল যে বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন। এবং সেই প্রলয়কারী যুদ্ধে

সাম্রাজ্যবাদশক্তি জড়িয়ে পড়তেও বাধ্য। তিনি ভাবলেন বিশ্বযুদ্ধ যদি শেষপর্যন্ত বেধে যায় এবং সেই যুদ্ধের জালে বৃটেন অর্থাৎ ইংরাজরা যদি জড়িয়ে পড়ে, তবে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলে পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তি ত্বরান্বিত করা খুবই সহজসাধ্য হবে।

শুধু মাত্র সুযোগ সুবিধা আর সাফল্যের দিক নয়, অভিজ্ঞ রাজনীতিক সুভাষচন্দ্র বিশ্বযুদ্ধের কুফল সম্পর্কেও আগাম ভাবনা ভাবলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, বিশ্বযুদ্ধের সামিল হলে ইংরাজশক্তি অভাবী দেশ এই ভারতবর্ষের তরুণদের সেনা বাহিনীতে নিযে অর্থের লোভ দেখিয়ে রণাঙ্গণে পাঠাবে, আর তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মেটাতে ভারতবর্ষের যুবশক্তিকে ব্যাপকহারে ব্যবহার করবে। আর সঙ্গে সঙ্গে কুচক্রী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দেশের মুক্তি আন্দোলনের নেতাদের বিনাবিচারে আটক করে নিঃসঙ্কোচে কারান্তরালে পাঠাবে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলবে দেশ নেতাদের সেই অবাঞ্ছিত বন্দীদশা।

এমনি ভাবে যুগপৎ তারা দেশের যুবশক্তিকে নিজেদের স্বার্থে নিয়োগ করবে এবং মুক্তি আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করতে প্রয়োজনীয় আরও বহু কঠোর ব্যবস্থা নেবে। শোষন-শাসন বহাল রাখতে সকল যুগের শাসক শক্তিই যে এ পথের পথিক হয়—সুভাষচন্দ্রের তা' অজানা ছিল না। তাই তিনি অহিংস আন্দোলনের চূড়ান্ত সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না।

১৯৩৫ সালের শেষাশেষি বিশ্ব পরিস্থিতি বিরাট পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে চলল। সারা বিশ্বে দারুণ উত্তেজনা। জার্মান-জাপান, রাশিয়া-বৃটেন, আমেরিকা-ফ্রান্স সর্বত্রই সাজ সাজ রব। সুভাষচন্দ্র বিশ্বরাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন আর তাঁর নিজের পরিকল্পনার রূপ রেখা স্থির করেন। যতদিন যায়, পরিস্থিতির যত পরিবর্তন হয়, সুভাষচন্দ্রের অস্থিরতাও ততই বাড়তে থাকে।

অবশেষে বিশ্ববাসী একদিন চমকে উঠে জানতে পারল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তা' থেকে আর মুক্তি নেই। এবং সেই যুদ্ধের অন্যতম শরিক হতে চলেছে বৃটিশশক্তি। সুভাষচন্দ্র এবার আরও তৎপর হলেন। বিশ্বপরিস্থিতির সর্বশেষ পর্যালোচনার পর তিনি বুঝলেন, তাঁর সামনে দুটি মাত্র পথ খোলা। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত হয় ইংরাজদের কারাগারে বন্দী জীবন যাপন, নয়তো স্বদেশভূমি ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে বাইরে গিয়ে বৃটিশ বিরোধী শক্তির সঙ্গে সমঝোতা করে সেনাবাহিনী তৈরী করা এবং পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ শক্তিকে উৎখাত করার জন্য সর্বাত্মক অভিযান করা।

আবেগপ্লুত সুভাষচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারেন না। কোন পথ তিনি বেছে নেবেন, বন্দীজীবন না বীরের বেশে মুক্তিযুদ্ধের পথ? আত্মদ্বন্দ্বের যন্ত্রণায় তিনি অস্থির অধীর হয়ে ওঠেন। রাতের পর রাত, আর দিনের পর দিন চলে তার আত্মজিজ্ঞাসা। কোন পথের পথিক হবেন তিনি! আত্মদ্বন্দ্বের সেই চরমতম মুহূর্তে তিনি একদিন ছুটে গেলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর কাছে।

প্রবীন জননেতা গান্ধীজী তরুণ সুভাষকে কাছে টেনে নিয়ে বসলেন। চোখমুখ আর চাহনি দেখে গান্ধীজী বুঝলেন, সুভাষ কোন এক মানসিক উত্তেজনা আর দ্বন্দ্বে অস্থির। মৃদু হেসে সস্নেহে সুভাষকে বললেন, কী হয়েছে তোমার?

সুভাষচন্দ্র একটু শান্ত হতে চেষ্টা করলেন। নিজেকে স্থির করে নিয়ে সবিনয়ে বললেন, মহাত্মাজী, আপনিও তো বুঝেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী! আমার মনে হয়, এই সুযোগে সুকৌশলে আমাদের স্বাধীনতা লাভ অনেক সহজ হবে।

গান্ধীজীর মুখে স্নেহের হাসি।

সুভাষ তাঁর বিশ্লেষণী বক্তব্যে বললেন, আমার মনে হয় অবশ্যম্ভাবী বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তিও জড়িয়ে পড়তে বাধ্য। আর তারা যখন

আসন্ন যুদ্ধের ব্যাপক জালে জড়িয়ে পড়বে, তখন স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ মুক্তি আন্দোলন রোধ করার জন্য শাসক সম্প্রদায় দেশের প্রথম শ্রেণীর কর্মী এবং নেতাদের পাইকারী ভাবে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরবে। দেশের স্বদেশী করা মানুষের উপর চলবে অমানুষিক অত্যাচার—উৎপীড়ন আর হিংস্র আচরণ।

গান্ধীজী অসীম ধৈর্য সহকারে সুভাষের কথাগুলি শুনছিলেন। সুভাষের বক্তব্যের শেষে তিনি প্রশ্ন রাখলেন, সব বুঝলাম। ওই পরিস্থিতে কী করণীয় বলে তুমি মনে করছ সুভাষ ?

গান্ধীজীর ছোট্ট জিজ্ঞাসার মধ্যে সুভাষচন্দ্র স্নেহ ভালবাসা আর আন্তরিকতার কোমল স্পর্শ খুঁজে পেলেন। তারপর বলিষ্ঠভাবে আবার নিবেদন করলেন, যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন অসহায়ভাবে কারাজীবন কাটানো অর্থহীন, বাপুজী। ওরা যে কতটা নিষ্ঠুর আর ক্রূর তাতো আপনার অজানা নয়। নিজেদের স্বার্থ ছাড়া ইংরাজরা আর কিছুই বুঝতে চায় না। তাই আবেদন-নিবেদন অথবা ওদের করুণার উপর নির্ভর করে মাতৃভূমির মুক্তিসাধন অসম্ভব বলে মনে হয়।

গান্ধীজী গম্ভীর। এবার যেন তিনি ভাবনার সাগরে ডুবলেন। সুভাষ তখনও কিছু শুনবার আশায় উদ্‌গ্রীব। অনেকক্ষণ কাটল। দুই নেতা মুখোমুখি বসে।

সুভাষের আর ধৈর্য মানে না। বুঝলেন, গান্ধীজী কিছু বলার চেয়ে আরও কিছু শুনতে চান। সুভাষ সবিনয়ে আবার মুখর হলেন। বললেন, বাপুজী, আমার গভীর বিশ্বাস, আসন্ন যুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতের কোন নেতা ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে যদি সৈন্য সংগ্রহ করে বিরাট এক বাহিনী গড়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সামিল হয়—তবে আমাদের দেশের মুক্তি আরও দ্রুত হবে—আমরা আমাদের পরাধীন মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতে সক্ষম হব। প্রসঙ্গত তিনি ইতিহাসের পাতা থেকে জেনারেল ফ্রাঙ্কো এবং গ্যারিবলডির দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন।

গান্ধীজী আর মৌন থাকতে পারলেন না। সুভাষের বুকের ভেতরকার যন্ত্রণা তিনি অনুভব করলেন। তাঁর হৃদয়ের উত্তাপ যে বিপ্লবের আগুন হয়ে ছড়িয়ে পড়তে চায়—তা প্রবীন জননেতা অতি সহজেই বুঝতে পারলেন। অল্প কথায় স্বল্পবাক নেতা গান্ধীজী শান্তভাবে শুধু বললেন, তোমার আকাঙ্ক্ষিত পথে যে স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব, তা ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস হয় না। তবে ঐ পথের প্রতি যদি তোমার গভীর আস্থা আর বিশ্বাস থাকে, তবে তুমি তোমার স্বপ্ন সফলের চেষ্টা করে দেখতে পারো। এবং মনে রেখো সুভাষ, তোমার জয়ে আমিই সর্বাগ্রে তোমাকে অভিনন্দন জানাবো। গান্ধীজীর সংক্ষিপ্ত অথচ ঐতিহাসিক ঐ পরামর্শের মধ্যে সুভাষচন্দ্র যেন আশীর্বাদের সুর খুঁজে পেলেন। আনন্দে অধীর সুভাষ বুঝলেন, ভিন্ন মত এবং পথ হওয়া সত্বেও গান্ধীজী তাঁর সম্ভাব্য পরিকল্পনাকে প্রকারান্তে স্বাগত জানিয়েছেন।

অবশেষে সত্যসত্যই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘনিয়ে এল। সারা বিশ্বে আতঙ্ক আর উত্তেজনা। সম্ভাব্য যুদ্ধের সব দিক খতিয়ে দেখে ইংরাজরা বুঝতে পারল, বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপ তাদের ক্ষমতার আসনকেও স্পর্শ করবে। তাই বাইরের যুদ্ধপ্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ শাসকরা পরাধীন ভারতবাসীর মানসিকতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে খোঁজ খবর সংগ্রহ শুরু করলেন। বুঝলেন, যুদ্ধের হিড়িকে হয়তো ভারতবর্ষের মানুষ তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে চাঙা করে তুলবে। প্রয়োজনে দেশের নেতৃবৃন্দ সেই সুযোগে সরকারকে পর্যুদস্ত করতে বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করবে। দূরদ্রষ্টা তরুণ রাজনীতিকের অনুমান আর আশঙ্কা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হল। ইংরাজ শাসক দেশের বড় বড় নেতাদের পাইকারী হারে গ্রেপ্তার করে জেলে ঢোকাতে লাগল। উদ্দেশ্য বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতার সুযোগে যাতে দেশনেতারা

স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারেন, তার ব্যবস্থা করা। অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রকেও একদিন গ্রেপ্তার করা হল। তখন এই নেতা অবশ্য তার জন্য প্রস্তুতই ছিলেন। কারারুদ্ধ সুভাষচন্দ্র জেলে আর পাঁচজন সহকর্মী নেতার মত বসে থাকতে পারেন না। অন্তরের জ্বালায় তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন : কয়েদখানায় বন্দীজীবন কাটানোর অর্থ বিশ্বযুদ্ধের সুযোগের অপব্যবহার। যে করেই হোক, জেলের বাইরে গিয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা দরকার। সুভাষচন্দ্র নির্জ্জন কারাবাসে বসে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর পরামর্শের কথা বারংবার স্মরণ করেন। হয় কারাবরণ, নয়তো বাইরে গিয়ে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য বৃটিশ বিরোধী শক্তির সহায়তা লাভের চেষ্টা। স্বাধীনতা লাভের এই মহান সুযোগ আর হেলায় নষ্ট করা যায় না। তাই তিনি স্থির করলেন, যে করেই হোক, আগে জেলের বাইরে যেতে হবে। তারপর পরবর্তী প্রস্তুতি।

কারাবাসী সুভাষ একদিন ঘোষণা করলেন, বিনা বিচারে অন্যায় ভাবে আটক রাখার প্রতিবাদে তিনি জেলখানায় বসেই অনশন শুরু করবেন।

১৯৪০ সালের ১৯ নভেম্বর। সুভাষচন্দ্র এদিন আমরণ অনশন শুরু করলেন। তাঁর সুপরিকল্পিত পথের প্রথম পদক্ষেপ সারাদেশে অভাবনীয় সাড়া জাগাল। দেশবাসীর ক্ষোভ ও আকাঙ্ক্ষা দুইই বাড়ল। তার মাত্র ক'বছর আগে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করে আমরণ অনশনকারী যতীন দাস শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছিলেন। শহীদ যতীন দাসের স্মৃতি তখনও দেশবাসীর মনে জ্বলজ্বল করছিল। তাই সুভাষচন্দ্রের আমরণ অনশনের সংবাদে সারাদেশ উত্তাল হল। বিদেশী শাসকদের ঔদ্ধত্যকে ধিক্কার জানাতে সহর-গঞ্জে সভা-সমিতি চলল। পত্র-পত্রিকা সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবের নিন্দায় এবং সুভাষচন্দ্রের আদর্শ এবং বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের প্রশংসায় মুখর হল।

অনশনরত সুভাষচন্দ্রের অনশন ভাঙতে দেশের নেতারা একের পর এক অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তিনি অটল-অচল। আপোষহীন নেতার কঠিন মনোভাব অবশেষে বিদেশী শাসকদের শঙ্কিত করল। বুঝল, তাঁর জীবনের মূল্যে সারা দেশে প্রচণ্ড রাজনৈতিক বিস্ফোরণ ঘটবে। অনশনকারী সুভাষচন্দ্র হয়তো মনে মনে তাঁর পরবর্তী কৌশল ও পরিকল্পনা রচনায় মগ্ন হলেন। তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় সরকার পক্ষ বারংবার অনশন ভাঙাতে সচেষ্ট হলেন। কারাকর্তৃপক্ষ এমন কি শেষ অবধি পদস্থ সাহেব সুবারা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে দেখা করে অনশন প্রত্যাহার করতে নানাভাবে অনুনয়-বিনয় করলেন। চিকিৎসকরা উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। ক্লান্ত শ্রান্ত সুভাষচন্দ্র তাঁর শপথে অটল রইলেন। সুস্পষ্ট এবং কঠোর ভাষায় অনশনব্রতী সুভাষচন্দ্র গভর্নরকে লিখলেন :

What greater solace can there be than the feeling that one has lived and died for a principle ? What higher satisfaction can a man possess than the knowledge than his spirit will beget kindred sprits to carry on his unfinished task ? what better reward can a soul desire than the certainty that his massage will be wafted over hills and dales and over the bread plains to every corner of his land and across the seas to distant lands ? What higher consummation can life attain than peaceful self immolation at the alter of one's cause ? This is the technique of the soule. The individual must die, so that the nation may live. To day I must die, so that Indian may live and may win freedom and glory.

গভর্নরের উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্রের এই ঐতিহাসিক পত্রের মর্মকথা ঃ আমি মরব, তাতে ভয় নেই। আছে গৌরব আর মহিমা। ব্যক্তির জীবনের চেয়ে দেশের স্বাধীনতার মূল্য অনেক বড়। তাই অনশনব্রতের মধ্য দিয়ে মহানন্দে আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গণ করতে প্রস্তুত।

এই ধরনের মৃত্যু দেশবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে থাকে এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে অদূর ভবিষ্যতে একদিন আমাদের দেশ তার স্বাধীনতা ও মর্যাদা পুণরুদ্ধারে সমর্থ হবে।

সুভাষচন্দ্রের পত্রের বলিষ্ঠ ভাব আর ভাষা বিদেশী গভর্নরকে সচকিত করল। দেশপ্রেমের এমন জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে মুগ্ধ গভর্নর গভীর সমস্যায় পড়লেন। সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক এই পত্রের সংবাদ এবং বয়ান বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হল। দেশবাসী আরও উত্তেজিত, আরও উৎসাহিত। তরুণ সুভাষচন্দ্রের চিঠির ভাব ও ভাষায় খুঁজে পেল মৃত্যু জয়ের আস্বাদ। দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ এতদিন ঘনীভূত হয়েছিল, এবার যেন তা অগ্ন্যুৎপাতের মুখে।

বিদেশী শাসক সুভাষচন্দ্রের পত্রের গুরুত্ব বুঝলেন। আবার আবেদন নিবেদন। অনশন ভঙ্গ করো—তারপর সব বিবেচনা করা হবে, ইত্যাদি কিন্তু নিষ্ঠা আর শপথে অবিচল সুভাষচন্দ্র। আপোষহীন এই তরুণ নেতা হাসি মুখে কঠিন ভাষায় শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত উত্তর করলেন : No Compromise !

৫ ডিসেম্বর, ১৯৪০। অবশেষে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন। সুভাষচন্দ্র বিজয়ীর হাসি হেসে কারাবাস ছেড়ে ফিরলেন এলগিন রোডের বাসভবনে। কিন্তু সুভাষকে ছেড়ে বিদেশী সরকার নিশ্চিন্ত হতে পারল না। ঘরে বাইরে সর্বত্র সাদা পোষাকে পুলিশ-গোয়েন্দা। তাঁর বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক মামলা

দায়ের করা হয়েছিল, তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলেও সে মামলা বাতিল করা হল না। কিছুদিনের জন্য মুলতুবি রাখা হল মাত্র। উদ্দেশ্য, জনমত কিছুটা শান্ত হলেই আবার ঐসব অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে।

পাঁচ ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন। আর তার পরের মাসে, অর্থাৎ জানুয়ারির ২৭ তারিখে, (১৯৪১) আলিপুরের আদালতে তাঁর হাজিরার দিন পুনরায় নির্দিষ্ট হল।

পরবর্তী মামলার তারিখটা শুনে সুভাষচন্দ্র ক্যালেণ্ডারের দিকে চোখ রাখলেন। তারপর একটু চাপা হাসি হাসলেন। তিনি বুঝলেন, তাঁর পরিকল্পিত পথের প্রথম ধাপে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী পরিকল্পনার কাজ ঐ তারিখের আগেই শেষ করা প্রয়োজন। হাতে সময় মাত্র দেড় মাসের মত।

সুভাষচন্দ্রের কোনও পরিকল্পনার কথা তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিও জানতে পারতেন না। যখন যেটুকু দরকার কেবলমাত্র সেটুকুই তিনি তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মীদের জানাতেন। কারামুক্তি পেয়েও তিনি মূলতঃ গৃহবন্দী হলেন। সকলের মনে, এমন কি বাড়ির লোকজনদের সঙ্গেও তিনি দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করলেন। দুটি কোঠা নিয়ে তিনি থাকতেন। একটি ঘরে তাঁর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। অন্য ঘরে বসে তিনি নীরবে ধ্যান করতেন। কী বা কেন সেই ধ্যান, আজও তা' রহস্যাবৃত। তবে মাঝে মধ্যে তিনি দু' একটি এমন মন্তব্য করতেন যা' পুলিশ গোয়েন্দাদের কাছেও অজ্ঞাত থাকত না। যেমন সন্ন্যাস নিয়ে হিমালয়যাত্রা অথবা দেশজোড়া বৃটিশ-বিরোধী ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলন ইত্যাদি। মাঝে মধ্যে তিনি নিজেকে শারীরিক অসুস্থ এবং দুর্বল বলেও খবর করতেন। পরবর্তীকালে জানা যায়, এসবই ছিল তাঁর দেশান্তরী হওয়ার গোপন কৌশলের অঙ্গ। বৃটিশ গোয়েন্দা পুলিশ অবশ্য এই গোপন কলাকৌশল ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি। বরং সারা দেশ-

ব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রস্তুতির সংবাদে আতঙ্কিত হয়ে তারা ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে গোপন রিপোর্ট পেশ করত। আর সম্ভাব্য আন্দোলন কীভাবে মোকাবিলা করা যায় তা' নিয়ে নিত্য নতুন আলোচনা চলত।

১৯৪১ সালের ২৭ জানুয়ারি। আলিপুরের আদালতে সুভাষচন্দ্রের হাজিরার দিন নির্দ্দিষ্ট। অথচ দেখা গেল, সুভাষচন্দ্র তাঁর ঘরে নেই। তিনি নিখোঁজ, উধাও! কী করে তা' সম্ভব! তাঁর বাসভবন ঘিরে ঝানু গোয়েন্দা আর পুলিশের দিবানিশি অতন্দ্র প্রহরা। কাক-পক্ষীটিরও পুলিশের চোখে ধুলি দিয়ে বেরুবার অথবা ঢুকবার উপায় নেই। পুলিশ প্রশাসন কেঁপে উঠল। থানায় থানায় জরুরী বার্তা গেল। শেষঅবধি ভারতের সর্বত্র জরুরী গোপন বার্তা পাঠিয়ে পুলিশ গোয়েন্দাদের সতর্ক করে বলা হল: সুভাষচন্দ্র পলাতক! BE ALERT.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করে বিদেশ যাত্রার গোপন পরিকল্পনা নেন। তখনই তিনি বুঝতে পারেন, স্বদেশে বসে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন অসম্ভব কিন্তু তার নাগপাশ থেকে স্বদেশভূমিকে মুক্ত করতে হলে চাই ব্যাপক সামরিক অভিযান এবং সেই ধরনের অভিযানের প্রস্তুতিপর্বের জন্য চাই বিদেশীশক্তির সাহায্য। এই মানসিকতা বহুদিন তাঁকে নানা পরিকল্পনা গ্রহণে উৎসাহ যোগাচ্ছিল।

সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করেন ১৯৪১ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে কিন্তু তার এক বছর, অর্থাৎ কারাবাসের আগেই তিনি দেশত্যাগের পূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তারপর ধাপে ধাপে বিভিন্ন আন্দোলন আর তৎপরতার মাধ্যমে তিনি নির্দ্দিষ্ট পথ ধরে অগ্রসর হন।

সেটা ১৯৪০ সালের জুন মাসের কথা। জনৈক রামকিষেণ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মরদন জেলার চাল্লাঢের নামক এক গ্রামে

গিয়ে হাজির হলেন। বর্তমানে ঐ জেলা পশ্চিম পাকিস্থানের অধীন। রামকিষেণের ঐ গ্রামে যাওয়ার উদ্দেশ্য, বিশ্বস্ত কোনও একজন পথপ্রদর্শক খুঁজে বার করা। ঐ গ্রামেই বাস করতেন, ভগৎরাম তলওয়ার। ভগৎরামের সঙ্গে উপজাতি এলাকার বেশ ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল। এছাড়াও ভগৎরাম পরিবারের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের এক ঐতিহ্য ছিল। তাঁর বড় ভাই হরিকিষেণ সিং। ১৯৩০ সালের ২৩ ডিসেম্বর পাঞ্জাবের ছোটলাট স্যার জিওফ্রেদ্য মণ্টোমরেনসিকে গুলি করেন। তিনি গ্রেপ্তার হন; এবং ৯ জুন ১৯৩১ সালে বৃটিশ সরকার তাঁর ফাঁসি দেয়। ভগৎরাম তলোয়ারের পারিবারিক পরিচয়ের সঙ্গে তাঁর আর একটি ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথাও বিশেষ দূত রাম কিষেণের জানা ছিল। ভগৎরাম তখনকার দিনে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে কীর্তি পার্টির গোপন কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। ফরোয়ার্ডব্লক দলের সঙ্গেও ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। পরিবারের পূর্বাপর ইতিহাস সম্পর্কে নানা খোঁজখবর নেওয়ার পরই রামকিষেণ তাঁর শরণাপন্ন হন এবং ক্রমে তাঁর কাছে এক গোপন পরিকল্পনার কথা খুলে বলেন। সেই পরিকল্পনার প্রথম সর্ত ছিল, সুভাষচন্দ্র বসু যদি কখনও ঐ অঞ্চলে আসেন, তবে উপজাতিদের সহায়তায় আফগানিস্তান হয়ে কীভাবে কোন পথে তাঁকে সোভিয়েত রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়া যায়, তার একটা গোপন ব্যবস্থা করা। তার অনেক আগে অবশ্য কলকাতায় "দেশ দর্পণ" পত্রিকার সম্পাদক নিরঞ্জন সিং তালিবের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র স্বয়ং তাঁর ঐ গোপন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। সেই আলোচনার সূত্র ধরেই বিভিন্ন কর্মী এবং দূতের মারফৎ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রান্তসীমায় সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগের গোপন পরিকল্পনা কার্যকর করার এই প্রস্তুতি চলে।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেযখন সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগের গোপন

পরিকল্পনা রূপায়ণের তৎপরতা চলছে, তখন এক অভাবিত ঘটনা ঘটল কলকাতায়। ময়দানের হলওয়েল মনুমেণ্টকে (বর্তমান নাম শহীদ মিনার) সুভাষচন্দ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔদ্ধত্যের প্রতীক রূপে মনে করতেন। তিনি ঐ মনুমেণ্ট অপসারণের জন্য বৃটিশ সরকারের কাছে দাবীপত্র পেশ করেন। সুভাষচন্দ্রের এই নতুন আন্দোলনের সূত্র ধরে বৃটিশ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। সেই সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগের গোপন পরিকল্পনা কার্যকর করার অন্যতম সহায়ক ভগৎরাম তলওয়ার একটু বিস্মিত এবং দ্বিধাগ্রস্ত হন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

সংবাদপত্র থেকে জানলাম হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের জন্য বাঙলা সরকারের কাছে সুভাষচন্দ্রের চরম পত্রের কথা। আমরা একটু ধাঁধায় পড়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম না, এটা কি গভর্নমেণ্টকে ভুল পথে নিয়ে যাবার জন্য একটা চাল, না মূল পরিকল্পনার কোন পরিবর্তন করা হয়েছে। অবশ্য নিশ্চিন্ত ছিলাম যে সরকারকে অন্য দিকে নিয়ে যাবার চাল হলেও তাঁর চরম পরিকল্পনাটিকে আমাদের পালন করতেই হবে। আচ্ছর সিং চিনা (ইনিও পরিকল্পনা রূপায়ণের একজন সহযোগী) যখন কলকাতা গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ব্যবস্থার কথা বলেন, তখন সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত বিচলিত হন। চিনাকে তিনি বলেন, যদি তিনি গ্রেপ্তার হন, তাহলে অবশ্য পরিকল্পনাটি স্থগিত রাখতে হবে। না হলে তাঁর যাত্রার একটা কর্মসূচী তৈরী করতে হবে।...

তাঁর গ্রেপ্তারের পর কর্মসূচী স্থগিত রাখা হলেও, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হবে। পরিকল্পনা কার্যকর করতে গেলে যাতে সবকিছু অবাধভাবে চলে, অসুবিধা না হয়। সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল না। তাই রামকিষেণকে কাবুলে গিয়ে নতুন করে যোগাযোগ স্থাপনে বলা হল।

…রামকিষেণ ও আচ্ছর সিং চিনা উভয়েই সরাসরি কাবুলের পথে গিয়েছিলেন। তাঁরা দু'জনে স্থির করলেন, নিজেরাই আরও এগিয়ে যাবেন। আফগানিস্তান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তে আমুনদী তাঁরা পার হওয়ার চেষ্টা করলেন। আচ্ছর সিং চিনা সফল হলেন বটে, কিন্তু রামকিষেণ জলমগ্ন হলেন।…

সুভাষচন্দ্রের স্বদেশ ত্যাগের গোপন পরিকল্পনা কার্যকর করার অন্যতম অগ্রদূত রামকিষেণ যখন সোভিয়েত সীমান্তে একটি পাহাড়ী নদীর খরস্রোতে ভেসে গিয়ে জীবন দিলেন, তখন মহানায়ক সুভাষ আলিপুর সেনট্রাল জেলে তাঁর দেশত্যাগের স্বপ্নে বিভোর। তাঁর চোখে তখন বিরাট এক আজাদী বাহিনী গড়ার স্বপ্ন। কারান্তরাল থেকে তিনি তাঁর পরবর্তী কর্মপদ্ধতি রচনায় ব্যস্ত। তাঁর সেই ব্যস্ততা আর গোপন পরিকল্পনার সূত্র ধরে শুরু হল সুভাষচন্দ্রের পরবর্তী জীবনেতিহাস।

১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি। এদিন মধ্যরাত্রে রহস্যজনক ভাবে সুভাসচন্দ্রের অন্তর্ধান ঘটে। তার বেশ কিছুদিন আগেই সুভাষচন্দ্র কারামুক্ত হন। অসুস্থতার অছিলায় এলগিন রোডের বাড়িতে জেল থেকে ফিরে আসা সম্ভব হলেও, বৃটিশ সরকার তাতে নিশ্চিন্ত থাকতে পারল না। সুভাষচন্দ্রকে তাঁর বাসভবনে গৃহবন্দী বা অন্তরীণ রাখার ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থা বোধহয় তাঁর বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার পক্ষে সহায়ক হল। গৃহবন্দী থাকবার সুযোগে তিনি দাড়ি রাখতে শুরু করেন। ক্রমে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সংখ্যাও হ্রাস পায়। এমন কি, কিছুদিনের মধ্যে তিনি তাঁর পরিবারের লোকজনের সঙ্গেও দেখাশুনা বন্ধ করে দিয়ে নিজেকে দুটি মাত্র কক্ষে আবদ্ধ রাখেন। তখনও কেউ এর কারণ বুঝতে পারেনি। কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে পরিকল্পিত অন্তর্ধানের এটা একটা প্রস্তুতিমাত্র।

দেশত্যাগের প্রথম পর্ব সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র কীভাবে কোনপথে

কলকাতা তথা বাংলার সীমানা পার হন, তার এক বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণের অন্যতম সহকারী ভগৎরাম তলওয়ারের রচনা থেকে। 'সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, এক প্রশ্নের উত্তরে সুভাষচন্দ্র নাকি তাঁকে বলেছিলেন,...১৭ জানুয়ারি (১৯৪১) মধ্যরাত্রের কিছু পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁকে কলকাতার বাড়ি থেকে মোটরে নিয়ে যাত্রা করেন ধানবাদ, তাঁর ভাইয়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে। তাঁরা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে ধানবাদ এসে পৌঁছান ভোরবেলা। ধানবাদ তাঁর ভাইয়ের বাড়ির কিছু দূরে তিনি গাড়ি থেকে নেমে যান এবং ভ্রাতুষ্পুত্র একাই গাড়ি নিয়ে ভাইয়ের বাংলোতে যান। এটা করার কারণ, যাতে বাংলোর কর্মচারীরা সন্দেহ করতে না পারে যে এই অন্তর্ধানের ব্যাপারে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের কোন হাত আছে।

কিছুক্ষণ পরে সুভাষচন্দ্র হাঁটতে হাঁটতে সে বাড়িতে প্রবেশ করেন। তখন তাঁর বেশ ছিল খাঁটি উত্তর-প্রদেশীয় মুসলমানী। পরণে ছিল পায়জামা, আচকান আর মাথায় ফেজ টুপি। ভাব দেখালেন, তিনি কোন এক ইন্স্যুরেন্স অফিসার। তাঁর ছদ্মবেশ ও পোশাক-আষাক এত নিখুঁত হয়েছিল যে তাঁব নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রও তাঁকে চিনতে পারেননি। স্বভাবতই, গৃহে সুভাষচন্দ্র গৃহীত হলেন অপরিচিত আগন্তুকের মত। তাঁকে রাখা হল অতিথিদের ঘরে। বিকালে সুভাষ পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লেন। যেন পথে একটা ট্যাকসি ধরে নেবেন। তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র এবং এক ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ কিছুক্ষণ পরে গাড়ি নিয়ে বেরুলেন। পথে তাঁরা তাঁকে তুলে নিলেন। এবং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে গাড়ি চালিয়ে এলেন গোমো রেলওয়ে স্টেশনের কিছুটা দূর পর্যন্ত। মধ্যরাত্রি নাগাদ দিল্লী-কালকা মেল সেখানে পৌঁছানোর কথা। ততক্ষণ পর্যন্ত নির্জন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁরা কথাবার্তা বলেন। ট্রেনটা যখন স্টেশনে ঢুকছে, ঠিক তখনই সুভাষচন্দ্রকে গাড়ি থেকে নামিয়ে তার

প্রায় আধ মাইল দূরে চলে গিয়ে ট্রেন চলে যাওয়া পর্যন্ত গাড়ির লোকজন অপেক্ষা করলেন। প্রায় আধঘণ্টা বাদে, যখন বুঝতে পারলেন, সুভাষচন্দ্র নিরাপদেই ট্রেনে চড়েছেন, তাঁরা গাড়ি নিয়ে ধানবাদে ফিরে গেলেন।

সুভাষচন্দ্র আমাকে বলেন, ট্রেন যাত্রার প্রথম অংশ ঘটনাপ্রধান ছিল না। তিনি ফার্স্ট ক্লাসে এসেছিলেন। ফ্রন্টিয়ার মেলে তিনি হোতির নবাবের সঙ্গে এক কামরাতেই আসেন। এই নবাবটি অতি ধনী ব্যক্তি। তিনি শুধু অন্যের সম্পদ সম্পর্কেই আগ্রহী ছিলেন; এবং তাদের সম্পদের সঙ্গে নিজের সম্পদের তুলনা করছিলেন। তিনি এই নবাবের সঙ্গে কথোপকথন উপভোগ করছিলেন। অনেক গল্পও শুনিয়েছিলেন।...

২৭ জানুয়ারি আলিপুরের আদালতে হাজিরার দিন। কারাজীবন থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাঁকে গৃহবন্দী রাখা হলেও, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত নানা অভিযোগের মামলা তখনও সরকার চালিয়ে যাচ্ছেন। সরকার, গোয়েন্দা-পুলিশ, এমন কি দেশবাসী তখনও জানত ২৭ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র আলিপুরে আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড়াবেন। কিন্তু তার আগের দিন রেডিও এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ সারাদেশে ছড়িয়ে দিল। তাতে বলা হল, সুভাষচন্দ্রের কোনও খোঁজ নেই। গৃহবন্দী সুভাষ পুলিশ-গোয়েন্দার চোখে ধুলি দিয়ে উধাও কবে, কখন কীভাবে তাঁর অন্তর্ধান ঘটল, কেউ তার সঠিক হিসাব দিতে পারল না। বৃটিশ প্রশাসন কেঁপে উঠল। সারাদেশে চাঞ্চল্য, পুলিশ সামরিক বাহিনী তৎপর। বেতার তরঙ্গে সর্বত্র সুভাষচন্দ্রকে পাকরাও করার জরুরী বার্তা।

১৬ জানুয়ারি। আপোষহীন নেতা সুভাষচন্দ্রের খোঁজে যখন সারাদেশ তোলপাড়, তখন সুভাষচন্দ্র আর সুভাষচন্দ্র নন, তিনি তখন নেতাজী। ভিন্ন রূপে ওতদিনে তিনি ভারতের সীমানা অতিক্রম করেছেন।

২৬ জানুয়ারি যখন বৃটিশ প্রশাসন নেতাজীর রহস্যজনক অন্তর্ধানের খবর প্রথম জানতে পারলেন, সেদিনই তিনি ভারত সীমান্ত তথা বৃটিশ শাসনের নাগপাশ অতিক্রম করে আফগানিস্তানের উপজাতি অঞ্চলে ঢুকে পড়েছেন। এ প্রসঙ্গে ভগৎরাম তলওয়ারের জাবানী উল্লেখ্য। তিনি লিখেছেন: ২৬ জানুয়ারি, ১৯৪১, ভোর ৬ টা আমরা যাত্রা শুরু করলাম। তখনও একটু অন্ধকার রয়েছে। গাড়িতে ছিলাম আমরা পাঁচজন। নেতাজী, আবাদ খাঁ, ড্রাইভার, গাইড বা পথপ্রদর্শক ও আমি। জামরুড চেকপোস্টে যথারীতি গাড়ি চেক করা হল। আমরা এগিয়ে চললাম। এবং প্রায় ১১ মাইল দূরে খাজুরি ময়দান মিলিটারি ক্যাম্পে এসে পৌঁছলাম। যে জায়গায় এসে গাড়ি থেকে নামলাম, সেখান থেকে একটা পথ চলে গেছে পাহাড়ের দিকে। জায়গাটা উপজাতি সীমান্ত থেকে এক ফার্লং দূরে। সেখানে আমাদের নেমে পড়াটা আদৌ অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। মিলিটারি ক্যাম্পটা সেখান থেকে এক ফার্লং দক্ষিণে। গাড়ি থেকে নেমেই আমরা তিনজন এগিয়ে চললাম। আবাদ খাঁ আর ড্রাইভার সেখানেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। গাড়িটা যেখানে থেমেছিল, সেখানেই উপজাতি এলাকা ও বৃটিশ এলাকার সীমান্ত। আমরা এ পথটাই বেছে নিয়েছিলাম। যদিও এটা মিলিটারি ক্যাম্পের বেশ পাশ দিয়েই গেছে। উপজাতি অঞ্চলের প্রায় এক ফার্লং ভিতরে এক মুসলমান পীরের দরগা আছে। সেখানে শ্রদ্ধা জানাতে ও আশীর্বাদ নিতে লোকজন যায়। গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। যাতে মনে হয়, কেউ বুঝি পীরের দর্শনে গেছে—আবার গাড়িতেই ফিরে আসবে।

বৃটিশ সীমান্ত পার হতে হলে আমাদের যে মাত্র এক ফার্লং গিয়ে উপজাতি এলাকায় ঢুকতে হবে, নেতাজীকে একথা না বলে, মনে হয় ভুল করেছিলাম। সীমান্ত পেরিয়ে মাইল দুয়েক যাওয়ার পর নেতাজী বললেন, তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। আমরা থেমে আগুন

জ্বালালাম এবং তাঁর শয়নের ব্যবস্থা করলাম। তিনি যখন বিশ্রাম নিচ্ছেন, তখন তাঁকে জানালাম যে, আমরা ইতিমধ্যে দেড় মাইল পেছনে বৃটিশ সীমান্ত অতিক্রম করে এসেছি। তাঁর উপর এই খবরটির প্রভাব লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠল। মনে হল, যেন তাঁর শ্রান্তি অতি তাড়াতাড়ি কেটে গেল। এই দেড় মাইল পথ অতিক্রম করতে আমাদের প্রায় দু'ঘণ্টা সময় লেগেছিল। কারণ পথটা ক্রমশ উপরের দিকে উঠে গিয়েছিল।...

দীর্ঘ পরিক্রমা এবং গোপন তৎপরতার যে মানসিক উদ্বেগ ছিল নেতাজী তাতে বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন। ৩০ জানুয়ারী প্রাতঃরাশ সেরে কাবুলের পথে তিনি একটি টাঙ্গা ভাড়া করে আবার যাত্রা শুরু করলেন। অবশেষে পরদিন ৩১ জানুয়ারি সকাল ১১টা নাগাদ কাবুল সহরে গিয়ে পৌঁছুলেন।

কাবুল পৌঁছে নেতাজী অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন বটে কিন্তু সেখানে সাময়িক বিরতিকে তিনি পুরোদস্তুর কাজে লাগাতে উদ্যোগী হলেন। বৃটিশ শাসনের বাইরের ঐ দেশ থেকে নেতাজী প্রথমে রাশিয়া যাত্রার কথা ভাবেন। সুতরাং কাবুল পৌঁছবার পরদিনই অর্থাৎ ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১ তিনি সেখানকার রুশকর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন কিন্তু সে যোগাযোগ সফল হয় না। তারপর নেতাজী স্থানীয় জার্মান কূটনীতিকদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গী-সহচর ভগৎরাম তলওয়ার লিখেছেন: নেতাজী প্রথমে দেখা করলেন এক তরুণ জার্মানীর সঙ্গে। তাঁকে চিত্র সম্বলিত কাগজপত্র দেখালেন। নেতাজী তাঁকে তাঁর উদ্দেশ্যের কথা বললেন। বাইরের পরিস্থিতি কী তাও জানালেন এবং বললেন যে, তাঁর পক্ষে বাঞ্ছনীয় হল তাঁদের রক্ষাবেক্ষণে থাকা। তরুণ জার্মানটি জানালেন যে তাঁর মনে হয়, নেতাজীকে তাঁদের পর্যবেক্ষণে রাখা সম্ভব হবে। তারপর তিনি মিনিস্টারের সঙ্গে নেতাজীর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। নেতাজী তাঁকেও তাঁর উদ্দেশ্য ও কর্ম-

সূচী বুঝিয়ে বলেন। মিনিস্টার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে আনন্দ প্রকাশ করে বলেন যে, তাঁদের পক্ষে তাঁকে লিগেশনে চাকরীরত আফগান কর্মচারীদের দৃষ্টির আড়ালে রাখা হয়তো সম্ভব হবে না। তাই তাঁদের সঙ্গে থাকাটা নেতাজীর পক্ষে ক্ষতিকর ও ঝুঁকির ব্যাপার হবে। তিনি অবশ্য প্রতিশ্রুতি দিলেন, অবিলম্বে বার্লিনকে বিস্তৃত সংবাদ পাঠিয়ে তার নির্দেশ চাইবেন। তিনি তাঁকে বাইরে যোগাযোগের জন্য একজনের নাম বলে দিলেন। ইঁনি হলেন হের টমাস। কাবুলে সীমেন্স-এর অন্যতম প্রতিনিধি।

তিনদিন বাদে আমরা দুজনেই হের টমাসের অফিসে গেলাম। আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তখন হের টমাস ছিলেন না। আর একজন জার্মান রেডিও ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। নেতাজী তাঁর সঙ্গে জার্মান ভাষায় কথা বললেন। আধঘণ্টা বাদে আবার ফিরে এলাম। তখন হের টমাস ছিলেন। নেতাজী টমাসের কাছে নিজের এবং আমার পরিচয় দিলেন এবং জানতে চাইলেন তাঁর জন্য কোন বার্তা আছে কিনা। টমাস জানালেন, তাঁকে এই বার্তা জানাতে বলা হয়েছে যে, বার্লিন তাঁর সফল অন্তর্ধানে অত্যন্ত আনন্দিত এবং তাঁর যে সাহায্য দরকার সেই সাহায্য দিতে জার্মান লিগেশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে বার্লিন আফগানিস্তান থেকে তাঁর নিরাপদ যাত্রার জন্য চেষ্টা করছে।

ওদিকে বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা তখন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ফলে, বিশ্বরাজনীতির নিত্য পরিবর্তন ঘটছে। নেতাজীর কূটনৈতিক মন অস্থির হয়ে উঠল। পরিবর্তনশীল বিশ্বরাজনীতির এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে কীভাবে পরাধীন ভারতভূমিকে বৃটিশাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করা যায়—সেই ভাবনায় নেতাজী চঞ্চল হয়ে উঠলেন। একটি দিন তাঁর কাছে তখন মহা মূল্যবান।

এরপর জার্মান মিনিস্টারের সঙ্গে একের পর এক যোগাযোগ চলল। ২৩ ফেব্রুয়ারি ভগৎরাম তলওয়ার ফের টমাসের অফিসে

গেলেন। উদ্দেশ্য, বার্লিন থেকে নতুন কোন বার্তা আছে কিনা তা জানা। তিনি অবশ্য জানতে পারলেন, নেতাজীর বিদেশ যাত্রা ও প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য ইতালীর মিনিস্টারের সঙ্গে তাঁদের পরবর্তী যোগাযোগ রাখতে হবে। এ বিষয় জার্মান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইতালি সরকারের একটা গোপন বোঝাপড়া হয়েছে।

নির্দেশমত ভগৎরাম তলওয়ার কাবুলস্থ ইতালিয়ান লিগেশন অফিসে গেলেন। সেখানে ইতালীর মিনিস্টারের সঙ্গে পরিচয় হল। ভগৎরাম তাঁর কাছে নিজেকে রহমৎ খাঁ নামে পরিচিত করলেন। এ প্রসঙ্গে ভগৎরাম বলেছেন: তাকে জানালাম সুভাষচন্দ্রকে কাবুল পর্যন্ত এনেছি। ৩১ জানুয়ারি থেকে এখানে আছি। তিনি বললেন যে, জার্মান মিনিস্টার তাঁকে বলেছেন, আমরা নাকি নিজেরাই যেতে চাইছি। সেটা একটু ঝুঁকির কাজ হবে—আফগানিস্তানেই নয়, রাশিয়াতেও বটে। তিনি বললেন, তিন অক্ষশক্তির সরকার মিলিতভাবে সোভিয়েত সরকারকে অনুরোধ করেছেন, সুভাষচন্দ্র বসুর জন্য ট্রানজিট ভিসা ইস্যু করার জন্য।···

ট্রানজিট ভিসা দেওয়ার জন্য সোভিয়েত কর্তৃপক্ষকে অক্ষশক্তির সরকারগুলি যে অনুরোধ করেছিলেন, সে সম্পর্কে শেষঅবধি কী হয়েছিল, আমার তা সঠিক জানা নেই। তবে ঘটনা হল, নেতাজী আফগানিস্থান ত্যাগ করেছিলন অরল্যাণ্ডো কাৎজ্ঞাওয়ার নামে একটা পাশপোর্টের সাহায্যে—পথ ছিল রাশিয়া হয়ে।···

কাবুলে ইতালীয়ান লিগেশনের দ্বিতীয় সেক্রেটারির নাম ছিল মিঃ ক্রেশিনি। নেতাজীর কাবুল ত্যাগপর্বে তিনি নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করেন। ইতালী—কর্তৃপক্ষ নেতাজীর কাছে তিনটি বিকল্প পরিকল্পনা পেশ করলেন। (ক) রুশদের কাছ থেকে ট্র্যানজিট ভিসা নিয়ে তার সাহায্যে বিদেশ পাড়ি, (খ) ক্যুরিয়ার পরিকল্পনা অথবা (গ) ইরান ও সিরিয়ার মধ্য দিয়ে যাত্রা।

নেতাজী কাবুল ত্যাগ করেন ১৮ মার্চ, ১৯৪১। তারও প্রায়

এক সপ্তাহ আগে ইতালীয় মিনিস্টার আলবার্ত পিয়েত্রো কোয়ারোনির স্ত্রী শ্রীমতী কোয়ারোনি নেতাজীর পাশপোর্টের জন্য প্রয়োজনীয় ফটো তোলার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তাঁর পোশাক-আষাক, স্যুটকেশ ও বিদেশ যাত্রার জন্য দরকারী জিনিসপত্রও তিনি জোগাড় করে দেন। এই বিদেশিনী প্রয়োজনীয় গোপন বার্তাও নিয়মিতভাবে বহন করতেন এবং নেতাজীর সহযোগীদের কাছে তা' পৌঁছে দিতেন।

পূর্ব পরিকল্পনা মত ১৭ মার্চ সন্ধ্যায় নেতাজী তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে ইতালীয় লিগেশনের দ্বিতীয় সেক্রেটারি মিঃ ক্রেশিনির বাড়ি উপস্থিত হলেন। তার আগে নেতাজী সহকর্মীদের নিয়ে শেষবারের মত কাবুল শহর ঘুরে দেখলেন। সেখানে পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গেও তিনি দেখা সাক্ষাৎ করে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।
মিঃ ক্রেশিনির বাড়িতে তাঁর নৈশভোজ সভায় ক্রেশিনি ছাড়া আরও কয়েকজন ইতালীয় কূটনীতিক উপস্থিত ছিলেন অনেক রাত্রি পর্যন্ত নেতাজীর ভবিষ্যত কর্মসূচী ও পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হল। কাবুলে নেতাজীর শেষ দিন সম্পর্কে তাঁর সঙ্গী ভগৎরাম তলোয়ার লিখেছেন: নেতাজী ও আমি সে রাত্রে শয়ন করলাম অতিথি কক্ষে। পরদিন ১৮ মার্চ সকালে, অন্ধকার থাকতে থাকতেই তাঁরা চলে গেলেন। ডঃ ওয়েনগার ও জার্মান লিগেশন থেকে আরেক ভদ্রলোক আগে থেকেই এসেছিলেন। গাড়িতে সবশুদ্ধ পাঁচজন যাত্রী ছিলেন: নেতাজী, ডঃ ওয়েনগার, অন্য জার্মান ভদ্রলোক, একজন ইতালীয় এবং একজন ড্রাইভার——সেও বিদেশী।...

সারা ভারতে বৃটিশরাজ যখন সর্বশক্তি দিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে খুঁজে বার করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাদের সার্বিক তৎপরতা আর অভিযানে যখন সারাদেশ মথিত তোলপাড়, তখন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারত আফগানিস্তান পার হয়ে রাশিয়ার পাহাড়ি পথ ধরে

এগিয়ে চলেছেন এক নতুন অভিযানের স্বপ্ন নিয়ে। সুভাষচন্দ্র বসু তখন নেতাজী, আর নেতাজীর নকল নাম তখন অরল্যাণ্ডো কাৎজাওয়ার।

১৯৪১-এর মার্চ মাস।

কাবুল থেকে অরল্যাণ্ডো কাৎজাওয়ার ওরফে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু মস্কোয় গিয়ে উপস্থিত হলেন। ইতালীয় পাশপোর্টের সাহায্যে মার্চের শেষ সপ্তাহে ছদ্মনামে সুভাষচন্দ্র সোভিয়েট রাশিয়ায় পৌঁছলেন অনেক আশা আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। প্রথমে তাঁর ইচ্ছা ছিল, রাশিয়ার সহায়তায় মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদশক্তি বৃটিশের কবল থেকে মুক্ত করা। তিনি ভেবেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক দেশ তাঁর আবেদনে সাড়া দেবে। কিন্তু তৎকালীন বিশ্বরাজনীতির পঙ্কিল আবর্ত ও পরিস্থিতিতে তাঁকে হতাশ হতে হল। সোভিয়েত রাশিয়ার সামনেও তখন বিপদের কালো মেঘ ঘনায়মাণ। হিটলারের নেতৃত্বে জার্মান তখনকার দিনে বিশ্বের এক অপ্রতিহত শক্তি। রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ অনুমান করতে পেরেছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জার্মান হয়তো অক্ষশক্তি নিয়ে তাদের দেশের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাবে। সুতরাং সেই চরম মুহূর্তে হিটলারের স্বপ্ন ও সাধ চূর্ণ করতে দেশের স্বার্থে রাশিয়াকে বৃটেন ও আমেরিকার সাহায্যপ্রার্থী হতে হবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ বৃটেনের সঙ্গে একটা গোপন সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্রিয় ছিল। অতএব বিশ্বরাজনীতির সেই চরম মুহূর্তে রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নেতা বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রকে কূটনৈতিক আশ্রয় এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়ে বৃটেনের বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি নিতে চায়নি। রাশিয়ার এই মনোভাব বুঝতে পেরে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে বেশ হতাশ হতে হয়। এছাড়া নেতাজীকে সাহায্য করতে রাশিয়ার অপারগতার অন্য একটি কারণও থাকতে পারে। রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ তার কয়েক বছর আগে সুভাষচন্দ্রকে সোভিয়েত দেশ সফরের জন্য

আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করে সেই সময় সুভাষচন্দ্র রাশিয়া যেতে পারেননি। তিনি তখন শারীরিক দিক থেকে অসুস্থ ছিলেন। রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ সুভাষচন্দ্রের ঐ অসুস্থতাকে 'রাজনৈতিক অসুখ' বলে মনে করেছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি একারণেও হয়তো তদানীন্তন রুশ কর্তৃপক্ষের কিছুটা অভিমান অথবা ক্ষোভ থেকে থাকতে পারে। যে কারণেই হোক, শেষপর্যন্ত রাশিয়ার সহযোগিতার অভাবে নেতাজী মস্কো ছেড়ে জার্মান যাত্রার পরিকল্পনা নিতে বাধ্য হন।

বৃটিশ শক্তির বিরোধী জার্মান বাহিনীর গতি তখন অপ্রতিহত। হিটলারের নেতৃত্বাধীন জার্মানের সঙ্গে বৃটেন আমেরিকার লড়াই সারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে তুলল। নেতাজী কৌশলগত কারণে শত্রুর শত্রুকে মিত্র রূপে বরণ করে নিলেন। স্বদেশভূমির মুক্তির প্রশ্নই তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিল।

এছাড়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র আগে থেকেই খবর রেখেছিলেন, আফ্রিকার উত্তর উপকূলে বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে জার্মান-ইতালী সেনাদের যে তুমুল যুদ্ধ চলছিল, তাতে বৃটিশ বাহিনী চূড়ান্তভাবে বিধ্বস্ত হয়। যুদ্ধে টুবার্ক ঘাঁটি পতনের সময় জার্মান এবং ইতালী সেনাদের হাতে যেসব বৃটিশ বাহিনী গ্রেপ্তার হয়, তার অধিকাংশই ছিল ভারতীয় জওয়ান। ধৃত সেইসব জওয়ানদের ইতালী নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রবাসী ভারতীয় এক বিপ্লবী বাবা অজিত সিং সেইসব যুদ্ধবন্দী ভারতীয় জওয়ানদের নিয়ে একটি দল গঠনের চেষ্টা করছিলেন। ইতালী এবং জার্মান সরকার বাবা অজিত সিং-এর কাজে নানাভাবে সাহায্য এবং সহযোগিতা করছিলেন। ঐ দুই দেশের রণবিশারদগণ বুঝতে পেরেছিলেন, ধৃত জওয়ানদের বৃটিশ বিরোধী মানসিকতা ব্যাপকতর করতে পারলে তাদের যুদ্ধজয়ের পথ আরও সুগম হবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হল না। তিনি স্থির করলেন, রাশিয়া অথবা জার্মান-ইতালী যে দেশই হোক, সাম্রাজ্যবাদ-শক্তির বিরোধীতায় যে শক্তি তাঁকে সসম্মানে সহায়তা করতে এগিয়ে আসবে, তাকেই তিনি স্বাগত জানাবেন। দেশের মুক্তির প্রয়োজনে, পরাধীন জাতির স্বাধীনতা লাভের তাগিদেই তিনি তা' গ্রহণ করবেন। তিনি ভাবলেন, রাশিয়া যদি তাঁর স্বার্থে বৃটিশশক্তির সাহায্যপ্রার্থী হতে পারে, তবে তিনি কেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাহায্যের জন্য জার্মান-ইতালীর ব্যাপক প্রভাব এবং শক্তিকে সুকৌশলে কাজে লাগাবেন না।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র, অতএব, বিনা দ্বিধায় মস্কো ছেড়ে চলে গেলেন জার্মানের রাজধানী বার্লিন সহরে। ভারত থেকে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হয়ে কাবুল, কাবুল থেকে মস্কো, মস্কো থেকে বার্লিন! মাত্র তিন মাসের মধ্যে ছদ্মবেশধারী ছদ্মনামে নেতাজী সুভাষচন্দ্র কখনও রেলপথে, মোটরযানে, কখনও টাঙ্গায় অথবা পায়ে হেঁটে প্রথম পর্যায়ের অভিযান শেষ করলেন। বার্লিন সহরে তিনি নতুন নন। ১৯৩৫ সালে অর্থাৎ তার প্রায় বছর ছয়েক আগে তিনি আর একবার জার্মান গিয়েছিলেন। তখন ব্যক্তিগতভাবে বিশিষ্ট কিছু জার্মান শিক্ষাবিদ রাজনীতিবিদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপিত হয়। সরকারী পর্যায়ে তেমন কোন পরিচয় না ঘটলেও, জার্মানের কিছু যুব ও প্রবীণ নেতার সঙ্গে তাঁর তখন বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। অতএব, এই রাজনৈতিক সফরের সময় পুরানো সখ্যতায় তিনি বেশ উপকৃত হন। জার্মান বিদেশ দপ্তর ইতালীয় পাশপোর্টধারী অরল্যাণ্ডো মাৎজাওয়ারের আসল নাম, তাঁর পূর্ব পরিচয় এবং ঐ দেশ সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকিবহাল ছিলেন। কারণ আগে থেকেই কাবুলস্থ জার্মান প্রতিনিধি নেতাজীর বৈপ্লবিক জীবন, তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে এক গোপন রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন।

নেতাজীর উপস্থিতি এবং উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, জার্মান সরকার

তাঁকে তেমনভাবে গ্রহণ করতে পারল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্কট সমস্যায় জার্মান সরকার তখন বিশেষভাবে বিব্রত। যুদ্ধের দ্রুত প্রসার, বৃটেন আমেরিকার সঙ্গে রাশিয়ার গোপন মত বিনিময় ইত্যাদির খবর, বিশ্বরাজনীতির গতিপ্রকৃতি এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সদ্যাগত নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে কীভাবে গ্রহণ করবেন জার্মান সরকার তা প্রথমে স্থির করতে পারছিলেন না।

সেবার সুভাষচন্দ্র জার্মানে এসেছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের একজন নেতারূপে। এবার এসেছেন জাতির মহানায়ক রূপে। সঙ্গে বিরাট পরিকল্পনা। নেতাজী অতএব সহজে হতাশ হলেন না। জার্মান সরকারের কাছ থেকে একটা স্বীকৃতি আদায়ের জন্য নতুনভাবে তিনি উদ্যোগী হলেন এবং যতদিন পর্যন্ত তা' তিনি আদায় করতে না পারলেন, জার্মান বিদেশ দপ্তরের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রেখে চললেন।

জার্মানের বিদেশ দপ্তর অবশ্য আগে থেকে নেতাজী বসু সম্পর্কে মোটামুটিভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাদের পুরানো ফাইলে ভারতস্থ জার্মান কূটনৈতিক সূত্রে প্রাপ্ত গোপন রিপোর্টে নেতাজীর মতাদর্শ, সংগ্রামী জীবন ও তাঁর আন্দোলনের বিভিন্ন বিবরণ যথাযথভাবে উল্লেখ ছিল। বিশ্বযুদ্ধের আগে কলকাতাস্থ জার্মান কনসাল জেনারেল ভারতীয়, বিশেষ করে কলকাতার রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে, যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, তাতেও সুস্পষ্ট ভাষায় সুভাষচন্দ্রকে বৃটিশ বিরোধী জনপ্রিয় নেতা বলে অভিহিত করা ছিল। এছাড়াও কাবুলের জার্মান প্রতিনিধির মাধ্যমেও সুভাষচন্দ্রের ভাবনা চিন্তা, উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে সর্বশেষ রিপোর্ট জার্মান বিদেশ দপ্তর পেয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর চিন্তাধারা, পরিকল্পনা এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জার্মান সরকারের ধারণা খুব একটা অস্পষ্ট ছিল না। কিন্তু তা সত্বেও বিশ্বযুদ্ধের ভারে ভারাক্রান্ত জার্মান বিদেশ দপ্তর নেতাজীর বিষয়ে কোন পাকা সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়দায়িত্ব

নিজেদের হাতে নিতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। এতএব বিশ্বরাজনীতির জটিল পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিদেশ দপ্তর, নেতাজী বসু বিষয়ক বিভিন্ন রিপোর্ট উল্লেখ করে তার নথিপত্র সরাসরি হিটলারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

নেতাজী বিদেশ দপ্তরের সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে একটু নিশ্চিন্তই হলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দেশত্যাগ ও বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করে হিটলার তাঁকে কূটনৈতিক আশ্রয় দান এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে দ্বিধা করবেন না।

ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্পর্কে হিটলারের বাস্তব অভিজ্ঞতা খুব স্বচ্ছ ছিল না। তিনি বৃটিশ সূত্রে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্পর্কে যেটুকু খবর পেতেন, তার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, চারিত্রিক ও অন্যান্য দিক সম্পর্কে একটা আবছা ধারণা গড়ে তুলেছিলেন। ফলে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর প্রতি তার খুব একটা শ্রদ্ধার ভাব ছিল না। ভারতবর্ষকে হিটলার একটি বৃটিশ উপনিবেশ রূপেই মনে করতেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, যে জাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী বিদেশী শাসক শক্তির পদানত থেকেও কোনোরকম মুক্তি আন্দোলন করে না, তারা ভীরু কাপুরুষের দল। ভারতবাসী যে বৃটিশ বিরোধী বহু সংগ্রাম আন্দোলন করেছে, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে অসহযোগ আন্দোলনের প্লাবনে বিদেশী বৃটিশশক্তিকে যে বারংবার কাঁপিয়ে ভাবিয়ে তুলেছে, সে সংবাদ তিনি জানতেন না। কারণ, প্রথম দিকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর প্রাপ্ত সংবাদের মূল সূত্র ছিল বৃটিশ ও তার প্রভাবিত দেশসমূহ। তদানীন্তন অন্যান্য বিশ্বনেতাদের মত হিটলারও ইংরাজী সাহিত্য আর ইতিহাস-ভিত্তিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সুতরাং প্রথম জীবনে তিনি বৃটেনের চোখ দিয়ে ভারতবর্ষের ছবি দেখতেন। তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল, ভারতবাসী বৃটেনের অধীন থাকতে আগ্রহী। ভারতীয়রা যে প্রথমাবধি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তি আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয়-সচেষ্ট

ছিল, তা তাঁর জানা ছিল না। এবিষয় তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানেরও অভাব ছিল।

ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্পর্কে হীন মনোভাব পোষণের পেছনে হিটলারের অন্য এক অভিজ্ঞতাও যে কাজ করেনি, তা নয়। তিনি ভারতীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনও খবর পেতেন না। অথচ হিটলার যখন প্রথম বিশ্বযু'দ্ধর সময় ইথিওপিয়া সহ বিভিন্ন রণাঙ্গণে সাধারণ সেনারূপে লড়াই করেছেন, দেখেছেন, বৃটিশ বাহিনীর হয়ে লড়াই করে অজস্র ভারতীয় জওয়ান অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন। অর্থাৎ একটা জাতি তার দেশের শোষক-শাসকের হয়ে তাদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখতে যতখানি উৎসাহী, স্বদেশের মুক্তির জন্য ততখানি নয়। বলা বাহুল্য, একপেশে সংবাদ ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে হিটলারের এই মানসিকতা গড়ে উঠেছিল। ফলে ভারতীয়দের সম্পর্কে তাঁর খুব একটা উচ্চ ধারণা ছিল না। অতএব নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বার্লিনে উপস্থিতির খবরে প্রথমে হিটলার দ্বিধাহীন ভাবে তাঁকে সমর্থন জানাতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন। বিদেশ-দপ্তরের কাছ থেকে পাওয়া নেতাজী বসু সম্পর্কে সরকারী বিবরণ এবং নোট দেখেও তিনি সহজে তাঁর পূর্ব মনোভাবের পরিবর্তন করতে পারেন না।

ওদিকে মুসোলিনী নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে রোমে আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতায় তাঁর দেশের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিলেন। সেই আমন্ত্রণ পেয়েও নেতাজী তা' গ্রহণ করলেন না। কারণ, তাঁর মনে হ'ল মুসোলিনীর আমন্ত্রণ এবং নেতাজীর ইতালি বাস তাঁর মূল উদ্দেশ্য সধনে খুব বেশী সহায়ক হবেনা।

বরং বার্লিন গিয়ে হিটলারের সহায়তায় বৃটিশ সাম্রাজ্য বিরোধী সংগ্রামে নামা তাঁর পক্ষে হবে অনেক বেশী লাভজনক। অতএব তার আগে তিনি হিটলারের সঙ্গে সরাসরি কথা বলায় উদ্যোগী হলেন। সরকারী ভাবে নেতাজীর সঙ্গে হিটলারের সাক্ষাৎ ঘটে বেশ কয়েক

দিন পর। তার আগে হিটলারের পরামর্শ সমিতি নাজি (NAZI) সদস্যদের সঙ্গে নেতাজীর রাজনৈতিক আলাপ আলোচনার সুযোগ হয়। নাজির সদস্যরা ছিলেন জার্মান সমাজতন্ত্রী দলের সদস্য। নাজিদের সঙ্গে কথাবার্তা আর আলাপ আলোচনা খুব একটা ফলপ্রসূ হল না। তারা যে সর্তে নেতাজীকে সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দেন, নেতাজী তা' প্রত্যাখান করেন এবং তাদের বলেন, কোন জাতীয়তাবাদী নেতাই তাঁর দেশ ও জাতির স্বার্থের পরিপন্থী কোন চুক্তি বা সর্তে সম্মত হতে পারে না।

নাজি প্রতিনিধিদের সঙ্গে নেতাজীর আলোচনা শেষঅবধি ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হল। নেতাজীকে যুক্তিতর্কে নানাভাবে এবং একটু মোলায়েম অথচ হুমকির সুরে নাজি প্রতিনিধিরা তাদের সর্ত গ্রহণের অনুরোধ জানান। আপোষহীন নেতা নেতাজী বোধহয় তাদের নরম সুরের গরম ইঙ্গিতের মর্মার্থ বুঝতে পারলেন। সঙ্গে সঙ্গে নাজি প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন: মাতৃভূমির স্বার্থেই আমি সুদূর ইউরোপের এই জার্মানীতে এসেছি। সুদক্ষ বৃটিশ গোয়েন্দারা সতর্কতামূলক সব ব্যবস্থা নিয়েও আমার দেশত্যাগ বন্ধ করতে পারেনি সুতরাং জার্মান গোয়েন্দাদের চোখে ধূলা দিয়ে আত্মগোপন এবং উধাও হওয়া আমার পক্ষে কিছুই নয়। প্রয়োজন হলে যেকোন ঝুঁকি নিয়ে আমি পুনরায় স্বদেশে ফিরব। তবুও আমার মাতৃভূমির স্বার্থের প্রতিকূল কোনও সর্তে আমি বিশ্বের কোনও শক্তির কাছে মাথা নত করব না।

নাজি সদস্যরা নেতাজীর তেজোদ্দীপ্ত এবং দৃঢ় এই মনোভাবে বিস্মিত, হতবাক হলেন। এধরণের ব্যক্তিত্ব তারা আগে আর দেখেছেন বলে মনে হল না। মহানায়ক নেতাজীর ভারত অভি-যানের প্রস্তুতিপর্বে তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণে নিয়মিত সাহায্য দিতে নাজিপ্রতিনিধিরা সম্মত হলেন। বুঝলেন, নেতাজী এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামী এই নেতা ভিন্নজাতের মানুষ।

নাজি প্রতিনিধিদের কাছ থেকে সব বিবরণ পেয়ে মহাবীর হিটলার আরেক নায়কের প্রতি শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হলেন। মহানায়ক নেতাজীকে তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

তারপর মুগ্ধ হিটলার ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে নেতাজীর দেওয়া সমস্ত দাবী নিঃসর্তে মেনে নিয়ে সরকারকে অবিলম্বে তা' কার্যকর করার নির্দেশ দিলেন এবং নেতাজীকে একজন স্বাধীন দেশের মুখ্য নেতারূপে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিলেন। তারপর থেকে জার্মানীতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে স্বাধীনতা এবং রাজনৈনিক কর্মতৎপরতার সুযোগ সুবিধা পান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন অবস্থায় তা' বহু বিদেশী কূটনীতিকেরই ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এপ্রসঙ্গে জার্মানীর হাঙারিয়ান প্রতিনিধি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, আমরা জার্মান সরকারের মিত্রপক্ষ। অথচ সুভাষচন্দ্র একজন ভারতীয় হয়ে জার্মানীতে যে রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন, তা' যেকোন পূর্ব ইউরোপের কূটনীতিকের পক্ষে কল্পনাতীত।...

বার্লিনে অবস্থানকারী তৎকালীন জাপানী রাষ্ট্রদূত এবং বিশ্বখ্যাত কূটনীতিক মোরেল ওসীমা নেতাজী প্রসঙ্গে বলেছিলেন, এশিয়া ইউরোপ ও অ্যামেরিকার যেকজন বিশিষ্ট কূটনীতিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ঘনিষ্ঠ সুযোগ সুবিধা হয়েছে, তাঁর মধ্যে নেতাজী সুভাষ অনন্য এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

নেতাজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর ভারতবর্ষ এবং ভারতীদের সম্পর্কে হিটলারের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। ইতিপূর্বে ভারতীয়দের সম্পর্কে তাঁর যে ঘৃণ্য মনোভাব ছিল, নেতাজীর সঙ্গে কথা বলার পর তা' তার মন থেকে দূর হয়ে যায় এবং বীরের দেশ এবং স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধাশীল হন।

হিটলার তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'মেইন কামপক-এ ভারতীয়দের সম্পর্কে যে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন, নেতাজীর সংস্পর্শে আসবার

পর তিনি পরবর্তীকালে তাঁর 'আত্মজীবনী' থেকে তা' বাদ দেন। এবং স্বীকার করেন, ভারতবর্ষ ভারতীয়দের সম্পর্কে অজ্ঞানতা, সঠিক সংবাদসূত্রের অভাবেই আত্মজীবনে তিনি প্রথম ভুল তথ্য ও মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রভাব স্বয়ং হিটলারকে যে কতখানি প্রভাবান্বিত করে, এই ঘটনাই তার প্রমাণ। অতএব পরবর্তী সময়ে নেতাজী যে কয়মাস বার্লিন তথা জার্মানীতে ছিলেন, স্বাধীনচেতা নেতা নেতাজী ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন সম্মাতিভাবে সকল রকম কাজের চালাও অধিকার নিয়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিপ্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে সুভাষচন্দ্র তাঁর পরবর্তী পরিকল্পনা কর্যকর করতে প্রয়াসী হলেন। তিনি যখন হিটলারের সঙ্গে দেখা করেন, তার মাত্র মাস দুয়েক আগে অর্থাৎ ১৯৪২ সালের ১৮ জানুয়ারি জার্মান-ইতালি ও জাপান এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। একদিকে এই তিনটি দেশ অপর পক্ষে বৃটেন এবং অ্যামেরিকা।

নেতাজীর স্বপ্ন ছিল ভারতবর্ষ থেকে বিদেশী শক্তি বৃটিশকে হটিয়ে মাতৃভূমিকে মুক্ত করা। সুতরাং বৃটিশ বিরোধী শক্তির এই নবগঠিত মোর্চা তাঁকে বিশেষভাবে উৎসাহী করল। কারণ, স্বদেশ ছেড়ে বার্লিন আসবার পথে মস্কোয় গিয়ে তিনি বুঝেছিলেন, সমাজতন্ত্রী দেশ সোভিয়েত রাশিয়াও জার্মান শক্তির ভয়ে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ-অ্যামেরিকার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চলেছে। অতএব জার্মান ও তার মিত্র শক্তির সহায়তায় স্বদেশভূমির মুক্তিসাধনের পথকে সহজসাধ্য করে তুলতে কৌশলগত কারণে নেতাজী খুব একটা অবৈজ্ঞানিক পন্থা বলে মনে করলেন না।

অপর দিকে নেতাজী জানাতেন, উত্তর আফ্রিকার বৃটিশ ভারতীয় জওয়ানরা দলত্যাগ করে বেরিয়ে আসছিল; এবং আফ্রিকার রণাঙ্গণে জার্মান-ইতালীর হাতে বন্দী পরাভূত বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় বহু জওয়ান ইতালী আর জার্মান সরকারের বন্দী শিবিরে

জীবন যাপন করছে। তিনি ঐসব শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় জওয়ানদের নিয়ে আজাদী বাহিনী গড়ার প্রথম পদক্ষেপের স্বপ্ন দেখলেন।

সুভাষচন্দ্র স্থির করলেন, মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব ভারতীয় বসবাস করেন, তাদের নিয়ে মুক্ত ভারতকেন্দ্র অথবা ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার গড়ে তুলবেন। ঐ সংস্থার মাধ্যমে পরাধীন ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সপক্ষে জনমত জাগ্রত করা হবে। ঐ কেন্দ্রের উপর থাকবে মুলতঃ ত্ব'টি দায়িত্ব। প্রথমটি হল, একটি বেতারকেন্দ্র স্থাপন এবং পরিচালনা। তার মাধ্যমে নিয়মিত ভারতের মুক্তি আন্দোলনের তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা এবং ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও প্রস্তুতির সংবাদ প্রচার করা আর দ্বিতীয়টি হল—বৃটিশ সেনাবাহিনীর মধ্যে যেসব ভারতীয় যোদ্ধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, অথবা বৃটিশ বিরোধী দেশের হাতে যুদ্ধবন্দী, তাঁদের মুক্ত করে প্রবাসী ভারতীয় তরুণদের নিয়ে এক সেনাবাহিনী গড়ে তোলা!

সুভাষচন্দ্র এই ত্ব'টি প্রস্তাব রাখলেন জার্মান কর্তৃপক্ষের কাছে। তারা বেতারকেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে সম্মতি জানালেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাব সেনাবাহিনী গড়ার বিষয় তাৎক্ষণিক কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। বিদেশী একজন দেশনায়ককে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার পর তাঁকে সেনাবাহিনী গড়ে তোলার অনুমতি দিলে বিশ্বরাজনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া কী, যাচাই করার জন্য হয়তো জার্মান কর্তৃপক্ষ থমকে দাঁড়ালেন।

বেতার কেন্দ্রের অনুমতি পেলেও সুভাষচন্দ্র তা নিয়ে তৃপ্ত হতে পারলেন না। সেনাবাহিনী গড়ার ব্যাপারে তিনি সরকারী দপ্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চললেন। তাঁর অকাট্য যুক্তি, অসীম ধৈর্য এবং আন্তরিক নিষ্ঠা শেষাবধি তাঁর কার্যোদ্ধারে সহায়ক হ'ল। জার্মান কর্তৃপক্ষ বেতারকেন্দ্র স্থাপন এবং সেনাবাহিনী গড়া এই তুই প্রস্তাবেই সম্মত হলেন। শুধু তাই নয়, যুক্তি দিয়ে সুভাষচন্দ্র বুঝাতে

সক্ষম হলেন যে, ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলন বা অভিযান গড়ে তুললে জার্মানীর শত্রুপক্ষ বৃটিশশক্তির বিরুদ্ধেই তা' দ্বিতীয় ফ্রন্টের কাজ করবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতি প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় জার্মানীর পক্ষে ঐ ভারত-অভিযানের উদ্যোগ প্রকারান্তে দারুণভাবে সহায়ক হবে। এবং জার্মান সরকার ভারতের কোটি কোটি মানুষের যে নৈতিক সমর্থন পাবে—তারও মূল্য অপরিসীম।

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং আশ্বাস প্রতিশ্রুতিতে জার্মান সরকার এতই মুগ্ধ হলেন যে, বেতারকেন্দ্র এবং সেনাবাহিনী গড়ার কাজে তারা সক্রিয় সাহায্য দিতে সম্মত হলেন। ঐ কাজের জন্য যে ব্যাপক অর্থ প্রয়োজন—তাও জার্মান কর্তৃপক্ষ জানতেন। অবশেষে তারা সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবিত অভিযানের প্রথম পর্যায়ের অর্থ-সাহায্যের জন্য তাঁকে অর্থ ঋণ দিতে রাজী হলেন। স্বাধীন ভারতকেন্দ্র বা ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার পরিচালনার জন্য সুভাষচন্দ্রের প্রয়োজনীয় অর্থ এইভাবেই সর্বপ্রথম সংগৃহীত হয়। সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বে মুগ্ধ জার্মান সরকারের সঙ্গে তাঁর চুক্তি হয়, মুক্তি আন্দোলন' সফল হলে সুভাষচন্দ্র ব্যক্তিগত উদ্যোগে জার্মান সরকারের ঐ ঋণের অর্থ পরিশোধ করবেন।

সুভাষচন্দ্র প্রথম ভেবেছিলেন, তাঁর উদ্যোগকে ইতালী-জার্মানসহ বৃটিশ বিরোধী সমস্ত শক্তি প্রকাশ্যে স্বাগত জানাবেন। কিন্তু কোনও দেশ প্রকাশ্যে তা' ঘোষণা না করায় তিনি কিছুটা হতাশ হলেন তিনি জানতে পারলেন, স্বয়ং হিটলার এই মুহূর্তে প্রকাশ্যভাবে ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিকে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত।

সুভাষচন্দ্র একটু চিন্তিত হলেন। বুঝলেন, হিটলারের প্রকাশ্য সমর্থন ছাড়া জার্মান সরকার তথা বৃটিশ বিরোধী শক্তিগুলির কাছ থেকে তেমন ব্যাপক সাহায্য লাভ অসম্ভব। তিনি তাই স্থির করলেন, হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর অভিপ্রায় এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে তিনি হিটলারের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

১৯৪১ সালের ২৯ মে। সুভাষচন্দ্র বার্লিনে হিটলারের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করলেন। এতদিনে হিটলারের ভাবনায় মোড় নিল। বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর তিনি ব্যাপক বৃটিশ বিরোধী অভিযানের কথা ভাবছিলেন। মাত্র কিছুদিন আগে জার্মানের হাতে উত্তর আফ্রিকা আর ডানকিরকে চরম আঘাত পেয়ে বৃটিশ-শক্তি চরম লড়াইয়ের জন্য হন্যে হয়ে উঠেছিল। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলি থেকে, বিশেষ করে ভারত থেকে আরও ব্যাপক সেনা ও রসদ সংগ্রহ করে বৃটেন আরও শক্তি অর্জনে সচেষ্ট ছিল। বৃটেনের ঐ শক্তি সংগ্রহের উদ্দেশ্য যে জার্মানীর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযানের প্রস্তুতি, ঝানু যুদ্ধবিশারদ হিটলারের তা' অজানা ছিল না। সুতরাং ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন চাঙা করার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করলেন। সুভাষচন্দ্রও এই পটভূমিকায় হিটলারের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে ব্যাপক অভিযানের যে প্রস্তুতি চলছিল, তিনি হিটলারকে তাও বুঝিয়ে বললেন। ভারতের আভ্যন্তরীণ আন্দোলনের সঙ্গে বাইরের সামরিক অভিযান বৃটিশশক্তিকে যে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে, এবং তার ফলে বিভিন্ন ফ্রণ্টে বৃটিশ সেনারা বিপর্যস্ত হবে, যুক্তি-তথ্য সহকারে হিটলারের কাছে তিনি তা' তুলে ধরলেন। হিটলার সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করে তার দূরদৃষ্টি এবং রণকৌশলের ধারায় বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন।

সুভাষ-হিটলারের সাক্ষাৎকারের সংবাদ বার্লিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত করল। জার্মান সরকারের কাছে সুভাষচন্দ্রের মর্যাদা আরও বেড়ে গেল। জার্মান সরকারের বিদেশ দপ্তর সুভাষচন্দ্রকে তাঁর পরিকল্পনা মতো স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার দিলেন। সুভাষচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ অনুসারে জার্মান সরকারের বিদেশ দপ্তরের মাধ্যমে একটি শাখাকেন্দ্র খুলে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবিত ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের

কাজ করার সুযোগও দেওয়া হল।

বার্লিন সহরের প্রাণকেন্দ্র টাইগার্টেন অঞ্চল বিদেশ দূতাবাসগুলির জন্য নির্দ্দিষ্ট। সেখানে বিরাট এবং সুদৃশ্য এক ভবন সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়া হল। উদ্দেশ্য তাঁর পরিকল্পিত কাজের সূচনা করা।

১৯৪১ সালের অক্টোবর মাস। প্রথম সপ্তাহে অনাড়ম্বর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ঐ ভবনে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার বা ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের প্রতিষ্ঠা করা হল। মধ্য ইউরোপের ভারতীয় বাসিন্দারা অবাক হলেন। জার্মান সরকার অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘকে কূটনৈতিক মর্যাদা দিলেন। অন্যান্য বিদেশী দূতাবাসগুলির মত শুধু মর্যাদাই পেল না, তার চেয়েও অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা এই স্বাধীনতা সংঘকে দেওয়া হল। পূর্ব চুক্তি মত অর্থ বরাদ্দও অব্যাহত রইল। সংঘের পরিচালনার মূল দায়িত্ব গ্রহণ করেন নেতাজী। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে এক দিকে তিনি স্বদেশভূমি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি যেমন লক্ষ্য রাখলেন, তেমনি বন্ধুদেশ জার্মানীর সঙ্গেও সখ্যতা বজায় রেখে চলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেন।

জার্মান সহ মধ্য ইউরোপে যেসব ভারতীয় পরিবার বসবাস করতেন, এর আগেই সুভাষচন্দ্র তাদের একটা তালিকা তৈরী করে রেখেছিলেন। সংঘের দায়িত্ব গ্রহণ এবং পরবর্ত্তী পরিকল্পনা রূপায়িত করার পর তিনি ঐসব পরিবার থেকে বুদ্ধিদীপ্ত, শিক্ষিত এবং রাজনীতি সচেতন তরুণ-যুবকদের খুঁজে বার করতে লাগলেন। এক হিসাবে দেখা যায়, নভেম্বর মাসের ১৯৪১-এর মধ্যেই তিনি এক বেতারকেন্দ্র পরিচালনার কাজেই ঐ ধরণের প্রায় ত্রিশজন যুবককে নিয়োগ করেন। হিন্দী উর্দ্দু তেলেগু তামিলসহ বিভিন্ন ভাষা শিখে ঐসব তরুণ যাতে স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা সংঘের আদর্শ-উদ্দেশ্য প্রচার করে বিদেশে ব্যাপক প্রস্তুতির দায়িত্ব নিতে

পারেন, অতি অল্প দিনের মধ্যে তাদের সেভাবে গড়ে তোলা হল। ১৯৪১ সাল। ২ নভেম্বর। এদিন সদ্য গঠিত ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার অর্থাৎ স্বাধীনতা সংঘের প্রথম সভা বসল। সভার উদ্দেশ্য, সংঘের আদর্শ-উদ্দেশ্য, পরবর্তী কার্যক্রম এবং নিয়ম-নীতি নির্দ্ধারণ করা। সভায় পৌরোহিত্য করলেন সুভাষচন্দ্র। সভার শুরুতে স্বাধীনতা সংঘে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সকলকে উপস্থিত থাকতে বলা হল। সর্বপ্রথম তাদের শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা হল। পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য সততা, নিষ্ঠা ও সর্বপ্রকার শৃঙ্খলা বজায় রেখে জীবনপণ সংগ্রামের শপথ বাক্য পাঠ করালেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র।

সুভাষচন্দ্র এবার স্বাধীনতা সংঘের সদস্যদের নিয়ে বৈঠক শুরু করলেন। এক সংক্ষিপ্ত এবং মর্মস্পর্শী ভাষণে তিনি তাঁর সাধ ও স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে সকলের ঐকান্তিক সাহায্য ও সহায়তার জন্য আবেদন জানালেন। বললেন, দেশ মাতৃকার মুক্তিমন্ত্রের জন্য যদি জীবন দান করতে হয়—তা' হবে জীবন জয়ের সামিল। তিনি সকলকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাসিমুখে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, জাতির মুক্তির চেয়ে পরাধীন জাতির জীবনে আর কোনও বড় আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারেনা। সেই মুক্তির জন্য চাই নিরলস কর্মপ্রয়াস, দুঃসাহসী অভিযান, সততা নিষ্ঠা আর দুঃখ জয়ের মত দৃঢ় মানসিকতা।

সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য সকলের মন জয় করল। উপস্থিত সদস্যরা তাঁর আবেদনে সাড়া দিলেন। ক্ষুদ্র এক সভায় ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাস রচনার সূত্রপাত ঘটল।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের এই প্রথম সভায় যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করা হল তার মধ্যে চারটি প্রস্তাব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই চারটি প্রস্তাবই পরবর্তী সময়ে ভারতীয় জাতীয় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে। প্রস্তাবে বলা হয়। (এক) ভারতীয়

স্বাধীনতা সংঘ প্রস্তাবিত স্বাধীনতা অভিযানের যুদ্ধধ্বনি হবে 'জয়হিন্দ'। (দুই) জাতীয় নেতা সুভাষচন্দ্র এরপর থেকে নেতাজী রূপে পরিচিত হবেন—এবং জাতীয় নেতা সুভাষচন্দ্রকে নেতাজী নামে অভিহিত করা হবে। (তিন) ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত হবে—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জনগণমন অধিনায়ক গান এবং (চার) হিন্দী হবে স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের প্রথম সভা শেষ হল। এই সভা তাদের নেতা সুভাষচন্দ্রকে নেতাজী বলে সম্মানিত করল। সভায় সমবেত ধ্বনি উঠল জয়হিন্দ! নেতাজী আবেগ মথিত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—জয়হিন্দ ধ্বনি শুধুমাত্র আমাদের সমরধ্বনি নয়, সামাজিক অনুষ্ঠানে, প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি কাজে এই ধ্বনি হবে প্রতিটি ভারতবাসীর প্রেরণার উৎস। প্রতি মুহূর্তে আমাদের মাতৃভূমি ভারতর্ষের মুক্তির সুর এই পবিত্র ধ্বনির মধ্যে হবে বিধৃত! ভারতবাসী যুগযুগান্ত ধরে মুক্তিমন্ত্র এই জয়হিন্দ ধ্বনি উচ্চারণ করবে।

নেতাজী, জয়হিন্দ আর জনগণমন জাতীয় সঙ্গীতের ভাব-ভাষায় স্বাধীনতা সংঘের কর্মী-নেতারা অভিভূত হলেন! নভেম্বরের শীতের আমেজও মুক্তির উত্তেজনায় উষ্ণ হল। সভা শেষে সমবেত ধ্বনি উঠল: জয়হিন্দ—নেতাজী জিন্দাবাদ। নেতাজীর চোখে মুখে তখন নতুন স্বপ্ন। উজ্জ্বল উচ্ছল তাঁর মুখমণ্ডলে ফুটে উঠল শপথদৃপ্ত অনাবিল হাসির রেখা। তিনিও সকলের সুরে সুর মিলিয়ে বললেন: 'জয়হিন্দ'!

১৯৪২ সালের ২৯ মে। ভারত-জার্মান সাংস্কৃতিক সমিতির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে হামবুর্গে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন হল। মহানগরীর মেয়র এবং পদস্থ সরকারী প্রতিনিধিবৃন্দ নেতাজীকে বিদেশী কূটনীতিকের মর্যাদা দিয়ে সেখানে স্বাগত জানালেন। ঐতিহাসিক ঐ অনুষ্ঠানে জনগণমন অধিনায়ক ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত গীত হল। উত্তোলিত তিন রঙা ভারতীয় জাতীয় পতাকা। ভারত এবং জার্মানের জাতীয়

পতাকা পাশাপাশি পত্‌পত্‌ করে আকাশে উড়ল। বোধহয়, ভারতের জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীত এই সর্বপ্রথম বিদেশের মাটিতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করল। অন্যান্য দেশের কূটনীতিবিদ সরকারী প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জার্মান সরকার নেতাজীকে রাষ্ট্রীয় সম্মানে অভিষিক্ত করলেন। হামবুর্গের মেয়র তথা জার্মান সরকারের প্রতিনিধি ঐ সভায় ভারতকে একটি স্বাধীন দেশের মর্যাদা দিয়ে ভারত জার্মানের মধ্যে সর্বপ্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন। নেতাজী জানতেন, ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতির সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় ভাষা প্রণয়নও অনিবার্য। নানা ভাষার দেশ ভারত-বাসীর মধ্যে ঐক্য দৃঢ় করার জন্যই তার প্রয়োজন। তিনি খুব সতর্কতার সঙ্গে তা' বিচার বিশ্লষণ করলেন বার্লিন থাকাকালেই। স্থির করলেন, ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে হিন্দুস্থানী। মূলতঃ তা' হিন্দী। তবে ঐ ভাষাকে সর্বজন গ্রাহ্য করতে যতটা সম্ভব সহজ সরল করে তুলতে হবে। তাতে হিন্দী ছাড়াও সংস্কৃত আরবি পারসি ইংরাজী থেকে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করা চলবে। তিনি বললেন, কথ্য ভাষাকে কোনও নিয়ম-নীতির বেড়াজালে বেধে রাখা চলবে না। স্বাভাবিক গতিতে তার ব্যাপক প্রসার প্রচার ঘটুক। বিদেশী শব্দের অন্তর্ভূক্তি হিন্দুস্থানী ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলেই তিনি মনে করতেন। পৃথিবীর সব উন্নত ভাষাই নিজস্ব প্রয়োজনে বিদেশী শব্দ গ্রহণ করে থাকে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের কাছে সরল সহজ একটা গ্রহণযোগ্য ভাষা তুলে ধরবার জন্য নেতাজী সেদিন এই উদ্যোগ নেন। রোমান হরফে লেখা এই সরল হিন্দুস্থানী প্রচারের পেছনে তাঁর যুক্তি ছিল। রোমান শব্দের ব্যবহার ইউরোপ সহ পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশেই প্রচলিত। এর ফলে দেশবাসীর পক্ষে একটা বিদেশী ভাষার সঙ্গেও সাক্ষাৎ যোগাযোগ ঘটবার সম্ভাবনা থাকবে। উত্তর বা পূর্ব ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের মানুষের কাছেও হিন্দুস্থানী ভাষা এভাবে সহজে গ্রহণযোগ্য হবে। রোমান হরফ

ছাড়া আরবি বা দেবনাগরি হরফেও হিন্দুস্থানী ভাষা লেখা চলবে। তবে রোমান হরফের হিন্দুস্থানী ভাষাকে তিনি মূল সরকারী ভাষা রূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার শেষে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর নেতাজী ঐ রোমান হরফে হিন্দুস্থানী ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ, গ্রন্থ রচনার দায়িত্বভার বিভিন্ন ব্যক্তির উপর নির্দ্দিষ্ট করে দেন। ফলে অতি দ্রুত রোমান হরফে হিন্দুস্থানী ভাষার প্রসার ঘটে। পরবর্তীকালে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের মধ্যে ঐ ভাষা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

নেতাজী জার্মানের বার্লিন সহরে বসে সর্বপ্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ বা ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের প্রতিষ্ঠা করে আজাদ হিন্দ ফৌজের গোড়াপত্তন করেন। ক্রমে তার ব্যাপক বিস্তার ও প্রসার ঘটে। মূলতঃ ১৯৪২ সালের মে মাস থেকে নেতাজী ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংস্থা জার্মান সরকার এবং তার কূটনৈতিক চক্রের সমর্থন ও সম্মান পেতে থাকে। এসময় শ্রী এ, সি, এন, নাম্বিয়ার নামক এক ভারতীয় সাংবাদিক সহযোগীরূপে নেতাজীর সঙ্গে যোগ দেন। তিনি মধ্য ইউরোপে সুদীর্ঘদিন বসবাস করছিলেন। শ্রীনাম্বিয়ার সাংবাদিকতার সুবাদে মধ্য ইউরোপ সহ বিভিন্ন দেশের বহু রাজনৈতিক ঘটনা ও নেপথ্যের সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ছিলেন। সহযোগীরূপে শ্রীনাম্বিয়ারের মত অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে পাওয়ায় নেতাজীর সাংগঠনিক কাজে সবিশেষ সুবিধা হয়। পরবর্তী সময়ে শ্রীনাম্বিয়ার প্যারিসে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। সেই শাখাকেন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজের পরবর্তী অধ্যায় নেতাজীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সক্রিয় সহায়তা করে।

১৯৪১ সাল। নভেম্বরের ২ তারিখে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ তথা ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের প্রথম সভা বসে। এবং এই মাসের মধ্যে আজাদ হিন্দ বেতারকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়। আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম ভাষণে নেতাজী আবেগ জড়িত কণ্ঠে ঘোষণা

করেন : আমার জীবনের একমাত্র সাধ এবং সাধনা ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা। চারদিকে গুজব রটেছে আমার মৃত্যু ঘটেছে। হে প্রিয় ভারতীয় ভাই ও ভগ্নীগণ, আমি মৃত্যুর গহ্বর থেকে উঠে এসেছি। সর্বশক্তিমান দর্শকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমার মৃত্যু কামনা করলেও ঈশ্বর তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করেননি।

১৯৪০ সালে বৃটিশ কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে আমি আর আপনাদের মুখোমুখি হইনি। এবার হাজার হাজার মাইল দূর থেকে আপনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আপনাদের অর্দ্ধনগ্ন, ক্ষুধার্ত্ত, ম্লান ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। দেশমাতৃকা ও দেশবাসীর সার্বিক মুক্তির জন্য আমার এই দেশত্যাগ।

স্বদেশভূমির মুক্তির মধ্য দিয়ে আমি আপনাদের কাছে আবার ফিরে আসতে চাই। স্বাধীনতা সূর্য উদয়ের পথে। ঘুমাবার মত সময় আর নেই। আপনারা জাগুন। সকলের জাগ্রত অভিযান বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাবেই। আমি বেঁচে আছি এবং থাকব। মুক্ত ভারতের আকাশের নীচেই যেন আমার মৃত্যু ঘটে। নেতাজীর যখন বেতার ভাষণ শেষ হল, তখন তাঁর দু'চোখের পাতা ভেজা। ভাবাবেগ আর অনির্বচনীয় অনুভূতিতে তখনও তিনি তন্ময়।

বলা চলে, এই বেতার ভাষণের মধ্য দিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র নিজেকে প্রথম সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করলেন। এবং এর পর থেকে তিনি সর্বত্র নেতাজীরূপে পরিচিত হলেন।

জার্মান সরকার নেতাজীর প্রথম বেতার ভাষণের প্রতিক্রিয়া জানতে আগ্রহী হলেন। কাবুলের জার্মান প্রতিনিধি গোপন এক বার্তায় তার সরকারকে সেখানকার ভারতীয়দের মধ্যে নেতাজীর বেতার ভাষণ সম্পর্কে উৎসাহ উদ্দীপনার কথা জানালেন। শুধু কাবুলে নয়, সুদূর ভারতবর্ষ তথা এশিয়াবাসীর কাছে নেতাজীর বেতার ভাষণ উদ্দীপনার সৃষ্টি করল। জার্মান সরকার স্বভাবতই নেতাজীর

জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্বের বিচার বিশ্লেষণ জানতে পেরে খুশী হলেন। তারপর উৎসাহিত হয়ে আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্রকে জার্মান সরকার প্রতিদিন কম করে তিন ঘণ্টার অনুষ্ঠানসূচী প্রচারের অনুমতি দিলেন।

সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিদিন তিন ঘণ্টার অনুষ্ঠানসূচী বজায় রাখা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তা' সত্বেও নেতাজী এই সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী একাধিক তরুণ ভারতীয়কে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করলেন। তাদের মধ্যে কেউ দক্ষিণ ভারতের, কেউ উত্তর ভারতের আবার কেউ বা শুধু কাবুল কান্দাহার থেকে আসা প্রবাসী। জার্মান সরকারের কারিগরী সহায়তায় সংক্ষিপ্ত শিক্ষণ ব্যবস্থার পর এক দলকে যেমন বেতার প্রচারে দক্ষ করে তুললেন, অন্যদের আবার ইংরাজী, হিন্দী, উর্দ্দু, তামিল, তেলেগু, পুস্তু ভাষায় বেতার পাঠের উপযোগী করে তৈরী করা হল। আফগান থেকে এক যুবককে আনা হল। সে ছিল অর্থনীতির একজন কৃতিছাত্র। পারসী ভাষার অনুষ্ঠানসূচী পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করা হল। দিল্লীর এক তরুণ হলিউডে গিয়েছিলেন চলচ্চিত্র প্রযোজনার কাজ শিখতে। জার্মানীতে সে আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য এসেছিল। নেতাজী তাঁকে ডেকে হিন্দী অনুষ্ঠানসূচীর দায়িত্ব দিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দুই তরুণকে তিনি যুদ্ধবন্দী শিবির থেকে খুঁজে বার করলেন। সুশিক্ষিত ঐ দুই তরুণ পুস্তু ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিল। বেতার পরিচালনার কাজে নেতাজী তাদেরও সামিল করলেন। প্যারিসে এক তরুণ ব্যবসায়ীর খোঁজ পেলেন। জানতে পারলেন, জাতীয়তা-বাদী তরুণ ব্যবসায়ী তামিল ভাষায় তুখার নেতাজী তড়িঘড়ি তাকে বার্লিনে আনানোর ব্যবস্থা করলেন। এভাবে নেতাজী অতি অল্পদিনের মধ্যে ভারতীয় প্রায় সকল ভাষায় অভিজ্ঞ তরুণদের বেতার কেন্দ্রের কাজে নিয়োগের ব্যবস্থা করলেন। তারা নিয়মিত সংবাদ

রচনা সমীক্ষা ও পর্যালোচনা করত। অল ইণ্ডিয়া রেডিও এবং বি, বি, সির সংবাদ শুনে তার প্রতিবাদ এবং ভারতীয় জাতীয় নেতাদের কার্যক্রম সবিস্তারে আজাদ হিন্দ বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচার করত। এছাড়া ভারতীয় নেতাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, বৃটিশ রাজের দুরভিসন্ধি, ভারত বিভাগের অপচেষ্টা, পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য মোহম্মদ আলি জিন্নার তৎপরতা ইত্যাদি সংবাদটিকা প্রচার করে তারা স্বাধীন এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করত। আর প্রায় প্রতিদিনই নেতাজীর উদ্দীপনাময় ভাষণ বিভিন্ন ভাষায় সম্প্রচারিত করা হত।

১৯৪২-এর আগস্টে যখন সারাদেশে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়, সুদূর জার্মান থেকে আজাদ হিন্দ বেতার তখন সরা বিশ্বে সে খবর প্রচারের দায়িত্বভার বহন করে।

একদিকে আজাদ হিন্দ বেতারকেন্দ্র রাজনৈতিক প্রচার ও জনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করে। অন্যদিকে মধ্য ইউরোপ ও বিশ্বের অন্যান্য স্থানে বৃটিশ বাহিনীতে যেসব ভারতীয় জওয়ান কর্তব্যরত ছিল, তাদের মধ্যে স্বদেশ প্রীতি সঞ্চারের সহায়তা করে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের অগ্নিক্ষরা ঐ দিনগুলোয় বৃটিশ বাহিনীতে কয়েক লক্ষ ভারতীয় জওয়ান কর্মরত ছিল। নেতাজী জানতেন, তাদের মানসিকতা পরিবর্তনে অনবরত তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার অপরিহার্য। আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্রের ঐ প্রচার বস্তুতঃ বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয়দের স্বাধীনাতবোধ জাগাতে এবং ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ আন্দোলনের ধারা বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। ফলে এশিয়া ও ইউরোপের সর্বত্র বৃটিশ বিরোধী মনোভোব যেমন সৃষ্টি হয়, তেমনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবীর যৌক্তিকতা পুনঃ পুনঃ প্রচারিত ও প্রভাবিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান যখন বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফ্রন্টে লড়াই শুরু করে, তখন থেকে বৃটিশ সেনা বাহিনীর বহু ভারতীয়

তাদের হাতে বন্দী হয়। শত্রুপক্ষের হয়ে লড়াই করা ভারতীয় সেনাদের তারা যুদ্ধবন্দী শিবিরে বিশেষ কড়াকড়ির মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। নেতাজী যখন বার্লিনে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার গড়ার কাজে হাত দেন, তখন থেকেই ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের সমস্যাটা তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়! কিন্তু তখনও পর্যন্ত ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার মত সুযোগ সুবিধা বা ক্ষমতা নেতজীর হাতে ছিল না। কিন্তু প্রাথমিক কাজ শেষ করে জার্মান সরকারের সঙ্গে হৃদ্য ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ার পর এবার ভারতীর যুদ্ধ-বন্দীদের কথা নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন। তিনি জানতেন, ভারতীয় ঐ যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর অনুরোধ জার্মান সামরিক বাহিনী বিশেষ ভাবে বিবেচনা করবেন। কিন্তু তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করার পর দেশে গিয়ে ফের হয়তো তারা আবার বৃটিশ বাহিনীতে যোগ দেবে। নেতাজী তাই তাদের তাৎক্ষণিক মুক্তির প্রশ্নের চাইতেও যুদ্ধবন্দী শিবির পরিদর্শনের উপর বেশী গুরুত্ব দিলেন। ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের স্বাধীনতা যুদ্ধের কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায় কিনা, তা' যাচাই করার জন্যই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন।

বার্লিনের অদূরে আননাবার্গ যুদ্ধবন্দী শিবির। বৃটিশ বাহিনীর ধৃত ভারতীয় সেনাদের এই শিবিরে রাখার ব্যবস্থা হয়। কয়েক হাজার যুদ্ধবন্দীর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য জার্মান সামরিক বাহিনীর অতন্দ্র প্রহারা। নেতাজী সে খবর জানতেন। একদিন জার্মান সামরিক বাহিনীর সদর দপ্তরে প্রস্তাব পাঠালেন, যুদ্ধবন্দী শিবিরে সরেজমিনে তিনি ভারতীয় জওয়ানদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে চান। নেতাজীর প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানালেন।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা, আননাবার্গ যুদ্ধবন্দী শিবিরে খবর দেওয়া হল, নেতাজী তা' পরিদর্শন করবেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নেতাজী সেখানে উপস্থিত হতেই ভারতীয় যুদ্ধবন্দীরা নেতাজীর নামে জয়ধ্বনি করল।

বিমর্ষ বন্দী শিবিরে অভাবিতভাবে প্রাণের জোয়ার নেমে এল। যে যা পেল তাই দিয়ে নেতাজীকে বরণ করল। নেতাজীর একটু স্পর্শ পাওয়ার জন্য সুশৃঙ্খল সেনাদের মধ্যেও কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। নেতাজীও অভিভূত। বিদেশ বিভূঁইয়ের বিদেশী সরকারের বন্দী শিবিরে ভারতীয় তরুণদের দেখে নেতাজীর হয়তো ভাবান্তর ঘটল। অভাব অনটনে পড়ে গ্রাম-ভারতের এই তরুণরা তাদের আত্মীয় পরিজন ত্যাগ করে বিদেশী শাসকের স্বার্থে সুদূর রণাঙ্গণে যুদ্ধ করতে এসে বন্দী। সহজ সরল এই ভারতীয় তরুণরা অভাবী মায়ের দুঃখ ঘুচাতেইতো সামান্য অর্থের বিনিময়ে জীবনের এই চরম ঝুঁকি নিয়েছে। সুদূর প্রবাসের বন্দী শিবিরে তরুণ তাজা হাজারো ভারতীয়ের ম্লানমুখের হাসি নেতাজীকে ব্যথিত করল। সাময়িকভাবে তিনি হতবাক আবেগরুদ্ধ। তারপর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন: তোমরা এতদিন যুদ্ধ করেছ বিদেশী শক্তির স্বার্থরক্ষা করতে। ঘরের মায়ের দুঃখ মোচনের জন্য তোমরা জীবন মরণের পথে পা বাড়াতে ভয় পাওনি। ঘরের মায়ের চেয়েও বড় আমাদের সকলের মা। দেশমাতার দুঃখ দূর করার পবিত্র দায়িত্বভার এবার আমাদের সকলকে একসঙ্গে নিতে হবে। দেশমাতার মুক্তির মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের গৃহজননীর মুখে হাসি ফুটাতে পারব।

নেতাজীর মর্মস্পর্শী সংক্ষিপ্ত ভাষণে বন্দীশিবির গুমড়ে কেঁদে উঠল। সুদূর প্রবাসের বন্দীশিবিরে থাকা মানুষগুলো এতদিন বেতার তরঙ্গে ভেসে আসা নেতাজীর কথা শুনে আসছিল। চোখের সামনে আজ সেই মহাননেতা নেতাজীকে তারা দেখল। শুনল, আবেগরুদ্ধ নেতাজীর সংক্ষিপ্ত ভাষণ। তারপর নিজেদের অজান্তে মন্ত্রমুগ্ধের মত কখন তারা হাততালি দিয়ে নেতাজী আর দেশজননীর নামে জয়ধ্বনি করে উঠল, বুঝতেও পারল না!

সারা শিবির এক ক্ষুদে ভারতে পরিণত হল।

বিভিন্ন প্রদেশের তরুণ ভারতীয় জওয়ানরা বুকের রক্ত দিয়ে শপথ

নিল। দেশজননীর মুক্তিযুদ্ধে সামিল হতে তারা ততক্ষণে উৎসুক অধীর। নেতাজী তাঁদের দেশপ্রেমের স্পর্শে মুগ্ধ হলেন। মুগ্ধ জার্মান সামরিক বাহিনীর পদস্থ অধিনায়করাও। তাঁরাও বুঝলেন, নেতাজী ভারতীয়দের কাছে দেশপ্রেমের এক জ্বলন্ত প্রতীক। বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতকে উদ্দীপ্ত করতে নেতাজীর নেতৃত্ব অপরিহার্য। নেতাজীর আননাবার্গ বন্দী-শিবির পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল, বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় জওয়ানদের মানসিকতা ও মনোবল যাচাই করা। তিনি শিবির ত্যাগ করে স্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে, মধ্য ইওরোপের বৃটিশবিরোধী যেসব দেশে ভারতীয় জওয়ানরা যুদ্ধবন্দী, তাদের নিয়ে অনতিবিলম্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তোলা প্রয়োজন। যুদ্ধবন্দী ভারতীয় জওয়ানরা বুঝতে পেরেছে যে বিদেশী শাসকের হয়ে যুদ্ধ করার চেয়ে স্বদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া অনেক বেশী গৌরবের। তাছাড়া বৃটিশ সেনানায়কদের ঘৃণ্য আচার-আচরণও ভারতীয় জওয়ানদের মন বিষিয়ে তুলেছিল।

যুদ্ধবন্দী শিবিরে নেতাজীর স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্দ্ধনা ও তাঁর জনপ্রিয়তার সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদ-মাধ্যমে প্রচারিত হল। শিবিরে শিবিরে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় জওয়ানদের মধ্যে তীব্র উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হল। জার্মান কর্তৃপক্ষের কাছেও সে সংবাদ অজ্ঞাত রইল না। নেতাজী এবার তাঁর প্রস্তাবিত সামরিক বাহিনী গড়ার কাজে হাত দিতে উদ্যোগী হলেন। মধ্য ইউরোপের যেসকল দেশ জার্মানের মিত্র বলে পরিচিত ছিল, সেইসব দেশ থেকে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের এনে নেতাজীর হাতে তুলে দিতে জার্মান সরকারের বিদেশ-দপ্তর সক্রিয় হল। রণকৌশলের দিক থেকে বৃটিশ বিরোধী ভারতীয় নেতা নেতাজীর শক্তিবৃদ্ধি করতে জার্মান ও তার মিত্ররাষ্ট্রগুলি ঐক্যমত হলেন। প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা নেতাজী এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়লেন না।

নেতাজী এবার সাংগঠনিক দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিলেন। তিনি

জার্মান সরকারের সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে প্রথমেই কয়েকটি সর্তে চুক্তি করার প্রস্তাব রাখলেন। আগে সরকারী পর্যায়ে চুক্তি করে নতুন উদ্যমে তাঁর প্রস্তাবিত সামরিক বাহিনী গড়ার জন্য তিনি বিস্তৃত পরিকল্পনা খাড়া করলেন। জার্মান সরকার নেতাজীর আন্তরিকতা নিষ্ঠা এবং সততায় আস্থাশীল ছিলেন। সুতরাং তাঁর চুক্তি প্রস্তাবে তাঁরা আর দ্বিধা বা কালক্ষেপ করলেন না। যুদ্ধের দ্রুত বিস্তার এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিও অবশ্য জার্মান সরকারকে নেতাজীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে প্রকারান্তে উৎসাহ যোগাল।

নেতাজীর সঙ্গে জার্মান সরকারের যে চুক্তি হয়, তার অন্যতম সর্ত হল :

(ক) ভারতীয় জওয়ানদের স্বদেশভূমি ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনও রণাঙ্গণে পাঠানো অথবা জার্মান বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত করা চলবেনা।

(খ) জার্মান সেনাদের মত তাদের আধুনিক অস্ত্র পরিচালনা ও ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে। জাতীয় চেতনা, শৃঙ্খলাবোধ, সহযোদ্ধাদের সঙ্গে সখ্যতা বজায় রাখতে এবং উচ্চপর্যায়ের সামরিক শিক্ষা প্রদানে জার্মান সামরিক বাহিনী বাধ্য থাকবেন।

(গ) প্রতিটি ভারতীয় জওয়ান জার্মান সেনাদের সমমর্যাদা পাবে। খাদ্য পোষাক বেতন ভাতা ও ছুটি সহ কোন ব্যাপারেই তার হেরফের চলবেনা। এবং ভারতীয় জওয়ানরা কেবলমাত্র ভারতীয় নেতার নেতৃত্বাধীনেই পরিচালিত হবে।

জার্মান সামরিক বাহিনী নেতাজীর সঙ্গে উপরোক্ত মর্মে চুক্তি করলেন। নেতাজীও এতদিন এই চুক্তির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আর কালক্ষেপ করলেন না। পরিকল্পিত কাজের প্রথম ধাপ হিসাবে সর্বপ্রথম মধ্য ইউরোপের যুদ্ধবন্দী শিবিরের ভারতীয় জওয়ানদের মানসিকতা যাচাই করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি জানতেন, অর্থাভাবে অর্ধ শিক্ষিত শোষিত সহজ সরল সহস্র

সহস্র ভারতীয় জওয়ান বৃটিশবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য হয়। সেইসব তরুণ ভারতীয়দের সুদূর রণাঙ্গণে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে বৃটিশ নেতারা সাম্রাজ্য বিস্তার এবং শোষন-শাসন অব্যাহত রাখতে চায়। বৃটিশ সামরিক দপ্তর তাদের মানসিকতা পরিবর্ত্তনেও নানা পন্থা অবলম্বন করে এবং দেশ ও দেশনেতাদের সম্পর্কে ভিত্তিহীন তথ্য প্রচার করে। বৃটিশরাজই যে ভারতবর্ষের প্রকৃত শাসক এবং উন্নতির একমাত্র সহায়ক, সেই মানসিক দৃষ্টিতে তরুণ ভারতীয় জওয়ানদের মগজ ধোলাইয়ের ব্যবস্থা হয়। রণাঙ্গণে বৃটিশবাহিনীর যেসব ভারতীয় জওয়ান মধ্য ইউরোপে জার্মান এবং তার মিত্র দেশের হাতে যুদ্ধবন্দী হয়ে নিঃসঙ্গ শিবির জীবন যাপন করছে, নেতাজী তাদের সর্বশেষ মানসিকতা ও অবস্থা সরেজমিন পর্যালোচনা ও পরিদর্শন করতে চাইলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যুদ্ধবন্দী শিবিরের তরুণ জওয়ানদের তিনি স্বদেশভূমি পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের সামিল করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন। এবং তাদের সাহায্যে বিরাট এবং ব্যাপক আজাদী সেনা গড়ে তুলবার মহানব্রতে তিনি সার্থক হবেন।

নেতাজী যুদ্ধবন্দী শিবির পরিদর্শনের আগে জার্মান সামরিক অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করে বার্লিন সহরের উপকণ্ঠে একটি বিস্তীর্ণ ব্যারাক নিজের কর্তৃত্বে তুলে নিলেন। উদ্দেশ্য, যুদ্ধবন্দী শিবিরের যেসব ভারতীয় জওয়ান তাঁর প্রস্তাবিত আজাদী বাহিনীতে যোগ দিতে ইচ্ছুক তাদের মানসিকতা যাচাই করা। তারপর বৃটিশবাহিনীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ঐসব তরুণদের আধুনিক রণবিদ্যা শিক্ষায় বিশেষ ভাবে শিক্ষিত করে তোলা। ব্যারাকে রাখা সেনাদের মধ্যে স্বদেশ চেতনা বৃদ্ধি করতে এবং ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ তাদের মধ্যে দ্রুতভাবে ছড়িয়ে দিয়ে প্রতিটি তরুণকে এক একটি জ্বলন্ত 'মুক্তিদূতে' পরিণত করা। প্রতিটি জওয়ান ব্যারাকে বসবাস কালে যাতে সামরিক পোষাক এবং মুক্তিবাহিনীর

জীবন যাপন করছে। তিনি ঐসব শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় জওয়ানদের নিয়ে আজাদী বাহিনী গড়ার প্রথম পদক্ষেপের স্বপ্ন দেখলেন।
সুভাষচন্দ্র স্থির করলেন, মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব ভারতীয় বসবাস করেন, তাদের নিয়ে মুক্ত ভারতকেন্দ্র অথবা ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার গড়ে তুলবেন। ঐ সংস্থার মাধ্যমে পরাধীন ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সপক্ষে জনমত জাগ্রত করা হবে। ঐ কেন্দ্রের উপর থাকবে মুলতঃ ছ'টি দায়িত্ব। প্রথমটি হল, একটি বেতারকেন্দ্র স্থাপন এবং পরিচালনা। তার মাধ্যমে নিয়মিত ভারতের মুক্তি আন্দোলনের তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা এবং ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর মুক্তির আকাজ্ক্ষা ও প্রস্তুতির সংবাদ প্রচার করা আর দ্বিতীয়টি হল—বৃটিশ সেনাবাহিনীর মধ্যে যেসব ভারতীয় যোদ্ধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, অথবা বৃটিশ বিরোধী দেশের হাতে যুদ্ধবন্দী, তাঁদের মুক্ত করে প্রবাসী ভারতীয় তরুণদের নিয়ে এক সেনাবাহিনী গড়ে তোলা!
সুভাষচন্দ্র এই ছ'টি প্রস্তাব রাখলেন জার্মান কর্তৃপক্ষের কাছে। তারা বেতারকেন্দ্রে স্থাপনের ব্যাপারে সম্মতি জানালেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাব সেনাবাহিনী গড়ার বিষয় তাৎক্ষণিক কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। বিদেশী একজন দেশনায়ককে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার পর তাঁকে সেনাবাহিনী গড়ে তোলার অনুমতি দিলে বিশ্বরাজনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া কী, যাচাই করার জন্য হয়তো জার্মান কর্তৃপক্ষ থমকে দাঁড়ালেন।
বেতার কেন্দ্রের অনুমতি পেলেও সুভাষচন্দ্র তা নিয়ে তৃপ্ত হতে পারলেন না। সেনাবাহিনী গড়ার ব্যাপারে তিনি সরকারী দপ্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চললেন। তাঁর অকাট্য যুক্তি, অসীম ধৈর্য এবং আন্তরিক নিষ্ঠা শেষাবধি তাঁর কার্যোদ্ধারে সহায়ক হ'ল। জার্মান কর্তৃপক্ষ বেতারকেন্দ্র স্থাপন এবং সেনাবাহিনী গড়া এই ছুই প্রস্তাবেই সম্মত হলেন! শুধু তাই নয়, যুক্তি দিয়ে সুভাষচন্দ্র বুঝাতে

সক্ষম হলেন যে, ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলন বা অভিযান গড়ে তুললে জার্মানীর শত্রুপক্ষ বৃটিশশক্তির বিরুদ্ধেই তা' দ্বিতীয় ফ্রণ্টের কাজ করবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতি প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় জার্মানীর পক্ষে ঐ ভারত-অভিযানের উদ্যোগ প্রকারান্তে দারুণভাবে সহায়ক হবে। এবং জার্মান সরকার ভারতের কোটি কোটি মানুষের যে নৈতিক সমর্থন পাবে—তারও মূল্য অপরিসীম।

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং আশ্বাস প্রতিশ্রুতিতে জার্মান সরকার এতই মুগ্ধ হলেন যে, বেতারকেন্দ্র এবং সেনাবাহিনী গড়ার কাজে তারা সক্রিয় সাহায্য দিতে সম্মত হলেন। ঐ কাজের জন্য যে ব্যাপক অর্থ প্রয়োজন—তাও জার্মান কর্তৃপক্ষ জানতেন। অবশেষে তারা সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবিত অভিযানের প্রথম পর্যায়ের অর্থ-সাহায্যের জন্য তাঁকে অর্থ ঋণ দিতে রাজী হলেন। স্বাধীন ভারতকেন্দ্র বা ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার পরিচালনার জন্য সুভাষচন্দ্রের প্রয়োজনীয় অর্থ এইভাবেই সর্বপ্রথম সংগৃহীত হয়। সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বে মুগ্ধ জার্মান সরকারের সঙ্গে তাঁর চুক্তি হয়, মুক্তি আন্দোলন সফল হলে সুভাষচন্দ্র ব্যক্তিগত উদ্যোগে জার্মান সরকারের ঐ ঋণের অর্থ পরিশোধ করবেন।

সুভাষচন্দ্র প্রথম ভেবেছিলেন, তাঁর উদ্যোগকে ইতালী-জার্মানসহ বৃটিশ বিরোধী সমস্ত শক্তি প্রকাশ্যে স্বাগত জানাবেন। কিন্তু কোনও দেশ প্রকাশ্যে তা' ঘোষণা না করায় তিনি কিছুটা হতাশ হলেন তিনি জানতে পারলেন, স্বয়ং হিটলার এই মুহূর্তে প্রকাশ্যভাবে ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিকে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত।

সুভাষচন্দ্র একটু চিন্তিত হলেন। বুঝলেন, হিটলারের প্রকাশ্য সমর্থন ছাড়া জার্মান সরকার তথা বৃটিশ বিরোধী শক্তিগুলির কাছ থেকে তেমন ব্যাপক সাহায্য লাভ অসম্ভব। তিনি তাই স্থির করলেন, হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর অভিপ্রায় এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে তিনি হিটলারের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

১৯৪১ সালের ২৯ মে। সুভাষচন্দ্র বার্লিনে হিটলারের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করলেন। এতদিনে হিটলারের ভাবনায় মোড় নিল। বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর তিনি ব্যাপক বৃটিশ বিরোধী অভিযানের কথা ভাবছিলেন। মাত্র কিছুদিন আগে জার্মানের হাতে উত্তর আফ্রিকা আর ডানকিরকে চরম আঘাত পেয়ে বৃটিশ-শক্তি চরম লড়াইয়ের জন্য হন্যে হয়ে উঠেছিল। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলি থেকে, বিশেষ করে ভারত থেকে আরও ব্যাপক সেনা ও রসদ সংগ্রহ করে বৃটেন আরও শক্তি অর্জনে সচেষ্ট ছিল। বৃটেনের ঐ শক্তি সংগ্রহের উদ্দেশ্য যে জার্মানীর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযানের প্রস্তুতি, ঝানু যুদ্ধবিশারদ হিটলারের তা' অজানা ছিল না। সুতরাং ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন চাঙা করার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করলেন। সুভাষচন্দ্রও এই পটভূমিকায় হিটলারের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে ব্যাপক অভিযানের যে প্রস্তুতি চলছিল, তিনি হিটলারকে তাও বুঝিয়ে বললেন। ভারতের আভ্যন্তরীণ আন্দোলনের সঙ্গে বাইরের সামরিক অভিযান বৃটিশশক্তিকে যে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে, এবং তার ফলে বিভিন্ন ফ্রণ্টে বৃটিশ সেনারা বিপযস্ত হবে, যুক্তি-তথ্য সহকারে হিটলারের কাছে তিনি তা' তুলে ধরলেন। হিটলার সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করে তার দূরদৃষ্টি এবং রণকৌশলের ধারায় বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন।

সুভাষ-হিটলারের সাক্ষাৎকারের সংবাদ বার্লিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত করল। জার্মান সরকারের কাছে সুভাষচন্দ্রের মর্যাদা আরও বেড়ে গেল। জার্মান সরকারের বিদেশ দপ্তর সুভাষচন্দ্রকে তাঁর পরিকল্পনা মতো স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার দিলেন। সুভাষচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ অনুসারে জার্মান সরকারের বিদেশ দপ্তরের মাধ্যমে একটি শাখাকেন্দ্র খুলে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবিত ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের

কাজ করার সুযোগও দেওয়া হল।

বার্লিন সহরের প্রাণকেন্দ্র টাইগার্টেন অঞ্চল বিদেশ দূতাবাসগুলির জন্য নির্দ্দিষ্ট। সেখানে বিরাট এবং সুদৃশ্য এক ভবন সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়া হল। উদ্দেশ্য তাঁর পরিকল্পিত কাজের সূচনা করা।

১৯৪১ সালের অক্টোবর মাস। প্রথম সপ্তাহে অনাড়ম্বর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ঐ ভবনে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার বা ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের প্রতিষ্ঠা করা হল। মধ্য ইউরোপের ভারতীয় বাসিন্দারা অবাক হলেন। জার্মান সরকার অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘকে কূটনৈতিক মর্যাদা দিলেন। অন্যান্য বিদেশী দূতাবাসগুলির মত শুধু মর্যাদাই পেল না, তার চেয়েও অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা এই স্বাধীনতা সংঘকে দেওয়া হল। পূর্ব চুক্তি মত অর্থ বরাদ্দও অব্যাহত রইল। সংঘের পরিচালনার মূল দায়িত্ব গ্রহণ করেন নেতাজী। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে এক দিকে তিনি স্বদেশভূমি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি যেমন লক্ষ্য রাখলেন, তেমনি বন্ধুদেশ জার্মানীর সঙ্গেও সখ্যতা বজায় রেখে চলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেন।

জার্মান সহ মধ্য ইউরোপে যেসব ভারতীয় পরিবার বসবাস করতেন, এর আগেই সুভাষচন্দ্র তাদের একটা তালিকা তৈরী করে রেখেছিলেন। সংঘের দায়িত্ব গ্রহণ এবং পরবর্তী পরিকল্পনা রূপায়িত করার পর তিনি ঐসব পরিবার থেকে বুদ্ধিদীপ্ত, শিক্ষিত এবং রাজনীতি সচেতন তরুণ-যুবকদের খুঁজে বার করতে লাগলেন। এক হিসাবে দেখা যায়, নভেম্বর মাসের ১৯৪১-এর মধ্যেই তিনি এক বেতারকেন্দ্র পরিচালনার কাজেই ঐ ধরণের প্রায় ত্রিশজন যুবককে নিয়োগ করেন। হিন্দী উর্দ্দু তেলেগু তামিলসহ বিভিন্ন ভাষা শিখে ঐসব তরুণ যাতে স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা সংঘের আদর্শ-উদ্দেশ্য প্রচার করে বিদেশে ব্যাপক প্রস্তুতির দায়িত্ব নিতে

পারেন, অতি অল্প দিনের মধ্যে তাদের সেভাবে গড়ে তোলা হল। ১৯৪১ সাল। ২ নভেম্বর। এদিন সদ্য গঠিত ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার অর্থাৎ স্বাধীনতা সংঘের প্রথম সভা বসল। সভার উদ্দেশ্য, সংঘের আদর্শ-উদ্দেশ্য, পরবর্তী কার্যক্রম এবং নিয়ম-নীতি নির্দ্ধারণ করা। সভায় পৌরোহিত্য করলেন সুভাষচন্দ্র। সভার শুরুতে স্বাধীনতা সংঘে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সকলকে উপস্থিত থাকতে বলা হল। সর্বপ্রথম তাদের শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা হল। পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য সততা, নিষ্ঠা ও সর্বপ্রকার শৃঙ্খলা বজায় রেখে জীবনপণ সংগ্রামের শপথ বাক্য পাঠ করালেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র।

সুভাষচন্দ্র এবার স্বাধীনতা সংঘের সদস্যদের নিয়ে বৈঠক শুরু করলেন। এক সংক্ষিপ্ত এবং মর্মস্পর্শী ভাষণে তিনি তাঁর সাধ ও স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে সকলের ঐকান্তিক সাহায্য ও সহায়তার জন্য আবেদন জানালেন। বললেন, দেশ মাতৃকার মুক্তিমন্ত্রের জন্য যদি জীবন দান করতে হয়—তা' হবে জীবন জয়ের সামিল। তিনি সকলকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাসিমুখে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, জাতির মুক্তির চেয়ে পরাধীন জাতির জীবনে আর কোনও বড় আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারেনা। সেই মুক্তির জন্য চাই নিরলস কর্মপ্রয়াস, দুঃসাহসী অভিযান, সততা নিষ্ঠা আর দুঃখ জয়ের মত দৃঢ় মানসিকতা।

সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য সকলের মন জয় করল। উপস্থিত সদস্যরা তাঁর আবেদনে সাড়া দিলেন। ক্ষুদ্র এক সভায় ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাস রচনার সূত্রপাত ঘটল।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের এই প্রথম সভায় যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করা হল তার মধ্যে চারটি প্রস্তাব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই চারটি প্রস্তাবই পরবর্তী সময়ে ভারতীয় জাতীয় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে। প্রস্তাবে বলা হয়। (এক) ভারতীয়

স্বাধীনতা সংঘ প্রস্তাবিত স্বাধীনতা অভিযানের যুদ্ধধ্বনি হবে 'জয়হিন্দ'। (দুই) জাতীয় নেতা সুভাষচন্দ্র এরপর থেকে নেতাজী রূপে পরিচিত হবেন—এবং জাতীয় নেতা সুভাষচন্দ্রকে নেতাজী নামে অভিহিত করা হবে। (তিন) ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত হবে—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জনগণমন অধিনায়ক গান এবং (চার) হিন্দী হবে স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের প্রথম সভা শেষ হল। এই সভা তাদের নেতা সুভাষচন্দ্রকে নেতাজী বলে সম্মানিত করল। সভায় সমবেত ধ্বনি উঠল জয়হিন্দ! নেতাজী আবেগ মথিত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—জয়হিন্দ ধ্বনি শুধুমাত্র আমাদের সমরধ্বনি নয়, সামাজিক অনুষ্ঠানে, প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি কাজে এই ধ্বনি হবে প্রতিটি ভারতবাসীর প্রেরণার উৎস। প্রতি মুহূর্তে আমাদের মাতৃভূমি ভারতর্ষের মুক্তির সুর এই পবিত্র ধ্বনির মধ্যে হবে বিধৃত! ভারতবাসী যুগযুগান্ত ধরে মুক্তিমন্ত্র এই জয়হিন্দ ধ্বনি উচ্চারণ করবে।

নেতাজী, জয়হিন্দ আর জনগণমন জাতীয় সঙ্গীতের ভাব-ভাষায় স্বাধীনতা সংঘের কর্মী-নেতারা অভিভূত হলেন। নভেম্বরের শীতেব আমেজও মুক্তির উত্তেজনায় উষ্ণ হল। সভা শেষে সমবেত ধ্বনি উঠল: জয়হিন্দ—নেতাজী জিন্দাবাদ। নেতাজীর চোখে মুখে তখন নতুন স্বপ্ন। উজ্জ্বল উচ্ছল তাঁর মুখমণ্ডলে ফুটে উঠল শপথদৃপ্ত অনাবিল হাসির রেখা। তিনিও সকলের সুরে সুর মিলিয়ে বললেন: 'জয়হিন্দ'!

১৯৪২ সালের ২৯ মে। ভারত-জার্মান সাংস্কৃতিক সমিতির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে হামবুর্গে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন হল। মহানগরীর মেয়র এবং পদস্থ সরকারী প্রতিনিধিবৃন্দ নেতাজীকে বিদেশী কূটনীতিকের মর্যাদা দিয়ে সেখানে স্বাগত জানালেন। ঐতিহাসিক ঐ অনুষ্ঠানে জনগণমন অধিনায়ক ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত গীত হল। উত্তোলিত তিন রঙা ভারতীয় জাতীয় পতাকা। ভারত এবং জার্মানের জাতীয়

পতাকা পাশাপাশি পত্‌পত্‌ করে আকাশে উড়ল। বোধহয়, ভারতের জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীত এই সর্বপ্রথম বিদেশের মাটিতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করল। অন্যান্য দেশের কূটনীতিবিদ সরকারী প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জার্মান সরকার নেতাজীকে রাষ্ট্রীয় সম্মানে অভিষিক্ত করলেন। হামবুর্গের মেয়র তথা জার্মান সরকারের প্রতিনিধি ঐ সভায় ভারতকে একটি স্বাধীন দেশের মর্যাদা দিয়ে ভারত জার্মানের মধ্যে সর্বপ্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন। নেতাজী জানতেন, ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতির সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় ভাষা প্রণয়নও অনিবার্য। নানা ভাষার দেশ ভারত-বাসীর মধ্যে ঐক্য দৃঢ় করার জন্যই তার প্রয়োজন। তিনি খুব সতর্কতার সঙ্গে তা' বিচার বিশ্লেষণ করলেন বার্লিন থাকাকালেই। স্থির করলেন, ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে হিন্দুস্থানী। মূলতঃ তা' হিন্দী। তবে ঐ ভাষাকে সর্বজন গ্রাহ্য করতে যতটা সম্ভব সহজ সরল করে তুলতে হবে। তাতে হিন্দী ছাড়াও সংস্কৃত আরবি পারসি ইংরাজী থেকে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করা চলবে। তিনি বললেন, কথ্য ভাষাকে কোনও নিয়ম-নীতির বেড়াজালে বেধে রাখা চলবে না। স্বাভাবিক গতিতে তার ব্যাপক প্রসার প্রচার ঘটুক। বিদেশী শব্দের অন্তর্ভূক্তি হিন্দুস্থানী ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলেই তিনি মনে করতেন। পৃথিবীর সব উন্নত ভাষাই নিজস্ব প্রয়োজনে বিদেশী শব্দ গ্রহণ করে থাকে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের কাছে সরল সহজ একটা গ্রহণযোগ্য ভাষা তুলে ধরবার জন্য নেতাজী সেদিন এই উদ্যোগ নেন। রোমান হরফে লেখা এই সরল হিন্দুস্থানী প্রচারের পেছনে তাঁর যুক্তি ছিল। রোমান শব্দের ব্যবহার ইউরোপ সহ পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশেই প্রচলিত। এর ফলে দেশবাসীর পক্ষে একটা বিদেশী ভাষার সঙ্গেও সাক্ষাৎ যোগাযোগ ঘটবার সম্ভাবনা থাকবে। উত্তর বা পূর্ব ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের মানুষের কাছেও হিন্দুস্থানী ভাষা এভাবে সহজে গ্রহণযোগ্য হবে। রোমান হরফ

ছাড়া আরবি বা দেবনাগরি হরফেও হিন্দুস্থানী ভাষা লেখা চলবে। তবে রোমান হরফের হিন্দুস্থানী ভাষাকে তিনি মূল সরকারী ভাষা রূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার শেষে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর নেতাজী ঐ রোমান হরফে হিন্দুস্থানী ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ, গ্রন্থ রচনার দায়িত্বভার বিভিন্ন ব্যক্তির উপর নির্দ্দিষ্ট করে দেন। ফলে অতি দ্রুত রোমান হরফে হিন্দুস্থানী ভাষার প্রসার ঘটে। পরবর্তীকালে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের মধ্যে ঐ ভাষা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

নেতাজী জার্মানের বার্লিন সহরে বসে সর্বপ্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ বা ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের প্রতিষ্ঠা করে আজাদ হিন্দ ফৌজের গোড়াপত্তন করেন। ক্রমে তার ব্যাপক বিস্তার ও প্রসার ঘটে। মূলতঃ ১৯৪২ সালের মে মাস থেকে নেতাজী ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংস্থা জার্মান সরকার এবং তার কূটনৈতিক চক্রের সমর্থন ও সম্মান পেতে থাকে। এসময় শ্রী এ, সি, এন, নাম্বিয়ার নামক এক ভারতীয় সাংবাদিক সহযোগীরূপে নেতাজীর সঙ্গে যোগ দেন। তিনি মধ্য ইউরোপে সুদীর্ঘদিন বসবাস করছিলেন। শ্রীনাম্বিয়ার সাংবাদিকতার সুবাদে মধ্য ইউরোপ সহ বিভিন্ন দেশের বহু রাজনৈতিক ঘটনা ও নেপথ্যের সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ছিলেন। সহযোগীরূপে শ্রীনাম্বিয়ারের মত অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে পাওয়ায় নেতাজীর সাংগঠনিক কাজে সবিশেষ সুবিধা হয়। পরবর্তী সময়ে শ্রীনাম্বিয়ার প্যারিসে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। সেই শাখাকেন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজের পরবর্তী অধ্যায় নেতাজীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সক্রিয় সহায়তা করে।

১৯৪১ সাল। নভেম্বরের ২ তারিখে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ তথা ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের প্রথম সভা বসে। এবং এই মাসের মধ্যে আজাদ হিন্দ বেতারকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়। আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম ভাষণে নেতাজী আবেগ জড়িত কণ্ঠে ঘোষণা

করেন: আমার জীবনের একমাত্র সাধ এবং সাধনা ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা। চারদিকে গুজব রটেছে আমার মৃত্যু ঘটেছে। হে প্রিয় ভারতীয় ভাই ও ভগ্নীগণ, আমি মৃত্যুর গহ্বর থেকে উঠে এসেছি। সর্বশক্তিমান দর্শকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমার মৃত্যু কামনা করলেও ঈশ্বর তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করেননি।

১৯৪০ সালে বৃটিশ কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে আমি আর আপনাদের মুখোমুখি হইনি। এবার হাজার হাজার মাইল দূর থেকে আপনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আপনাদের অর্দ্ধনগ্ন, ক্ষুধার্ত্ত, ম্লান ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। দেশমাতৃকা ও দেশবাসীর সার্বিক মুক্তির জন্য আমার এই দেশত্যাগ।

স্বদেশভূমির মুক্তির মধ্য দিয়ে আমি আপনাদের কাছে আবার ফিরে আসতে চাই। স্বাধীনতা সূর্য উদয়ের পথে। ঘুমাবার মত সময় আর নেই। আপনারা জাগুন। সকলের জাগ্রত অভিযান বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাবেই। আমি বেঁচে আছি এবং থাকব। মুক্ত ভারতের আকাশের নীচেই যেন আমার মৃত্যু ঘটে। নেতাজীর যখন বেতার ভাষণ শেষ হল, তখন তাঁর দু'চোখের পাতা ভেজা। ভাবাবেগ আর অনির্বচনীয় অনুভূতিতে তখনও তিনি তন্ময়।

বলা চলে, এই বেতার ভাষণের মধ্য দিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র নিজেকে প্রথম সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করলেন। এবং এর পর থেকে তিনি সর্বত্র নেতাজীরূপে পরিচিত হলেন।

জার্মান সরকার নেতাজীর প্রথম বেতার ভাষণের প্রতিক্রিয়া জানতে আগ্রহী হলেন। কাবুলের জার্মান প্রতিনিধি গোপন এক বার্তায় তার সরকারকে সেখানকার ভারতীয়দের মধ্যে নেতাজীর বেতার ভাষণ সম্পর্কে উৎসাহ উদ্দীপনার কথা জানালেন। শুধু কাবুলে নয়, সুদূর ভারতবর্ষ তথা এশিয়াবাসীর কাছে নেতাজীর বেতার ভাষণ উদ্দীপনার সৃষ্টি করল। জার্মান সরকার স্বভাবতই নেতাজীর

জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্বের বিচার বিশ্লেষণ জানতে পেরে খুশী হলেন। তারপর উৎসাহিত হয়ে আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্রকে জার্মান সরকার প্রতিদিন কম করে তিন ঘণ্টার অনুষ্ঠানসূচী প্রচারের অনুমতি দিলেন।

সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিদিন তিন ঘণ্টার অনুষ্ঠানসূচী বজায় রাখা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তা' সত্বেও নেতাজী এই সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী একাধিক তরুণ ভারতীয়কে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করলেন। তাদের মধ্যে কেউ দক্ষিণ ভারতের, কেউ উত্তর ভারতের আবার কেউ বা শুধু কাবুল কান্দাহার থেকে আসা প্রবাসী। জার্মান সরকারের কারিগরী সহায়তায় সংক্ষিপ্ত শিক্ষণ ব্যবস্থার পর এক দলকে যেমন বেতার প্রচারে দক্ষ করে তুললেন, অন্যদের আবার ইংরাজী, হিন্দী, উর্দ্দু, তামিল, তেলেগু, পুস্তু ভাষায় বেতার পাঠের উপযোগী করে তৈরী করা হল। আফগান থেকে এক যুবককে আনা হল। সে ছিল অর্থনীতির একজন কৃতিছাত্র। পারসী ভাষার অনুষ্ঠানসূচী পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করা হল। দিল্লীর এক তরুণ হলিউডে গিয়েছিলেন চলচ্চিত্র প্রযোজনার কাজ শিখতে। জার্মানীতে সে আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য এসেছিল। নেতাজী তাঁকে ডেকে হিন্দী অনুষ্ঠানসূচীর দায়িত্ব দিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দুই তরুণকে তিনি যুদ্ধবন্দী শিবির থেকে খুঁজে বার করলেন। সুশিক্ষিত ঐ দুই তরুণ পুস্তু ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিল। বেতার পরিচালনার কাজে নেতাজী তাদেরও সামিল করলেন। প্যারিসে এক তরুণ ব্যবসায়ীর খোঁজ পেলেন। জানতে পারলেন, জাতীয়তাবাদী তরুণ ব্যবসায়ী তামিল ভাষায় তুখার নেতাজী তড়িঘড়ি তাকে বার্লিনে আনানোর ব্যবস্থা করলেন। এভাবে নেতাজী অতি অল্পদিনের মধ্যে ভারতীয় প্রায় সকল ভাষায় অভিজ্ঞ তরুণদের বেতার কেন্দ্রের কাজে নিয়োগের ব্যবস্থা করলেন। তারা নিয়মিত সংবাদ

রচনা সমীক্ষা ও পর্যালোচনা করত। অল ইণ্ডিয়া রেডিও এবং বি, বি, সির সংবাদ শুনে তার প্রতিবাদ এবং ভারতীয় জাতীয় নেতাদের কার্যক্রম সবিস্তারে আজাদ হিন্দ বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচার করত। এছাড়া ভারতীয় নেতাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, বৃটিশ রাজের দুরভিসন্ধি, ভারত বিভাগের অপচেষ্টা, পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য মোহম্মদ আলি জিন্নার তৎপরতা ইত্যাদি সংবাদটিকা প্রচার করে তারা স্বাধীন এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করত। আর প্রায় প্রতিদিনই নেতাজীর উদ্দীপনাময় ভাষণ বিভিন্ন ভাষায় সম্প্রচারিত করা হত।

১৯৪২-এর আগস্টে যখন সারাদেশে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়, সুদূর জার্মান থেকে আজাদ হিন্দ বেতার তখন সরা বিশ্বে সে খবর প্রচারের দায়িত্বভার বহন করে।

একদিকে আজাদ হিন্দ বেতারকেন্দ্র রাজনৈতিক প্রচার ও জনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করে। অন্যদিকে মধ্য ইউরোপ ও বিশ্বের অন্যান্য স্থানে বৃটিশ বাহিনীতে যেসব ভারতীয় জওয়ান কর্তব্যরত ছিল, তাদের মধ্যে স্বদেশ প্রীতি সঞ্চারের সহায়তা করে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের অগ্নিক্ষরা ঐ দিনগুলোয় বৃটিশ বাহিনীতে কয়েক লক্ষ ভারতীয় জওয়ান কর্মরত ছিল। নেতাজী জানতেন, তাদের মানসিকতা পরিবর্তনে অনবরত তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার অপরিহার্য। আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্রের ঐ প্রচার বস্তুতঃ বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয়দের স্বাধীনাতবোধ জাগাতে এবং ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ আন্দোলনের ধারা বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। ফলে এশিয়া ও ইউরোপের সর্বত্র বৃটিশ বিরোধী মনোভাব যেমন সৃষ্টি হয়, তেমনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবীর যৌক্তিকতা পুনঃ পুনঃ প্রচারিত ও প্রভাবিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান যখন বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফ্রণ্টে লড়াই শুরু করে, তখন থেকে বৃটিশ সেনা বাহিনীর বহু ভারতীয়

তাদের হাতে বন্দী হয়। শত্রুপক্ষের হয়ে লড়াই করা ভারতীয় সেনাদের তারা যুদ্ধবন্দী শিবিরে বিশেষ কড়াকড়ির মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। নেতাজী যখন বার্লিনে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার গড়ার কাজে হাত দেন, তখন থেকেই ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের সমস্যাটা তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়! কিন্তু তখনও পর্যন্ত ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার মত সুযোগ সুবিধা বা ক্ষমতা নেতজীর হাতে ছিল না। কিন্তু প্রাথমিক কাজ শেষ করে জার্মান সরকারের সঙ্গে হৃদ্য ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ার পর এবার ভারতীর যুদ্ধবন্দীদের কথা নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন। তিনি জানতেন, ভারতীয় ঐ যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর অনুরোধ জার্মান সামরিক বাহিনী বিশেষ ভাবে বিবেচনা করবেন। কিন্তু তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করার পর দেশে গিয়ে ফের হয়তো তারা আবার বৃটিশ বাহিনীতে যোগ দেবে। নেতাজী তাই তাদের তাৎক্ষণিক মুক্তির প্রশ্নের চাইতেও যুদ্ধবন্দী শিবির পরিদর্শনের উপর বেশী গুরুত্ব দিলেন। ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের স্বাধীনতা যুদ্ধের কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায় কিনা, তা' যাচাই করার জন্যই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন।

বার্লিনের অদূরে আননাবার্গ যুদ্ধবন্দী শিবির। বৃটিশ বাহিনীর ধৃত ভারতীয় সেনাদের এই শিবিরে রাখার ব্যবস্থা হয়। কয়েক হাজার যুদ্ধবন্দীর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য জার্মান সামরিক বাহিনীর অতন্দ্র প্রহারা। নেতাজী সে খবর জানতেন। একদিন জার্মান সামরিক বাহিনীর সদর দপ্তরে প্রস্তাব পাঠালেন, যুদ্ধবন্দী শিবিরে সরেজমিনে তিনি ভারতীয় জওয়ানদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে চান। নেতাজীর প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানালেন।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা, আননাবার্গ যুদ্ধবন্দী শিবিরে খবর দেওয়া হল, নেতাজী তা' পরিদর্শন করবেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নেতাজী সেখানে উপস্থিত হতেই ভারতীয় যুদ্ধবন্দীরা নেতাজীর নামে জয়ধ্বনি করল।

বিমর্ষ বন্দী শিবিরে অভাবিতভাবে প্রাণের জোয়ার নেমে এল। যে যা পেল তাই দিয়ে নেতাজীকে বরণ করল। নেতাজীর একটু স্পর্শ পাওয়ার জন্য সুশৃঙ্খল সেনাদের মধ্যেও কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। নেতাজীও অভিভূত। বিদেশ বিভূঁইয়ের বিদেশী সরকারের বন্দী শিবিরে ভারতীয় তরুণদের দেখে নেতাজীর হয়তো ভাবান্তর ঘটল। অভাব অনটনে পড়ে গ্রাম-ভারতের এই তরুণরা তাদের আত্মীয় পরিজন ত্যাগ করে বিদেশী শাসকের স্বার্থে সুদূর রণাঙ্গণে যুদ্ধ করতে এসে বন্দী। সহজ সরল এই ভারতীয় তরুণরা অভাবী মায়ের দুঃখ ঘুচাতেইতো সামান্য অর্থের বিনিময়ে জীবনের এই চরম ঝুঁকি নিয়েছে। সুদূর প্রবাসের বন্দী শিবিরে তরুণ তাজা হাজারো ভারতীয়ের ম্লানমুখের হাসি নেতাজীকে ব্যথিত করল। সাময়িকভাবে তিনি হতবাক আবেগরুদ্ধ। তারপর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন: তোমরা এতদিন যুদ্ধ করেছ বিদেশী শক্তির স্বার্থরক্ষা করতে। ঘরের মায়ের দুঃখ মোচনের জন্য তোমরা জীবন মরণের পথে পা বাড়াতে ভয় পাওনি। ঘরের মায়ের চেয়েও বড় আমাদের সকলের মা। দেশমাতার দুঃখ দূর করার পবিত্র দায়িত্বভার এবার আমাদের সকলকে একসঙ্গে নিতে হবে। দেশমাতার মুক্তির মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের গৃহজননীর মুখে হাসি ফুটাতে পারব।

নেতাজীর মর্মস্পর্শী সংক্ষিপ্ত ভাষণে বন্দীশিবির গুমড়ে কেঁদে উঠল। সুদূর প্রবাসের বন্দীশিবিরে থাকা মানুষগুলো এতদিন বেতার তরঙ্গে ভেসে আসা নেতাজীর কথা শুনে আসছিল। চোখের সামনে আজ সেই মহাননেতা নেতাজীকে তারা দেখল। শুনল, আবেগরুদ্ধ নেতাজীর সংক্ষিপ্ত ভাষণ। তারপর নিজেদের অজান্তে মন্ত্রমুগ্ধের মত কখন তারা হাততালি দিয়ে নেতাজী আর দেশজননীর নামে জয়ধ্বনি করে উঠল, বুঝতেও পারল না!

সারা শিবির এক ক্ষুদে ভারতে পরিণত হল।

বিভিন্ন প্রদেশের তরুণ ভারতীয় জওয়ানরা বুকের রক্ত দিয়ে শপথ

নিল। দেশজননীর মুক্তিযুদ্ধে সামিল হতে তারা ততক্ষণে উৎসুক অধীর। নেতাজী তাঁদের দেশপ্রেমের স্পর্শে মুগ্ধ হলেন। মুগ্ধ জার্মান সামরিক বাহিনীর পদস্থ অধিনায়করাও। তাঁরাও বুঝলেন, নেতাজী ভারতীয়দের কাছে দেশপ্রেমের এক জ্বলন্ত প্রতীক। বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতকে উদ্দীপ্ত করতে নেতাজীর নেতৃত্ব অপরিহার্য। নেতাজীর আননাবার্গ বন্দী-শিবির পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল, বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় জওয়ানদের মানসিকতা ও মনোবল যাচাই করা। তিনি শিবির ত্যাগ করে স্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে, মধ্য ইওরোপের বৃটিশবিরোধী যেসব দেশে ভারতীয় জওয়ানরা যুদ্ধবন্দী, তাদের নিয়ে অনতিবিলম্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তোলা প্রয়োজন। যুদ্ধবন্দী ভারতীয় জওয়ানরা বুঝতে পেরেছে যে বিদেশী শাসকের হয়ে যুদ্ধ করার চেয়ে স্বদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া অনেক বেশী গৌরবের। তাছাড়া বৃটিশ সেনানায়কদের ঘৃণ্য আচার-আচরণও ভারতীয় জওয়ানদের মন বিষিয়ে তুলেছিল।

যুদ্ধবন্দী শিবিরে নেতাজীর স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্দ্ধনা ও তাঁর জনপ্রিয়তার সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদ-মাধ্যমে প্রচারিত হল। শিবিরে শিবিরে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় জওয়ানদের মধ্যে তীব্র উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হল। জার্মান কর্তৃপক্ষের কাছেও সে সংবাদ অজ্ঞাত রইল না। নেতাজী এবার তাঁর প্রস্তাবিত সামরিক বাহিনী গড়ার কাজে হাত দিতে উদ্যোগী হলেন। মধ্য ইউরোপের যেসকল দেশ জার্মানের মিত্র বলে পরিচিত ছিল, সেইসব দেশ থেকে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের এনে নেতাজীর হাতে তুলে দিতে জার্মান সরকারের বিদেশ-দপ্তর সক্রিয় হল। রণকৌশলের দিক থেকে বৃটিশ বিরোধী ভারতীয় নেতা নেতাজীর শক্তিবৃদ্ধি করতে জার্মান ও তার মিত্ররাষ্ট্রগুলি ঐক্যমত হলেন। প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা নেতাজী এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়লেন না।

নেতাজী এবার সাংগঠনিক দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিলেন। তিনি

জার্মান সরকারের সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে প্রথমেই কয়েকটি সর্তে চুক্তি করার প্রস্তাব রাখলেন। আগে সরকারী পর্যায়ে চুক্তি করে নতুন উদ্যমে তাঁর প্রস্তাবিত সামরিক বাহিনী গড়ার জন্য তিনি বিস্তৃত পরিকল্পনা খাড়া করলেন। জার্মান সরকার নেতাজীর আন্তরিকতা নিষ্ঠা এবং সততায় আস্থাশীল ছিলেন। সুতরাং তাঁর চুক্তি প্রস্তাবে তাঁরা আর দ্বিধা বা কালক্ষেপ করলেন না। যুদ্ধের দ্রুত বিস্তার এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিও অবশ্য জার্মান সরকারকে নেতাজীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে প্রকারান্তে উৎসাহ যোগাল।

নেতাজীর সঙ্গে জার্মান সরকারের যে চুক্তি হয়, তার অন্যতম সর্ত হল :

(ক) ভারতীয় জওয়ানদের স্বদেশভূমি ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনও রণাঙ্গণে পাঠানো অথবা জার্মান বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত করা চলবেনা।

(খ) জার্মান সেনাদের মত তাদের আধুনিক অস্ত্র পরিচালনা ও ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে। জাতীয় চেতনা, শৃঙ্খলাবোধ, সহযোদ্ধাদের সঙ্গে সখ্যতা বজায় রাখতে এবং উচ্চপর্যায়ের সামরিক শিক্ষা প্রদানে জার্মান সামরিক বাহিনী বাধ্য থাকবেন।

(গ) প্রতিটি ভারতীয় জওয়ান জার্মান সেনাদের সমমর্যাদা পাবে। খাদ্য পোষাক বেতন ভাতা ও ছুটি সহ কোন ব্যাপারেই তার হেরফের চলবেনা। এবং ভারতীয় জওযানরা কেবলমাত্র ভারতীয় নেতার নেতৃত্বাধীনেই পরিচালিত হবে।

জার্মান সামরিক বাহিনী নেতাজীর সঙ্গে উপরোক্ত মর্মে চুক্তি করলেন। নেতাজীও এতদিন এই চুক্তির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আর কালক্ষেপ করলেন না। পরিকল্পিত কাজের প্রথম ধাপ হিসাবে সর্বপ্রথম মধ্য ইউরোপের যুদ্ধবন্দী শিবিরের ভারতীয় জওয়ানদের মানসিকতা যাচাই করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি জানতেন, অর্থাভাবে অর্ধ শিক্ষিত শোষিত সহজ সরল সহস্র

সহস্র ভারতীয় জওয়ান বৃটিশবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য হয়। সেইসব তরুণ ভারতীয়দের সুদূর রণাঙ্গণে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে বৃটিশ নেতারা সাম্রাজ্য বিস্তার এবং শোষন-শাসন অব্যাহত রাখতে চায়। বৃটিশ সামরিক দপ্তর তাদের মানসিকতা পরিবর্তনেও নানা পন্থা অবলম্বন করে এবং দেশ ও দেশনেতাদের সম্পর্কে ভিত্তিহীন তথ্য প্রচার করে। বৃটিশরাজই যে ভারতবর্ষের প্রকৃত শাসক এবং উন্নতির একমাত্র সহায়ক, সেই মানসিক দৃষ্টিতে তরুণ ভারতীয় জওয়ানদের মগজ ধোলাইয়ের ব্যবস্থা হয়। রণাঙ্গণে বৃটিশবাহিনীর যেসব ভারতীয় জওয়ান মধ্য ইউরোপে জার্মান এবং তার মিত্র দেশের হাতে যুদ্ধবন্দী হয়ে নিঃসঙ্গ শিবির জীবন যাপন করছে, নেতাজী তাদের সর্বশেষ মানসিকতা ও অবস্থা সরেজমিন পর্যালোচনা ও পরিদর্শন করতে চাইলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যুদ্ধবন্দী শিবিরের তরুণ জওয়ানদের তিনি স্বদেশভূমি পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের সামিল করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন। এবং তাদের সাহায্যে বিরাট এবং ব্যাপক আজাদী সেনা গড়ে তুলবার মহানব্রতে তিনি সার্থক হবেন।

নেতাজী যুদ্ধবন্দী শিবির পরিদর্শনের আগে জার্মান সামরিক অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করে বার্লিন সহরের উপকণ্ঠে একটি বিস্তীর্ণ ব্যারাক নিজের কর্তৃত্বে তুলে নিলেন। উদ্দেশ্য, যুদ্ধবন্দী শিবিরের যেসব ভারতীয় জওয়ান তাঁর প্রস্তাবিত আজাদী বাহিনীতে যোগ দিতে ইচ্ছুক তাদের মানসিকতা যাচাই করা। তারপর বৃটিশবাহিনীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ঐসব তরুণদের আধুনিক রণবিদ্যা শিক্ষায় বিশেষ ভাবে শিক্ষিত করে তোলা। ব্যারাকে রাখা সেনাদের মধ্যে স্বদেশ চেতনা বৃদ্ধি করতে এবং ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ তাদের মধ্যে দ্রুতভাবে ছড়িয়ে দিয়ে প্রতিটি তরুণকে এক একটি জ্বলন্ত 'মুক্তিদূতে' পরিণত করা। প্রতিটি জওয়ান ব্যারাকে বসবাস কালে যাতে সামরিক পোষাক এবং মুক্তিবাহিনীর

তাঁরা নিজেরাই প্রভুত্ব বিস্তার চায়। নেতাজীর লেখা সেই ঐতিহাসিক পত্র জার্মান ফরেন অফিসের ফাইলে থাকার কথা। কারণ, ওয়ারম্যান নেতাজীর ঐ চিঠি সরকারীভাবে দপ্তরে জমা করেছিলো। এছাড়াও নানা বৈঠক, সভা ও ব্যক্তিগত আলোচনায় নেতাজী জার্মানীতে থাকাকালে রুশ-জার্মান যুদ্ধের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন। রাশিয়ার উপর জার্মানীর অভিযানে মর্মাহত নেতাজী বুঝতে পেরেছিলেন, ইউরোপ ছেড়ে তার এশিয়ার মাটিতে উপস্থিতি একান্ত-ভাবে প্রয়োজন। অতএব সব দিক বিচার বিবেচনা করে দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন নেতাজী জার্মান ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। এবং জার্মান ত্যাগের আগে সেখানকার আজাদী সেনাদের নির্দ্দেশ দেনঃ তারা যেন কোনমতেই অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে না নামে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য পরাধীন ভারতবর্ষ মুক্ত করা। সেই মহান ব্রত পালনই হবে তাদের প্রধান এবং একমাত্র লক্ষ্য!

১৯৪২-এর শেষ এবং ৪৩-এর গোড়ার কথা। বিশ্বরাজনীতি আরও জটিল হল। সর্বশেষ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে দূরদ্রষ্টা ও বিচক্ষণ নায়ক নেতাজী শেষপর্যন্ত জার্মান ত্যাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। হাতে সময় কম। সেই তুলনায় কাজ অনেক বেশী এবং গুরুত্বপূর্ণ। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুপক্ষের গোয়েন্দাদের চোখে ধুলি দিয়ে তাঁকে বার্লিন থেকে বিদায় নিতে হবে। পথে বৃটিশ-মার্কিন এবং তার মিত্রপক্ষের অতন্দ্রপ্রহরা। অতএব, জার্মান ত্যাগের পূর্বাপর সময়ের জন্য প্রয়োজন অত্যন্ত গোপন কৌশল এবং তৎপরতা। আর সেই কৌশল এবং তৎপরতার জন্য তিনি অনুভব করলেন একজন সেক্রেটারি বা একান্ত সচিবের।

নেতাজী সম্পূর্ণ বিষয়টা গভীরভাবে ভাবলেন। অতঃপর ভিয়েনায় তিনি গোপন বার্তা পাঠালেন শ্রীমতী এমিলি শেঙ্কল-এর কাছে। তাঁকে অনতিবিলম্বে বার্লিনে চলে আসবার নির্দ্দেশ দিলেন। তার

আগেও শ্রীমতী এমিলি বার্লিনে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারে, নেতাজীর সচীবরূপে সুদীর্ঘদিন কাজ করে গেছেন। ১৯৪২ সালের জুলাই পর্যন্ত তিনি বার্লিনে নেতাজী ও ফ্রি ইণ্ডিয়া সার্ভিসের বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান সহযোগিণী ছিলেন। ফলে বার্লিন সহর এবং সেখানকার রাজনৈতিক আবহাওয়া তাঁর কাছে খুবই পরিচিত ছিল। ভিয়েনার কন্যা হলেও জার্মান বার্লিন তাঁর এক নতুন কর্মকেন্দ্ররূপে চিহ্নিত। বার্লিন সরকার এবং কূটনীতিকদের কাছেও তাঁর সবিশেষ পরিচিতি ছিল।

১৯৪৩ সালের জানুয়ারি। নেতাজীর গোপন নির্দেশ পেয়ে শ্রীমতী এমিলি বার্লিনে এসে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর কোলে ছিল মাত্র ছয় সপ্তাহের শিশু কন্যা। সপ্তাহ তিন চার আগেই নেতাজী ভিয়েনা গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর সদ্যোজাতা শিশুসন্তান অনিতাকে প্রথম দেখেন এবং বড়দিনের উৎসবে যখন ভিয়েনার মানুষ উৎসব-মুখর, তখন নেতাজীর মনে অন্য স্বপ্ন। তার আগেই সিঙ্গাপুর বৃটিশ বাহিনীর হাতছাড়া হয়ে জাপানীদের জমানায় চলে গেছে। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে প্রবাসী ভারতীয়রা সংঘবদ্ধ আন্দোলনের জন্য তৎপর। রাসবিহারীর নেতৃত্বে জাপ-সেনারা প্রবাসী ভারতীয়দের বৃটিশ বিরোধী মনোভাবকে নানা ভাবে কাজে লাগাতে ব্যস্ত। অতএব পূর্ব এশিয়ায় ছুটে যেতে নেতাজী অধীর-অধৈর্য হয়ে উঠলেন।

শ্রীমতী এমিলি ভিয়েনা থেকে নেতাজীর ডাক পেয়ে ছুটে এলেন। বুঝলেন, হয়তো তাঁর চূড়ান্ত বিদায়ের পালা আগত। কেননা, তার কয়েক মাস আগে অর্থাৎ ১৯৪২-এর অক্টোবর মাসে নেতাজী একবার জার্মান ত্যাগের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। তখন তাঁকে বিদায় দেওয়ার আনুষ্ঠানিক পর্বও শেষ হয়েছিল। কিন্তু জরুরী কারণে তিনি সে যাত্রা বাতিল করেন। অতএব, মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে নেতাজীর জরুরী তলব পেয়ে তিনি তার নিগূঢ় অর্থ বেশ বুঝতে

পারলেন। এবং বার্লিনে এসে উঠলেন, সোদিয়েন স্ট্রাসের বাস-ভবনে। সেখানেই নেতাজী বসবাস করতেন।

নেতাজীর বার্লিন ত্যাগ এবং তার পূর্বেকার বর্ণণা প্রসঙ্গে শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু বিদেশ সফর কালে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে লিখেছেন : জানুয়ারির মাঝামাঝি শ্রীমতী এমিলি এসে পৌঁছেছিলেন বার্লিনে। ইউরোপ ছেড়ে যাওয়ার আগে শেষ কয়েক সপ্তাহ একদিক থেকে নেতাজীর খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছিল। অপরদিকে সাবমেরিন যাত্রর ব্যাপারটা নিয়ে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত অনিশ্চয়তার অবধি ছিল না। শর্মা, আল্টি, ওয়ার্থ, নাম্বিয়ার সকলের কাছে শোনা টুক্‌রো টুক্‌রো ঘটনার মধ্য দিয়ে এদিনগুলির একটা আভাস আমরা পেয়েছিলাম।

২৩ জনুয়ারি ১৯৪৩ নেতাজীর ছেচল্লিশ তম জন্মদিন। ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের বন্ধু ও সহকর্মীরা বেশ জাঁকজমক সহকারে জন্মদিনের উৎসব করেছিলেন। নেতাজীর রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একখানি প্রতিকৃতি আঁকিয়ে উপহার দেওয়া হল ওঁকে। চারদিকে আনন্দ কলরোলের মধ্যে কে যেন প্রস্তাব করেছিলেন, সামনের বছর এই দিনটি কেমন করে পালন করা হবে। নেতাজী হঠাৎ বললেন : সামনের বছর এদিনে আমি খুব সম্ভব তোমাদের কাছে থাকব না। থম্‌কে গেলেন সকলে একটু। নেপথ্যে যাত্রার প্রস্তুতি যে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। সেখবর গোপন রাখা হয়েছিল সযত্নে। তারপর এল ২৬ জানুয়ারি। পরাধীন ভারতবর্ষের 'স্বাধীনতা দিবস'। বার্লিন এয়ারফোর্স হাউসে আড়ম্বর সহকারে অনুষ্ঠান হল সেদিন। বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকবৃন্দ ও অন্যান্য অভ্যাগতদের সামনে নেতাজী জার্মান ভাষায় বক্তৃতা করলেন। বললেন, দেশে রাজরোষের ভয়ে এই দিনটি সর্বদা নিঃশঙ্কচিত্তে পালন করতে পারেননা ভারতীয়রা। সমবেত দর্শকদের কাছে উনি বর্ণণা করলেন, বারো বছর আগে

কলকাতার মেয়র থাকার সময় এই দিনটিতে উনি যখন শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা নিয়ে রাজপথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন বৃটিশ অশ্বারোহী পুলিশ বর্বরের মত তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আজও তাঁর দেহে সেদিনের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

উনি বলেছিলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এনে দেবে প্রাচ্যের সব দেশে স্বস্তি। "A free India will mean that the countries of the near, Middle and Far East will breathe freely—"

নেতাজীর জার্মান ত্যাগের প্রস্তুতিপর্ব শেষ হল। সহধর্মিনী-সচিব শ্রীমতী এমিলির উপর নির্দেশ হল, নেতাজীর বার্লিন ত্যাগের পরও যেন তিনি সোদিয়েন স্ট্রাসের বার্লিনস্থ বাসভবনে নিদিষ্টকাল বসবাস করেন। তাঁর আচার আচরণ ও চলায়-বলায় যেন এমন একটা ভাব ফুটে ওঠে যে, নেতাজী এখানেই আছেন এবং থাকবেন। এছাড়াও নেতাজী বেশ কিছু নির্দেশ বার্তা শ্রীমতী এমিলির কাছে রাখলেন, যা তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে করতে হবে।

অবশেষে যাত্রাকাল নিদ্দিষ্ট হল—৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ সাল। খুব ভোরে নেতাজী এদিন শয্যাত্যাগ করলেন। একটু বাদেই তিনি বার্লিন সহর ছেড়ে কীল-এর পথে যাত্রা করবেন। তার আগে নেতাজীর মেজদাদা শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়ল। রাজনৈতিক জীবনে শরৎচন্দ্র বসু ছিলেন তাঁর অন্যতম অভিভাবক এবং পরামর্শদাতা। অতএব জীবনের দুঃসাহসী আর এক অভিযানের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তিনি কালি-কলম নিয়ে বসলেন। তাঁর প্রস্তাবিত অভিযান শেষে তিনি আর বেঁচে থাকবেন কীনা, তা নিয়েও নেতজীর সন্দেহ ছিল। কারণ, ইউরোপ থেকে এশিয়া যাওয়ার গোপন যাত্রাপথ নির্দিষ্ট ছিল মহাসমুদ্রের অতল দেশ। সেই দুর্গম বিপদসঙ্কুল পথে বিছানো ছিল শত্রুপক্ষ বৃটেন আর মার্কিনীদের অজস্র মাইন আর সাবমেরিন বিধ্বংসী মারণাস্ত্র। অতএব মৃত্যুপথ যাত্রী নেতাজী যাত্রা শুরুর সূচনায় তাঁর মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুর উদ্দেশ্যে লিখলেন:

পরম পূজনীয় মেজদাদা, আজ পুনরায় আমি বিপদের পথে রওনা হইতেছি। এবার কিন্তু ঘরের দিকে। হয়তো পথের শেষ আর দেখিব না। যদি তেমন বিপদ পথের মাঝে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইহ জীবনে আর কোন সংবাদ দিতে পারিব না।…
আমার অবর্তমানে আমার সহধর্মিনী ও কন্যার প্রতি একটু স্নেহ দেখাইবে—যেমন সারাজীবন আমার প্রতি করিয়াছ।…
ইতি, বার্লিন ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩।
তোমার স্নেহের ভ্রাতা সুভাষ।

চিঠি শেষ করলেন। একবার তার উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন নেতাজী। তারপর তাঁর যাত্রা শুরুর পালা।

বার্লিনের শহরতলী রেল স্টেশন লেহর্টার বানহোফ থেকে নেতাজী একটি লোকাল ট্রেনে উঠলেন। সঙ্গী হলেন নাম্বিয়ার, স্টেট সেক্রেটারি উইল হেলম কেপলার, আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ, নাম্বিয়ার এবং আবিদ হাসান। ওঁরা যথাসময়ে গিয়ে কীল সহরের এক হোটেলে উঠলেন। বার্লিন ছেড়ে কীল যাওয়ার সম্পূর্ণ বিষয়টা বিশেষভাবে গোপন রাখা হল।
কীল সহরের হোটেলে মাত্র একটি রাত্রিবাস। সেই রাত্রির অন্ধকারে লেখা হল পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের আর এক দুঃসাহসী ইতিহাস। সে ইতিহাসেরও নায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র। আর তাঁর সহযোগী অনুগামী আবিদ হাসান।
রাত্রি ভোর না হতেই নেতাজী ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে তাড়াহুড়া পড়ে গেল। নাম্বিয়ার, কেপলার, ওয়ার্থ প্রমুখ নেতাজীর এই যাত্রার সব ব্যবস্থা পূর্ণ করলেন। ইতিমধ্যে জার্মান সাবমেরিনের ক্যাপটেন নির্দ্দিষ্ট সময়ে গাড়ি নিয়ে নির্দ্দিষ্ট হোটেলের সামনে হাজির হলেন। সংক্ষিপ্ত লাগেজসহ নেতাজী ও আবিদ হাসানের সঙ্গে কিপলার

নাম্বিয়ার ওয়ার্থরাও গাড়িতে উঠলেন। তারপর অল্প সময়ের মধ্যে গাড়ি গিয়ে সমুদ্র সৈকতে দাঁড়াল। সেখানেই অপেক্ষা করছিল একটি জার্মান জঙ্গী সাবমেরিন। নেতাজী এবার আর কোন কথা বললেন না। সরাসরি তিনি গিয়ে সাবমেরিনে উঠলেন। তাঁকে অনুসরণ করলেন আবিদ হাসান। সমুদ্র তীরে দাঁড়ানো নাম্বিয়ার কিপলার ওয়ার্থরা নেতাজী আবিদ হাসানকে বিদায় জানাতে হাত তুললেন। কিন্তু তার আগেই জঙ্গী সাবমেরিণ আচমকা সমুদ্র জলের অতলে ডুব দিল। বিশাল বিস্তীর্ণ দিক্‌শূন্য সমুদ্রের তরঙ্গ মালায় মুহূর্তে সব কিছুই মিলিয়ে গেল। কীল বন্দরের সমুদ্র উপকূলে দাঁড়ানো কয়েকজন নেতাজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সহযোগী ছাড়া কাক-পক্ষীটিও জানতে পারল না, নেতাজী ইউরোপের মাটি ছেড়ে কোন পথে, কীভাবে এশিয়ার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন।

জার্মান সাবমেরিন চড়ে মহা সমুদ্রের তলদেশ পথে নেতাজী তাঁর সহকর্মী আবিদ হাসানকে নিয়ে দুর্গম পথে যাত্রা করলেন। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারির ৮ তারিখে তাঁর এই স্মরণীয় যাত্রা শুরু, আর এই বছরেরই মে মাসের কোন এক সময় তার শেষ। সুদীর্ঘ প্রায় সাড়ে তিনমাসকাল ধরে তিনি আটলান্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের অতল দেশ অতিক্রম করেন। এই সুদীর্ঘ গোপন ও দুর্গম যাত্রা পথের সঠিক এবং বিস্তৃত বিবরণ এখনও পাওয়া যায়নি। কেননা, এবিষয় নেতাজীর নিজস্ব কোন বক্তব্য আজও পর্যন্ত অজ্ঞাত। তবুও যতদূর খবর সংগৃহীত, তাতে জানা যায়, জার্মান সাবমেরিন নেতাজীকে আটলান্টিক মহাসমুদ্রের সুগভীর এবং সুদীর্ঘ অতলপথ ধরে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে 'ম্যাডাগাসকার' উপকূল পর্যন্ত বহন করে। পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী অপর দিকে অন্য একটি জাপানী সাবমেরিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট মালয়ের পেনাং উপকূল থেকে ম্যাডাগাসকার উপকূলে গিয়ে হাজির হয়। পরিকল্পিত এবং সম্পূর্ণ গোপন ব্যবস্থাপনার মধ্যে নেতাজী তাঁর সহকর্মীসহ জার্মান সাবমেরিণকে

বিদায় দিয়ে জাপ সাবমেরিনে চাপেন। তারপর ভারত মহাসাগরের তলদেশ পথ ধরে এসে পৌঁছান পেনাং উপকূলে। পেনাং তখন জাপানীদের দখলে। পেনাং থেকে নেতাজী বিমানে টোকিও পৌঁছান এই বছরের মে মাস নাগাদ।

সাবমেরিনে এই দুর্গম যাত্রার অবিশ্বাস্য কাহিনী এখনও এক রূপকথার সামিল। নেতাজীর ব্যক্তিগত ভাষায় তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা এখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত। কিন্তু তাঁর সহকর্মী সঙ্গী সাবমেরিন যাত্রী আবিদ হাসান এই অভিযানের কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ করেছেন। আবিদ হাসানের ভাষায় বাস্তব অভিযানের বর্ণণা অত্যন্ত রোমাঞ্চকর: "নেতাজী ডিকটেশান দিচ্ছেন। আমি নোট নিচ্ছি। আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর নারী বাহিনীর পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করছেন সেদিন।

এমন সময় সাবমেরিনের চোখে ধরা পড়ল মহাসমুদ্রের বুকে শত্রু-পক্ষের মালবাহী জাহাজ। একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। ঠিক যে মুহূর্তে সাবমেরিন থেকে টর্পেডো রিলিজ করা হচ্ছে, কণ্ট্রোলে যে ছিল, তার সামান্য ভুলের ফলে সাবমেরিন জলের উপর ভেসে উঠল এবং শত্রুপক্ষের নজরে পড়ে গেল।

কয়েক মুহূর্তের এক চরম বিশৃঙ্খলা। সাবমেরিন আবার জলের তলায় ড্রাইভ করেছে। ফাইটার জাহাজটি তীব্র বেগে ছুটে এসে সাবমেরিনের উপরকার রেলিং-এ মারলে এক ধাক্কা। সবশুদ্ধ কাত হয়ে একদিকে টলে পড়ল সাবমেরিন। আমি তো আর নিজের মুখের চেহারা দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু অপর সকলের চোখে প্রত্যক্ষ করছি মৃত্যুভীতি। এমন সময় নেতাজীর শান্ত কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এলো—হাসান, আমি একটা পয়েণ্ট দু'বার বললাম, তুমি কিছুই নোট করছ না।

বুক ঢিবঢিব করছে, হাতের আঙ্গুল কাঁপছে ঠক্‌ঠক্‌ করে। বললাম, স্যরি স্যার।..."

নেতাজীর টোকিও তথা জাপান উপস্থিতির খবর প্রথম দিকে কৌশলগত কারণে গোপন রাখা হয়। সম্ভবত ১৯৪৩ সালের ২০ জুন টোকিও রেডিও সর্বপ্রথম এই খবর প্রচার করে। পরদিন ২১ জুন নেতাজী টোকিও থেকে সর্বপ্রথম বেতার ভাষণ দেন। ঐ বক্তৃতা সরাসরি পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনা শিবিরে প্রচারের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। ঐতিহাসিক এই বেতার ভাষণে নেতাজী বলেন : বৃটিশরা ভারতবর্ষে আসার পর কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি যে পূর্ব সীমান্ত দিয়ে তাঁদের কোন শত্রু ভারতে প্রবেশ করতে পারে! উত্তর পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা নিয়েই তারা মাথা ঘামিয়েছে। সিঙ্গাপুরে দুর্জ্জয় নৌঘাঁটি নির্মাণ করে তারা নিরাপত্তার স্বপ্ন দেখেছিল। জাপানী জেনারেল ইয়া মাশিটার প্রচণ্ড অভিযান তাদের সে স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করেছে। বৃটিশের রণ চাতুর্যের অভাব তাকে বিশ্ববাসীর চোখে হেয় করেছে। জেনারেল ওয়াভোল এখন ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্ত রক্ষায় মনোনিবেশ করেছেন।

টিউনিস, টিমবাকটু, ল্যাম্পিডুসা বা অ্যালাসকায় কি ব্যাপার চলছে, তা দিয়ে ভারতবাসীর বেশী মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন তাদের ভারতবর্ষের অভ্যন্তর এবং সীমান্তের বাইরের কথা নিয়ে ভাবা। খুব আড়ম্বর করে ব্রহ্মদেশ পুনরাধিকার করতে গিয়ে বৃটিশ যেভাবে বিতাড়িত হয়েছে, সেটা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। সিঙ্গাপুরের পতন ঘটেছে, ব্রহ্মদেশও হারিয়েছে তারা, বৃটিশের সামরিক ইতিহাস এই লজ্জার কাহিনীতে চিরকলঙ্কিত হয়ে থাকবে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদ বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি।...

জগতে কত মানুষ জন্মাবে, মরবে। কত সাম্রাজ্য গড়বে, ভাঙবে। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ অবিধ্বংসী, অবিনশ্বর—এই তাদের ধারণা। আপনারা একে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব বলতে পারেন। বলতে পারেন নিছক পাগলামি কিন্তু আমি বলি, ওদের এই

পাগলামিরও কারণ আছে। ভারতবর্ষই বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি। বৃটিশরা মনে করে ভারতবর্ষের সবকিছু শোষণই ওদের কাজ। ওদের সাম্রাজ্য মানেই ভারতবর্ষ। সেই মাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ওরা প্রানপণে লড়ছে। এই জন্যই আমি বলছি, বৃটিশরা যে তাদের সাম্রাজ্য অবিধ্বংসী মনে করে, এ তাদের পাগলামি নয় বরং পাগলামি হবে আমাদের, যদি আমরা ভাবি ওরা স্বেচ্ছায় এই সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে। ভারতীয় কেউ যেন কোনদিন স্বপ্নেও না ভাবেন যে বৃটিশরা একদিন এদেশকে স্বাধীনতা দিয়ে দেবে। আমার এ কথার অর্থ এই নয় যে, বৃটিশ রাজনীতিকেরা কোনদিন ভারত-বর্ষের সঙ্গে আপোশ করবে না। আমার তো মনে হয়েছিল এরকম একটা চেষ্টা ওরা এবছরই একবার করবেন। আমি আমার দেশ বাসীকে শুধু এই কথাই বলতে চাই যে এসব আপোষের অর্থ শুধু ভারতবাসীকে ভাঁওতা দেওয়া—স্বাধীনতা দেওয়া নয়।··· সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে মন্দীভূত করার এটা একটা অপকৌশল মাত্র। ১৯৪১ এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪২ এর এপ্রিল পর্যন্ত ওরা যে ব্যাপার করলে, তাতেই আমার বক্তব্যের সমর্থন মেলে। অতএব বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোন আপস রফার কথা আমাদের ভুলে যেতে হবে। আমাদের স্বাধীনতার আপসের কোন স্থান নেই। বৃটিশ তার মিত্রশক্তির দলবল নিয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে গেলে তবেই আমাদের স্বাধীনতার আলো ফুটে উঠবে। এই স্বাধীনতা যাঁরা চান, প্রানপণ তাঁদের এর জন্য লড়তে হবে। আমাদের এ লড়াই হবে বাঁচার লড়াই, স্বাধীনতার লড়াই। বন্ধুগণ, আসুন, আমরা ভারতবর্ষের ভেতরে ও বাইরে সর্বত্র আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে এই স্বাধীনতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। যতদিন না বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হয়। এবং সেই ধ্বংসস্তূপের উপর স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠিত হয়, ততদিন আমরা অদম্য উৎসাহ আর অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে বৃটিশবিরোধী যুদ্ধ চালিয়ে যাই। এই সংগ্রামে

পিছিয়ে যাওয়া চলবেনা—কেবল যুদ্ধ আর এগিয়ে যাওয়া। সম্পূর্ণ বিজয় লাভ না করা পর্যন্ত, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত এই যুদ্ধের বিরাম নেই।

তরুণ নেতা সুভাষচন্দ্র যখন জার্মানীতে, প্রবীন বিপ্লবী রাসবিহারী তখন জাপানে। তরুণ-প্রবীন দুই নেতাই স্বদেশভূমি ছেড়ে বাইরে গিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানের কথা ভাবছিলেন। রাসবিহারী বসু ১৯১১ সালে যখন পরাধীন ভারতবর্ষের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ সাহেবের উপর বোমা নিক্ষেপ করে ইংরেজদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করেন, সুভাষচন্দ্রের বয়স তখন অনেক কম। রাসবিহারী ছিলেন তখন সুভাষের স্বপ্ন। অবাক বিস্ময়ে সুভাষচন্দ্র রাসবিহারীর স্বদেশ ত্যাগের অভিনব কাহিনী শুনতেন. আর গভীর শ্রদ্ধায় তাঁর মনপ্রাণ ভরে উঠত। ভাবতেন, তিনিও একদিন বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামবেন। প্রয়োজনে পরাধীন দেশের বাইরে গিয়ে সেখান থেকে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য লড়াইয়ে নামবেন।

সুভাষচন্দ্র এবং রাসবিহারীর কর্মতৎপরতা ও চিন্তাধারার মধ্যে প্রথম থেকেই আশ্চর্যজনক একটা মিল ছিল। দেশত্যাগ করার পথে আফগানিস্তান সীমান্ত প্রদেশে গিয়ে নিঃসঙ্গ সুভাষচন্দ্র সংগোপনে সেখানকার জার্মান কনসালের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। সেখানে বসল কয়েক দফা গোপন বৈঠক। বিশ্বপরিস্থির সুযোগে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ যে অসম্ভব নয়, সুভাষচন্দ্র তা বুঝতে পারলেন। অবশেষে বিদেশী জার্মান সরকারের সক্রিয় সহোযোগিতা ও আশ্বাসের প্রতিশ্রুতি পেয়ে তিনি বৃটিশ প্রশাসনের চোখে ধুলি দিয়ে সুদূর জার্মান পাড়ি দিলেন। সেখানে হিটলারের সঙ্গে ঘটল তাঁর সাক্ষাৎকার !

সেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার কথা। সারাবিশ্বে হিটলার তখন

অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক। অপ্রতিহত তাঁর দুর্বার গতি। সুভাষচন্দ্র বিশ্বরাজনীতির জটিল আবর্ত বিশ্লেষণ করে বুঝলেন, পরাধীন ভারতবর্ষকে বৃটিশের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার সুবর্ণ সুযোগ তাঁর সামনে। তিনি হিটলারের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করার সময় তাঁর মনোভাব প্রকাশ করলেন। ভারতবর্ষ এবং মিত্র দেশগুলির সম্ভাব্য রণকৌশল ও পরিণতি প্রসঙ্গে তাঁর ভাব-ভাবনার কথা সুভাষচন্দ্র হিটলারকে খুলে বললেন। বিশ্বের দুই সমরনায়ক সুভাষচন্দ্র আর হিটলার মুখোমুখি বসে। সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব করলেন, যেসব দেশ জার্মান অধিকার করেছে এবং করবে, সেসব দেশের প্রবাসী ভারতীয়দের ও ধৃত বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের নিয়ে তিনি একটি সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে চান। আর চান, প্রস্তাবিত ঐ বাহিনী গড়ে তুলতে জার্মান এবং তার মিত্র দেশগুলির সক্রিয় সহায়তা। তিনি যে বাহিনী গড়ে তুলবেন, তা হবে সম্পূর্ণ ভারতীয়দের নিয়ে এবং ভারতীয়দেরই নেতৃত্বে। ঐ বাহিনীর প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করে স্বদেশভূমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করা।

সুভাষচন্দ্র তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে দুই দেশের স্বার্থ এবং সমঝোতার কথা খোলাখুলিভাবে তুলে ধরলেন। অকাট্য যুক্তি দিয়ে হিটলারকে একথাও জানালেন যে, তাঁর পরিকল্পনায় আন্তরিক সহায়তা করলে রণকৌশলের দিক থেকে ভারতবর্ষের মত জার্মানীও প্রস্তাবিত সমঝোতা ও সহায়তায় বিশেষ লাভবান হবে।

বিশ্বপরিস্থির পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রের বিশ্লেষণ, পরামর্শ ও দূরদৃষ্টি দেখে হিটলার তাঁকে এক মহান নেতারূপে সম্মান জানালেন। হিটলারের নিঃশর্ত এবং সার্বিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি আদায় করে সুভাষচন্দ্র তাঁর স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করার প্রথম পদক্ষেপেই সাফল্য অর্জন করলেন। স্বদেশত্যাগী নিঃসঙ্গ ভারতের নেতা সুভাষচন্দ্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজের স্থান তৈরী করে নিলেন।

ইতিহাসের গতিপথের মোড় পরিবর্তন করে সুভাষচন্দ্র আবির্ভূত হলেন নতুনরূপে নতুন নেতৃত্ব নিয়ে। পরাধীন ভারতের স্বদেশী-করা খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী আর গান্ধী টুপি পরা দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র যুদ্ধমত্ত জার্মানীর অপরিচিত জায়গায় বসে বীর সমর নায়ক নেতাজীরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন।

১৯৪২ সালে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যখন ঐতিহাসিক আগস্ট আন্দোলনের প্রস্তুতি, তারও আগে অর্থাৎ বিয়াল্লিশ সালের গোড়ায় তিনি জার্মানীতে বসে গড়ে তুললেন আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম সেনাদল। ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনের সর্বপ্রথম সামরিক বাহিনী। তাঁর সেই সেনা বাহিনী গঠন আর হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, সমঝোতার সংবাদ কয়েক দিনের মধ্যে আগুনের ফুলকি হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। ভারতবর্ষ, তথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় 'নেতাজী' তখন একটি সংগ্রামী নাম আর প্রেরণা ও মুক্তির উৎস।
সাম্রাজ্যবাদ বৃটিশ বাহিনী নেতাজীর এই অভ্যুদয়ে বিচলিত ও শঙ্কিত হল। দিনের পর দিন জার্মান বেতার থেকে নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রের ভাষণ প্রচারিত হতে লাগল। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়রা নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হল। ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জড়িয়ে দিয়ে নেতাজী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে স্বাধীন ভারত গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।
জার্মান সরকারের সহায়তা নিয়ে নেতাজী যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ার কাজে সক্রিয়, জাপানেও চলছিল তখন ভারতবর্ষের মুক্তি যুদ্ধের আরেক প্রস্তুতি। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ১৯১১ সাল থেকেই ভারতবর্ষ ত্যাগ করে জাপানে বসবাস করছিলেন। জাপানী নেতা তোয়ামার সহায়তায় ভারতীয় এই বিপ্লবীও জাপানের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে অনেক আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন। একজন ভারতীয় বিপ্লবীরূপে জাপানের নেতৃবৃন্দ উপযুক্ত মর্যাদা দিতেন। রাসবিহারীর

সঙ্গে জাপানের নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা সেখানকার সাধারণ মানুষেরও অজানা ছিল না।

বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে রাসবিহারী তাঁর সুপ্ত বাসনা বাস্তবে রূপ দিতে অগ্রণী হলেন। জাপ সেনাদলের অধ্যক্ষ ফিল্ড মার্শাল শ্রীসুগিয়ামার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করলেন। তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথা বুঝিয়ে ফিল্ড মার্শাল শ্রীসুগিয়ামাকে বললেন, বৃটিশের সঙ্গে জাপানের যে যুদ্ধ চলছে, ভারতীয়রা তাতে জাপানের পক্ষ সমর্থন করতে চায়। জাপানীদের মত ভারতীয়দেরও শত্রুপক্ষ বৃটিশ। ভারতবাসীর উদ্দেশ্য মাতৃভূমি পরাধীন ভারতবর্ষকে বৃটিশের হাত থেকে মুক্ত করা। বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে ভারতীয়দের যেকোনও সশস্ত্র অভিযান প্রকারান্তে জাপানী সেনাদের অগ্রগতির সহায় হবে এবং রণকৌশলের দিক থেকে তা' হবে অপরিহার্য।

জাঁদরেল যোদ্ধা শ্রীসুগিয়ামা রাসবিহারীর মনোভাব বুঝলেন এবং ভারতীয়দের নৈতিক সমর্থনের গুরুত্বও অনুধাবন করলেন। রাস-বিহারী প্রস্তাব করলেন, জাপ-অধিকৃত অঞ্চলে যেন তাঁরা নিজেদের স্বার্থে ভারতীয়দের শত্রুপক্ষ মনে না করেন এবং এই মর্মে জাপ সেনাদের কাছে যেন নির্দেশবার্তা পাঠানো হয়।

ফিল্ড মার্শাল শ্রীসুগিয়ামা সব বুঝেও অত বড় ঝুঁকি নিতে সাহস করলেন না। তিনি বললেন, ভারতীয়রা জাপানের সমর্থক হতে পারে। কিন্তু যেহেতু তারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং জাপান বৃটিশের সঙ্গে যুদ্ধ লিপ্ত সেইহেতু কৌশলগত দিক থেকে বৃটিশ প্রজা ভারতীয়দের শত্রুপ্রজা বলে গণ্য করা ছাড়া তাদের উপায় নেই। কাজ অনেক দূর এগিয়ে এলেও শেষপর্যন্ত তা সফল হল না। মাঝপথে তা আটকে গেল। রাসবিহারী পড়লেন মহা সমস্যায়। পূর্ব-এশিয়ায় বৃটিশ বিরোধী সেনা বাহিনী গড়ার কাজে বাধা পড়ল। কিন্তু বিপ্লবী রাসবিহারী বাধার বিন্ধ্যাচল ভাঙতে কখনও দ্বিধা করেননি। বিপ্লবী জানতেন, অসম্ভব কথাটা রাজনীতি

আর কূটনীতির অভিধানে অপাংক্তেও। অবশেষে জাপানের সমর বিভাগের উপমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে রাসবিহারী তাঁর পরিকল্পনার কথা তাঁকে বুঝিয়ে বললেন। পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়রা সংঘবদ্ধ হয়ে পূর্ব দিক থেকে বৃটিশ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে যুদ্ধ পরিচালনায় যে জাপ-বাহিনীরই সুবিধা হবে সমরমন্ত্রী তা স্বীকার করলেন এবং রাসবিহারীর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

রাসবিহারী আর কালক্ষেপ করলেন না। তিনি এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে জাপানে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ গড়ে উঠল। তার মূল কাজ হল সুদূর প্রাচ্যের ভারতীয়দের সংঘবদ্ধ করা।

এদিকে রাসবিহারী বসু যখন জাপানে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ প্রতিষ্ঠা করে প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে আজাদী বাহিনী গড়ে তুলতে সক্রিয়, জার্মানে সুভাষচন্দ্র ততদিনে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম সেনা বাহিনী সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিস্তার সারা বিশ্বে দারুণ উত্তেজনা ছড়াল। গ্রেট বৃটেন আর জাপানের মধ্যে শুরু হল তীব্র লড়াই। সুভাষচন্দ্র তাঁর রণ-কৌশল আরও বিস্তৃত করলেন। বার্লিনস্থ জাপানী রাজদূতের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করলেন। তিনি রাজদূতের মাধ্যমে টোকিওর জাপ-সরকারের কাছে তাঁর ব্যাপক পরিকল্পনার কথা জানিয়ে অনুরোধ জানালেন, সুদূর প্রাচ্যে তাঁরা যেন আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলতে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেন। জাপ-কর্তৃপক্ষের কাছে তার গোপন অনুরোধ : ওখানকার আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়তে হবে জাপান অধিকৃত দেশের ভারতীয় বাসিন্দা এবং জাপানীদের হাতে ধৃত বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে।

জাপান সরকার সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগ, জার্মানীতে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন, তাঁর স্বদেশপ্রেম এবং বৃটিশদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের বিস্তৃত খবর আগে থেকেই জানতেন। তাই রাজদূতের

মাধ্যমে পাওয়া সুভাষচন্দ্রের অনুরোধ-বার্তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে জাপ-সরকার বিবেচনা করলেন এবং ঐ প্রস্তাবে জাপ-সরকার সম্মতও হলেন। জাপান সরকারের এই সম্মতির সংবাদ আচমকা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। জাপ সেনা শিবিরে নতুন তৎপরতা দেখা দিল। পূর্ব-এশিয়ার জাপ-অধিকৃত ভারতীয়দের মনে নতুন করে স্বাধীনতার চেতনাবোধ জেগে উঠল। বৃটিশ বাহিনীর যেসব সেনা জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে যুদ্ধবন্দী হয়েছিল, তাদের মধ্যে প্রচুর ভারতীয় সেনাও ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগ ও অভিনব সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার কথা ঐসব বন্দী ভারতীয় সেনারা বহুদিন ধরেই শুনে আসছিলেন। তাই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জাপ-সরকারের সমঝোতার খবর প্রচারিত হওয়ার পর ভারতীয় যুদ্ধবন্দীরাও আনন্দিত হলেন। যুদ্ধবিদ্যায় রপ্ত ভারতীয় সেনারা মাতৃভূমি ভারত-বর্ষের মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নে অধীর হয়ে উঠলেন। বৃটিশ বাহিনীর কর্তা ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত জীবন, ভারতীয়দের প্রতি তাদের তাচ্ছিল্য এবং নির্দয় ব্যবহারে ভারতীয় সেনারা আগে থেকেই বিদেশী শাসকদের উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের অভ্যুদয় আর আহ্বানে এবার তাদের সেই চাপা ক্ষোভ বিক্ষোভের আগুন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে পরাধীন মাতৃভূমির সংগ্রামের সামিল হতে তারা তখন সোচ্চার।

জাপ-সুভাষ সহযোগিতা ও সখ্যতার খবর শুধু ভারতীয় মহলেই নয়, জাপ বাহিনীর মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি করল। জাপানী সেনারা যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা অধিকৃত দেশের নাগরিকদের ওপর নানারকম অত্যাচার করত। তারা এতই বৃটিশ বিরোধী ছিল যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যাধীন কোনও দেশ জয় করার পর তারা নির্বিচারে সেখানকার বৃটিশ প্রজাদের উপর নানারকম নির্যাতন চালাত। ক্রমে তারা জানতে পারল, অধিকৃত দেশের ভারতীয়রা এবং ভারতীয় সেনারাও সুভাষচন্দ্রের সমর্থক। তারা পরাধীনতার জ্বালায় জ্বলছে এবং

প্রবাসী ভারতীয়দেরও শত্রু বৃটিশ। জাপ-সেনারা তাই ভারতীয়দের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ শুরু করল। তারা জানত, ভারতবর্ষের নেতা সুভাষচন্দ্র এবং সুভাষচন্দ্রের নেতা মহাত্মা গান্ধী।

জাপ-সেনারা তাদের নেতাদের মত সুভাসচন্দ্র সহ ভারতীয় জনগণ এবং নেতাদের কতটা সম্মান করত, সে সমন্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম যোদ্ধা এবং নেতাজীর সহযোগী মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খানের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। এ বিষয় ব্যক্তিগত এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: জাপানীরা পৈশাচিক ব্যবহার করলেও কোনও দিন ভারতীয় নারীর সম্ভ্রমহানি করেনি। অনেক ইউরোপীয়ান ও চীনের মেয়ে তাই শাড়ী বা দোপাট্টা পরে নিজেদের ভারতীয় বলে চালিয়ে জাপানী সেনাদের লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। খুব সম্ভব ভারতীয় নারীদের লাঞ্ছিত না করার জন্য উপরওয়ালাদের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছিল। জাপানী সৈন্যদের অনেক দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সেনা হিসাবে তারা ছিল খুব ভাল শৃঙ্খলাপরায়ণ। উপরওয়ালাদের নির্দেশ তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। প্রায়ই দেখা যেত, জাপানী সৈন্যরা ভারতীয়দের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার চেষ্টা করছে। যদিও তারা নিজেদের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জানত না, তবুও ভারতীয়দের দেখলেই মৃদু হেসে অদ্ভুত উচ্চারণ ভঙ্গীতে প্রশ্ন করত: গান্ধী কা? অর্থাৎ তুমি বা তোমরা মহাত্মা গান্ধীর লোক?

উত্তরে মাথা নেড়ে তারা সমর্থন জানালে, জাপ-সেনারা খুব খুশী হত। তারপর ভারতীয়দের সঙ্গে করমর্দন করে তাদের কুশল সংবাদ নিয়ে করজোরে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িককালে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। তাদের মধ্যে যেমন বড় বড় ব্যবসায়ী ছিলেন, ছিলেন প্রভাব প্রতিপত্তিশালী বহু

ব্যক্তি এবং পরিবার। তাদের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের কাজে দারুণভাবে সহায় হয়েছিল। ১৯৩৯ সালের যে সরকারী হিসাব, তা' থেকে জানা যায়, এক জাপানেই তখন ৮৭৪ জন ভারতীয় বসবাস করত। এদের মধ্যে ব্যবসায়ী ছাড়াও ছিলেন বহু ছাত্রছাত্রী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থাইল্যাণ্ডের (শ্যাম দেশ) গুরুত্ব নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। যুদ্ধ ঘোষণার ঠিক আগে থাইল্যাণ্ডের যে জনগণনা হয়, তাতে প্রকাশ তখন সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চান্ন হাজার। তার অধিকাংশই পাকাপাকিভাবে বসবাস করার জন্য বহু আগে থেকে থাইল্যাণ্ডে চলে যায়। এবং বংশপরম্পরায় সেখানে বাস করতে থাকে। থাইল্যাণ্ডে থাকলেও তাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের মানসিক যোগাযোগ খুব গভীর ছিল। শিক্ষা সংস্কৃতি এবং ধর্মই ছিল এই যোগসূত্রের অন্যতম সূত্র।

থাইল্যাণ্ডে বসবাসকারী ভারতীয় ছাড়া সেখানকার সাধারণ মানুষও ভারতবর্ষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিল। ভারতীয় কৃষ্টি সভ্যতায় মুগ্ধ ছিলেন থাইল্যাণ্ডের তদানীন্তন রাজপরিবার। ভারতবর্ষের কবি রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বকবির আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাতে এশিয়াবাসী হিসাবে থাইল্যাণ্ডের শিক্ষিত মানুষও গর্ববোধ করতেন। তাই ভারতবর্ষের সুখ দুঃখের শরিক হতে মানসিক দিক থেকে থাইবাসীরা কখনও পেছিয়ে থাকত না।

তার পেছনে অবশ্য একটা ঐতিহাসিক কারণ ছিল। সেটা ১৯৩২ সাল। থাইল্যাণ্ডের রাজপরিবারের পক্ষ থেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্র-নাথের কাছে এক আর্জি এল। কবিগুরুর কাছে তাঁরা আবেদন করলেন, তিনি যেন বেসরকারী ভাবে হলেও একজন দূত তাঁর দেশে পাঠান, যিনি হবেন ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি আর দর্শনের একজন অন্যতম প্রবক্তা। থাই-রাজপরিবারের এই আন্তরিক আবেদনে সারা দেশে পড়ল সাড়া। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ হলেন মুগ্ধ। তিনিও

ঐতিহাসিক ঐ আবেদনের উপযুক্ত সাড়া দিতে আর কালবিলম্ব করলেন না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি অধ্যাপক পণ্ডিত প্রফুল্লকুমার সেনের খ্যাতি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দি পেরিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে। তিনি দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গেও ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। মনে প্রাণে তিনি রবীন্দ্রনাথেরও একজন ভাবশিষ্য ছিলেন। এছাড়া মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে তিনি নিজের জীবন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। রবীন্দ্র-গান্ধীর অনুগামী প্রফুল্লকুমারকে রবীন্দ্রনাথ যেমন ভালবাসতেন, তেমনি তাঁর সাহিত্য-অনুরাগ এবং গভীর স্বদেশপ্রীতির জন্য তাঁকে শ্রদ্ধাও করতেন। তাই শেষপর্যন্ত কবিগুরু প্রফুল্লকুমারকে থাই-ল্যাণ্ডে সাংস্কৃতিক দূত নির্বাচিত করে পাঠালেন। কবিগুরুর এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে পরবর্তী সময়ে থাই-ভারতের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য মৈত্রী গড়ে উঠল। ভারতবর্ষের প্রতি থাইবাসীদের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। দুই দেশের নিবিড়তা আরও ঘনিষ্ঠ হল।

থাইল্যাণ্ডে গিয়ে প্রফুল্লকুমার প্রথমে স্বামী সত্যানন্দ পুরী নাম গ্রহণ করলেন। রাজপরিবারের শ্রদ্ধেয় অতিথি স্বামী সত্যানন্দের জনপ্রিয়তা অচিরেই দারুণভাবে বেড়ে গেল। তারপর তিনি একটি স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদও অলঙ্কৃত করলেন। তাঁর সাহিত্যবোধ এবং রাজনৈতিক চেতনা, ক্রমে থাইবাসীর সঙ্গে ভারতীয়দের যোগ-সূত্রের অন্যতম বাহক হল। স্বামী সত্যানন্দ থাই ভাষায় ভারত-বর্ষের মহান নেতা মহাত্মা গান্ধীর জীবনবেদন রচনায় ব্রতী হলেন। তাতে তিনি গান্ধীজীর ভাব ভাবনা ও মানব প্রেমের কাহিনী সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করলেন। এছাড়াও ভারতীয় সাহিত্য-দর্শণ ও সংস্কৃতি এবং থাইল্যাণ্ডের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর একের পর এক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা শুরু করলেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রেও তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন।

স্বামী সত্যানন্দের বিপুল জনপ্রিয়তা যখন চরমে, তখন তিনি থাই-ভারত মৈত্রী সমিতি নামক একটি সংস্থা স্থাপন করতে উদ্যোগী হন। থাইবাসী তাতে আন্তরিক সাড়া দিল। ভারতবর্ষ এবং থাই-ল্যাণ্ডের মৈত্রী আরও দৃঢ় হল। কবিগুরু প্রেরিত বেসরকারী রাষ্ট্রদূত স্বামী সত্যানন্দ পুরী এই শতকের ত্রিশের দশকে ভারত থাইল্যাণ্ড মৈত্রীর যে অসামান্য সেতু গড়ে তুলেছিলেন, সেই সেতুপথ ধরেই পরবর্তীকালে নেতাজীর নেতৃত্ব আজাদ হিন্দ ফৌজ পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের অভিযান শুরু করেছিলেন।

ত্রিশের দশকের থাইল্যাণ্ডে জ্ঞিয়াজ্ঞী প্রীতম সিং-এর উপস্থিতিও আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পাঞ্জাবের এই শিখ ধর্মযাযক ১৯৩৩ সালে থাইল্যাণ্ড যান। তিনি ধর্ম-প্রচারক রূপে পরিচিত হলেও স্বদেশপ্রীতির জন্য পাঞ্জাবে খ্যাত ছিলেন। তিনি মূলতঃ বৃটিশ বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন। পরাধীন ভারতবর্ষে বৃটিশের শোষণ শাসন তাঁর কাছে অসহনীয় ছিল। তাই একসময় তিনি স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করে থাইল্যাণ্ডের নাগরিক হতে বাধ্য হন।

কয়েক বছর পরের ঘটনা। বাবা অমর সিং নামক এক বিপ্লবী আচমকা থাইল্যাণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হন এবং প্রীতম সিং-এর দলে যোগ দেন। বাবা অমর সিং-এর বৃটিশ বিরোধী কার্যকলাপ বিশ দশকের গোড়ায় পাঞ্জাবের বৃটিশ প্রশাসনকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাজদ্রোহের অভিযোগে ইংরাজরা তাঁকে বন্দী করে আন্দামানের নির্জন দ্বীপে পাঠায়। সেখানে একাধিক্রমে এই বিপ্লবী বীর প্রায় বাইশ বছর নিঃসঙ্গ বন্দীজীবন কাটান। জ্ঞিয়াজ্ঞী প্রীতম সিং বাবা অমর সিং-এর বিপ্লবী জীবনের বিস্তৃত খবরাখবর রাখতেন এবং তাঁকে দেশপ্রেমী বিপ্লবীরূপে শ্রদ্ধা করতেন। এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে প্রবীন বিপ্লবীকে সহযোগী রূপে পেয়ে জ্ঞিয়াজ্ঞী প্রীতম সিং নতুনভাবে উৎসাহবোধ করলেন। দুই

শিখ নেতা নিভৃত আলাপ আলোচনার পর থাইল্যাণ্ডে একটি গোপন বিপ্লবী সংস্থা গড়ে তুললেন। তার নাম হল ভারতীয় মুক্তি সংঘ— পরাধীন ভারতবর্ষকে বিদেশী শক্তির কবল থেকে মুক্ত করার জন্য সশস্ত্র অভিযানের পথ তৈরী করাই হল ঐ সংঘের মূল উদ্দেশ্য। পাঞ্জাবের বিপ্লবী সংস্থা গদর দল ছিল একসময় বৃটিশদের চোখের কাঁটা। গদর দলের গোপন বিপ্লবী তৎপরতায় সদা সন্ত্রস্ত থাকত ইংরাজ সরকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িককালে এই গদর দল জার্মান থেকে গোপন পথে প্রায় এক লক্ষ রাইফেল সংগ্রহ করে। তার পরিকল্পনা ছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজ যখন জড়িয়ে পড়বে, তখন ভারতবর্ষের ভেতর থেকে ঐ দল শুরু করবে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র অভিযান। ঐ সময় বাবা অমর সিং গ্রেপ্তার হন।

সুদীর্ঘ বাইশ বছর নিঃসঙ্গ কারাবাসের পর মুক্তি পেয়ে তিনি গদর সঙ্গে যুক্ত হন এই গদর দলের সঙ্গে পরবর্তীকালে থাইল্যাণ্ডের ভারতীয় মুক্তি সংঘের যোগসূত্র ঘটে এবং সেই সুবাদে থাইল্যাণ্ডে মুক্তি সংঘের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন। ঘটনার পর ঘটনা। থাইল্যাণ্ড ক্রমে একটি ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধের পীঠস্থান হয়ে উঠল। স্বামী সত্যানন্দ পুরী, জিয়াজী প্রীতম সিং, অমর সিং-রা যখন সমাজসেবা আর মুক্তিমন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে থাইল্যাণ্ডে দারুণ কর্মতৎপর, ১৯৩৯ সালের সেই দিনগুলিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন ইউরোপ ছেড়ে এশিয়ার আকাশ গ্রাস করতে উদ্যত। যুদ্ধের প্রসার ব্যাপকতর হয়ে যখন এশিয়ার মানুষের কাছে মৃত্যুর হাতছানি নিয়ে এল, তখন এশিয়ার বৃটিশ বিদ্বেষ আরও তীব্রতর হল। বৃটিশ-বিরোধী মনোভাবে এশিয়াবাসী মানসিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ হল। ইউরোপের যুদ্ধকে এশিয়ায় বিস্তৃত করার পেছনে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির যে বদ মতলব আছে, সে বিষয় আর কারো সন্দেহ রইল না। তাই বৃটিশ বিরোধী ধিক্কারে এশিয়া তখন মুখর। এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়রা। এবার তাদের ঐক্য আরও দৃঢ় হল।

১৯৪০ সালের ডিসেম্বর। হং কং-এর একটি খবর বৃটিশ সরকারকে বিচলিত করে তুলল। হং কং-এর ইংরাজ কারাগারে বন্দী ছিলেন কিছু ভারতীয় বিপ্লবী। সেখানে অবিশ্বাস্য ভাবে তিন ভারতীয় বিপ্লবী বৃটিশ সেনাদের চোখে ধুলো দিয়ে উধাও হলেন। জেল-ছাড়া তিন বিপ্লবী গোপনে জাপানী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করলেন। জাপান তখন বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধের জন্য এশিয়াবাসীর মধ্যে ঐক্য স্থাপনে প্রয়াসী। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতিও তাঁরা তখন সহানুভূতিশীল।

জাপানী দূতাবাসের সহায়তায় হং কং ত্যাগী তিন বিপ্লবী থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে তাঁরা বীরের সম্মান পেলেন।

প্রবাসী ভারতীয়রা যেখানে জড়ো হলেন, সেখানে থাইল্যাণ্ডবাসীরাও ভারতীয়দের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির দাবীতে সোচ্চার হলেন। ঐতিহাসিক সম্বর্ধনার উত্তরে সদ্য আগত তিন বিপ্লবী প্রীতম সিং প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় মুক্তি সংঘে যোগদানের সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন।

প্রীতম সিং-এর দল ইতিমধ্যে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধের আগুন ক্রমে ইউরোপ ছেড়ে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আকাশ স্পর্শ করল। বৃটিশ বিরোধী শক্তি জাপান ততদিনে ব্যাপক রণকৌশল নিয়ে তৈরী। প্রীতম সিং বুঝলেন, পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের লগ্ন প্রায় সমাগত। তিনি দক্ষিণ থাইল্যাণ্ডে একটি সমিতি পরিচালনা শুরু করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য বৃটিশ বিরোধী প্রচার।

থাইল্যাণ্ড মালয় সীমান্তে বিরাট এবং ব্যাপক বৃটিশ বাহিনীর উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে প্রীতম সিং তাঁর গুপ্ত সমিতির কৌশল পাল্টালেন। তিনি জানতেন, বৃটিশ বাহিনীর অধিকাংশ সেনাই ছিল পরাধীন ভারতের সাধারণ মানুষ। অর্থাভাবে তারা বিদেশী শক্তির

পক্ষে যুদ্ধ করতে রণাঙ্গণে উপস্থিত। প্রীতম সিং ১৯৪৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বর বর্মা এবং মালয়ের বৃটিশ বাহিনীর মধ্যে একটি গোপন প্রচারপত্র বিলির ব্যবস্থা করলেন। তাতে ভারতীয় জওয়ানদের উদ্দেশ্যে লিখলেন: দেশের মহান নেতা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা লাভের জন্য যে কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন, তার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁর নির্দেশ, আপনারা কেউ ইংরাজ সেনাপতিদের আদেশ মানবেন না। বরং জাপান জার্মান সহ যেসব দেশ বৃটিশের শত্রু তাদের বিরুদ্ধে আপনারা কখনো অস্ত্র তুলবেন না। কারণ, এইসব দেশ প্রকারান্তরে ভারতবর্ষের মিত্র। সুতরাং এই যুদ্ধে কোনক্রমেই আর ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা নয়। ইংরাজরা যদি এই বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হয়, তবে পরাধীন ভারতবর্ষকে মুক্ত করার অসামান্য সুযোগ আমাদের হাতের মুঠোয় আসবে! ব্রহ্মদেশ, মালয় তখনও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদানত। ভারতবর্ষের মত এইসব দেশের মানুষও পরাধীনতার জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছিল। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ছোট বড় প্রায় সকল দেশেই তখন বৃটিশ সাম্রাজ্য বিরোধী মনোভাব। ইংরাজদের হাত থেকে মুক্তি পেতে সকল দেশের মধ্যেই কম বেশি একটি চাপা আন্দোলন অব্যাহত। এছাড়া থাইল্যাণ্ডের প্রবাসী ভারতীয়রা স্বামী সত্যানন্দ পুরী, প্রীতম সিং প্রমুখ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও বিপ্লবীদের প্রভাবে আগে থেকেই সুসংগঠিত হয়েছিলেন। তাই প্রীতম সিং-এর নেতৃত্বে বৃটিশ বিরোধী প্রচারে বৃটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় জওয়ানদের মধ্যে দেশাত্মবোধ দেখা দিল। পরাধীন মাতৃভূমির মুক্তির স্বপ্ন ক্রমে তাদের চোখে ধরা পড়তে লাগল। থাইল্যাণ্ডের প্রায় পঞ্চান্ন হাজার প্রবাসী ভারতীয় জানতে পারল, প্রতিবেশী দেশ মালয় এবং বর্মায়ও ভারতীয়দের সংখ্যা কম পক্ষে পনের লক্ষ। ১৯৩৭ সালের সরকারী হিসাব মতে এক মালয়েই ভারতীয়দের সংখ্যা ৭৫৪,৮৪৯। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধবার সময় তার সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৮ লক্ষে দাঁড়ায়। মালয়ের খনি, রবার শিল্প ইত্যাদিতে তৎকালীন

সময়ে প্রায় পৌনে তিন লক্ষ ভারতীয় শ্রমিক কাজ করত। প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ভারতীয় বিভিন্ন বণিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। আর সরকারী পরিবহনেই কাজ করত সাড়ে পঁচিশ হাজার ভারতীয়। মালয়ের বসবাসকারী ভারতীয়ের সংখ্যা ও তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বৈঠকে খুব স্বাভাবিক কারণেই জোরদার করল।

মালয়ে রবার শিল্পের বৃটিশ মালিকদের বিরুদ্ধে স্থানীয় রবার শ্রমিক-দের দারুণ ক্ষোভ জমা ছিল। অপর দিকে মালয়ে বসবাসকারী ভারতীয়দের স্থানীয় কোনও সরকারী চাকুরীতে ঢুকবার কোনও সুযোগ না থাকায় মালয়ের বৃটিশ শ্রমিকদের বিরুদ্ধেও প্রবাসী ভারতীয়দের তীব্র ক্ষোভ ছিল। ক্রমে ক্রমে সারা মালয়ের প্রবাসী ভারতীয়রা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয় হল। তারই পরি-ণতিতে ১৯৪২ সালের গোড়ায় রবার বাগিচার ভারতীয় শ্রমিকদের সঙ্গে বাগিচার বৃটিশ মালিকদের দারুণ এক সংঘর্ষ বাঁধল। মালয়ের বৃটিশ শাসকরা ভারতীয়দের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করত। তাদের অপশাসন এবং দুর্ব্যবহারে মালয়ে ইংরাজ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করতে সবিশেষ সহায়ক হল। শ্রমিক কর্মচারী, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী ভারতীয়রা বুঝলেন, ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার এবং সম্মান রক্ষার জন্য তাদের সুসংহত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তার অভাব দূর করতে মালয়ের ভারতীয়রা মিলে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করল। শহরে শহরে তার শাখা-প্রশাখা হল। সকল ভারতীয় এক সূত্রে বাঁধা পড়ল। অন্যায় আর অবি-চারের প্রতিবাদে সভা-শোভাযাত্রাও শুরু হল। ইংরাজ বিরোধী মনোভাব তীব্র থেকে তীব্রতর হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে মালয় সীমান্তে যখন বৃটিশ শাসক বিরাট সেনাবাহিনী মোতায়নে উদ্যোগী, তখন মালয়ের ভারতীয়দের মধ্যে স্বদেশ চেতনা আরও প্রবল হল। তারা বুঝল, প্রতিবেশী থাইল্যাণ্ডের ভারতীয় বন্ধুদের

মত তাদেরও অনেক কিছু করার আছে। সুসংগঠিত ভাবে এবার মালয়ের ভারতীয়রা বৃটিশ বিরোধী প্রচারের পথ ধরল।

থাইল্যাণ্ড-মালয়ের প্রতিবেশী দেশ—বার্মা। রাজনৈতিক ভাবে বার্মা, ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেও, ১৯৩৭ সালের হিসাবে সেখানে ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল প্রায় ৮ লক্ষ। এদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক শ্রমিক ছাড়াও, ছিলেন ছোট বড়ো অসংখ্য ব্যবসায়ী। বর্মার অর্থনীতি মূলতঃ প্রবাসী ভারতীয়দের হাতের মুঠোয় ছিল। ফলে, স্থানীয় মানুষ ভারতীয়দের প্রতি ছিল অত্যন্ত বিরূপ। ১৯৩৮ সালে তার পরিণতিও দেখা দেয়। ইংরাজ সরকারের কূট চালে বিভ্রান্ত হয়ে বর্মার মানুষ সেখানকার ভারতীয়দের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে এক দাঙ্গা শুরু করল। ভয়বহ ঐ দাঙ্গার ফলে ভারতীয়রা আরও ঐক্যবদ্ধ হল। বর্মায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একটি শাখা ছিল। ছিল আরও অন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। তার মধ্যে বার্মা হিন্দু সভা, নিখিল বার্মা মুসলিম লীগ, অখিল বার্মা দক্ষিণ ভারতীয় সম্মিলন ইত্যাদি। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এইসব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল এক এবং অভিন্ন—সেখানকার ভারতীয়দের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় আন্দোলন করা।

স্থানীয় বৃটিশ প্রশাসন প্রবাসী ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বার্মার লোকেদের উত্তেজিত করে যে ভয়াবহ দাঙ্গার সৃষ্টি করেন, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে সকল শ্রেণীর ভারতীয় এবং তাদের সংস্থা সংগঠন আরও ঐক্যবদ্ধ হল। জাতীয় স্বার্থ এবং নিজেদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে দলমত ধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে আশ্রয় নিলেন। বার্মার প্রবাসী ভারতীয়েরা যেমন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিস্তৃত খবরাখবর নিয়মিত রাখতেন, তেমনি প্রতিবেশী দেশ মালয়-থাইল্যাণ্ডের প্রবাসী ভারতীয়দের রাজনৈতিক তৎপরতারও সংবাদ রাখতেন। সর্বোপরি জার্মানের বার্লিন সহরে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতি ও তাঁর পরিকল্পনার কথা এবং

জাপানে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর বৃটিশ বিরোধী তৎপরতার খবরা-খবরও বার্মা-থাইল্যাণ্ড-মালয়ের প্রবাসী ভারতীয়দের নিত্যনতুন প্রেরণা জোগাত। ব্যাঙ্কক, বার্লিন আর টোকিও বেতারের সংবাদ-ভাষ্য দিনের পর দিন বার্মার আট লক্ষ ভারতীয়দের মানসিকতায় বিরাট পরিবর্তন ঘটাতে লাগল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের কাছে তখন নেতাজীর নাম জ্বলন্ত দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক। তাঁর আহ্বান, বেতার তরঙ্গে ভেসে আসা তাঁর ভাষণ থাইল্যাণ্ড-মালয়-বার্মার ভারতীয়দের মুক্তি-পাগল করে তুলল। বিদেশ বিভুঁইয়ে বসেও তারা মাতৃভূমি ভারতবর্ষের মুক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে লাগলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্য বিরোধী মানসিকতায় সিক্ত দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়রা ততদিনে নেতাজীর আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ। নেতাজীর নেতৃত্ব আর আজাদ হিন্দ ফৌজের পবিত্র ভারত অভিযানের সামিল হতে তাদের মধ্যে নতুন উন্মাদনা—উদ্দীপনা দেখা দিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপ ক্রমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাটি স্পর্শ করল। সুদীর্ঘকাল ঐ অঞ্চল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দাপটে অস্থির ছিল। ভারতবর্ষের মত ঐসব অঞ্চলেও ছিল সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশ মহাযুদ্ধের প্রসারের সঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৃটিশ বিরোধী শক্তি-সমূহ ঐক্যবদ্ধ হল। প্রবাসী বহু ভারতীয় অনেক আগে থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে ঐ অঞ্চলে বসবাস করতেন। বৃটিশ বিরোধী কার্যকলাপে সরকারী রোষে পড়ে বহু স্বদেশী করা ভারতীয় নেতা বিভিন্ন সময়ে ঐ অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাদের গোপন তৎপরতা ছিল বৃটিশ বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলে জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শে প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্বুদ্ধ করা। তাঁরা জানতেন, মালয় সহ এশিয়ার ঐসব নানা দেশে যে বৃটিশ বাহিনী মোতায়েন ছিল, তাতে দক্ষ ভারতীয় সেনার অভাব ছিল না। চাকুরির খাতিরে তারা বৃটিশ বাহিনীতে থাকলেও, স্বদেশের স্বাধীনতার গোপন বাসনা

তাদের অন্তরেও জাগ্রত ছিল।

শুধু ভারতীয়রা কেন, এশিয়ার অপর এক বৃহৎ শক্তি জাপানও ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি। বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় জাপ-সরকার পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় গোপন সামরিক তৎপরতা শুরু করেন। জাপান সরকার বুঝতে পেরেছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক প্রসারের ফলে ঐসব অঞ্চলেও একদিন নানা সঙ্কট দেখা দিতে পারে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঐ অঞ্চলের যেকোন ঘটনার রেশ যে জাপানকেও স্পর্শ করবে, তা তাদের অজানা ছিল না। তাই প্রথম থেকেই জাপান সরকার এ বিষয় যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। গোয়েন্দা বাহিনী পাঠিয়ে গোপন তৎপরতা চালাতে এবং বৃটিশ বিরোধী শক্তিকে সচেতন করে তুলতে তারা কম উৎসাহী ছিল না। এছাড়া ঐ অঞ্চলের প্রবাসী ভারতীয়দের মনোভাব সম্পর্কেও তারা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিল। সুতরাং ভারতীয় এবং জাপানীদের সমশত্রু বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে গোপন তৎপরতার কাজে জাপানী গোয়েন্দা ও ভারতীয় বিপ্লবীরা স্বাভাবিক কারণেই প্রায় একাত্মা হয়ে উঠে ছিলেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃটিশ বিরোধী গোপন এবং বিশেষ ধরণের কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য জাপান সরকার একটি আধাসামরিক গোয়েন্দাদল পাঠালেন। তার দায়িত্ব দেওয়া হল জাপ সামরিক বিভাগের বাঁহু অফিসার মেজর ফুজিয়ারার উপর।

১৯৪১ এর ১৮ সেপটেম্বর। জাপ-কর্তৃপক্ষ এক বার্তা পাঠালেন মেজর ফুজিয়ারাকে। তাতে নির্দেশ দেওয়া হল: মিলিটারি অফিসার কর্নেল তামুরা থাইল্যাণ্ডের ব্যাঙ্ককে আছেন। তিনি সেখানে বসে ভারতীয় মুক্তি সংঘের নেতাদের সাথে যোগাযোগ রাখছেন এবং মালয় ও চীনে যেসব বৃটিশ বিরোধী সংস্থা আছে তার সঙ্গেও গোপনসূত্র রক্ষা করছেন। সেখানে গিয়ে কর্নেল তামুরার কাজে সহায়তা করতে হবে। এ অঞ্চলের কর্মসূচী এমন

ভাবে গ্রহণ এবং মজবুত করে রাখতে হবে যে, যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সর্বত্র বৃটিশ বিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে তার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ ছাড়াও একটা গুরুদায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। মালয় সহ এশিয়ার ঐ বৃটিশ অধিকৃত দেশগুলিতে যে বৃটিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে, তাতে বহু দক্ষ ভারতীয় সেনা আছে। তাদেরও যাতে সময়কালে বিচ্ছিন্ন করে বৃটিশ বিরোধী শিবিরে আনা যায়, তার জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দায়িত্ব। খুব সাবধান আর সতর্কতার সঙ্গে এই কাজগুলি সমাধা করতে হবে। হাতে সময় কম।

মেজর ফুজিয়ারা ব্যক্তিগত জীবনে একজন বিশিষ্ট সেনানায়ক ছিলেন। জাপান সরকারের পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রণকৌশল এবং বহু গোপন কর্মতৎপরতার তিনি ছিলেন নেপথ্য নায়ক। তাই সরকারী নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যাঙ্কক যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং অক্টোবর মাসে সেখানে উপস্থিত হলেন।

গোপন এবং বিশেষ ধরণের কাজের জন্য মেজর ফুজিয়ারার অধীন একটি ছোট্ট অথচ গুরুত্বপূর্ণ দল ছিল। ঐ দলে জনা পনের সদস্য ছিলেন। গোয়েন্দা কাজে বিশেষজ্ঞসহ জনাকয়েক বেসামরিক অফিসারও ঐ দলে ছিলেন।

ব্যাঙ্ককে পৌঁছে মেজর ফুজিয়ারা তাঁর পরিকল্পনা মত কাজ শুরু করলেন। তিনি থাইল্যাণ্ডের ভারতীয় নেতাদের সঙ্গেও যোগসূত্র স্থাপন করলেন। কিন্তু বুঝতে পারলেন, সেখানকার দুই ভারতীয় বিপ্লবী নেতা প্রীতম সিং স্বামী সত্যানন্দ পুরীর মধ্যে নীতিগত ও পন্থাগত দিক থেকে কিছুটা বিসাদৃশ্য আছে। মেজর ফুজিয়ারার অবশ্য ধারণা হল, প্রীতম সিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেই তাদের রণ কৌশল এবং সাংগঠনিক কাজের বেশি সুবিধা হবে। তিনি তাই তাঁর দলের গোয়েন্দা অফিসারদের প্রীতম সিং-এর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপন সংযোগ রেখে কাজ

করার নির্দেশ দিলেন। তারপর ক্রমে সিঙ্গাপুর, বোর্নিও, কুয়ালালামপুর, পেনাঙ সহ যেখানে যেখানে জাপানী মিশন অথবা বাণিজ্যদূতের অফিস ছিল, সেসব অঞ্চলে তাদের ছড়িয়ে দিলেন এমনি করে তিনি ঐ দেশগুলির নিবির প্রান্তে গোপন-গোয়েন্দা জাল সৃষ্টি করলেন। জাপ-সরকার আগে থেকেই জানতেন, উত্তর মালয়ে বিরাট এক বৃটিশ সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। তাই থাইল্যানড এবং তার আশপাশের দেশগুলিতে ঐ গোপন গোয়েন্দা জাল ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে শত্রুপক্ষের বহু গোপন তথ্য তাদের পক্ষে সংগ্রহ করা যেমন সহজ হল, তেমনি স্থানীয় ভারতীয়দের মনেও বৃটিশ বিরোধী কাজে প্রচুর সাহস ও সাড়া জাগল।

মাত্র একমাসের মধ্যে মেজর ফুজিয়ারা দক্ষতার সঙ্গে তার ওপর দেওয়া সব দায়িত্ব পালন করলেন। সর্বশেষ রিপোর্ট পেয়ে জাপ কর্তৃপক্ষও আশ্বস্ত হলেন। এতদিন তারাও এজন্যই অপেক্ষা করছিলেন। মেজর ফুজিয়ারার গোপন রিপোর্ট পাওয়ার পর জাপ-মন্ত্রিসভা তা খতিয়ে দেখতে বৈঠক ডাকলেন। ১৯৪১ সালের ৫ নভেম্বর মন্ত্রিসভা ঐ গোপন বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিলেন: দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বৃটিশ মার্কিন অধিকৃত দেশগুলির উপর তারা আক্রমণ চালাবেন। মন্ত্রিসভার ঐ বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত হল, বৃটিশ ও মার্কিন অধিকৃত দেশগুলির উপর আক্রমণের সময় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ঐসব দেশের ভারতীয় জীবন ধনসম্পত্তি রক্ষার দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। এবং সেখানকার ভারতীয়রা বৃটিশ অধিকৃত পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য যে আয়োজন ও সংগঠন গড়ে তুলছেন, নানাভাবে তাদের সেই মহান কাজের সক্রিয় সহায়তা করতে হবে। যথাসময়ে মেজর ফুজিয়ারা সহ পদস্থ অফিসারদের মন্ত্রিসভার গোপন সিদ্ধান্তের কথা জানান হল। এবং প্রয়োজনীয় পরবর্তী পর্যায়ের কর্মতৎপরতা বজায় রাখতেও নির্দেশ দেওয়া হল।

২৮ নভেম্বর। প্রীতম সিং-এর সঙ্গে মেজর ফুজিয়ারা এক বৈঠকে

বসলেন। আলোচ্য বিষয়, যুদ্ধ যদি শুরু হয়, তবে তা পরিচালনার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরী এবং তাতে ভারতীয় ও জাপানীদের সহযোগীতা ও সমঝোতার বিষয় নীতি নির্দ্ধারণ করা। গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে দফায় দফায় গোপন আলোচনা বসল। উভয়পক্ষই নিজ নিজ বক্তব্য রাখেন। প্রীতম সিং চাইলেন, যুদ্ধ শুরু হলে, ভারতীয়রা সে যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে সত্য, তবে তাদের মুল উদ্দেশ্য থাকবে পরাধীন ভারতবর্ষকে বৃটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করা। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মেজর ফুজিয়ারার সঙ্গে প্রীতম সিং-এর এক চুক্তি হল। চুক্তির মুল বিষয়বস্তুর অন্যতম ছিল :

(ক) ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধে সামিল হবে পরাধীন ভারতবর্ষের সার্বিক মুক্তিলাভের জন্য। জাপানকে তার জন্য সর্বরকম সাহায্য করতে হবে। তার বিনিময়ে জাপান ভারতের কাছে এমন কোনও দাবী রাখতে পারবে না, যার ফলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমন কি তার সার্বভৌমিকত্ব ক্ষুণ্ণ হয়।

(খ) ইংলনডের বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করলে প্রীতম সিং-এর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সেনারা জাপ সেনাদের সঙ্গে দক্ষিণ-থাইল্যানড, এবং মালয়ের দিকে এগিয়ে যাবে। সেখানে তারা বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের এবং ভারতীয় সেনাদের উদ্দেশ্যে প্রচার-অভিযান চালাবে এবং ভারতীয় ও জাপ-সেনাদের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে চলবে। মালয়ের বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের এবং মালয়ের ভারতীয়দের নিয়ে একটি স্বেচ্ছাবাহিনী গড়ে তুলবে।

(গ) জাপ-সেনারা বৃটিশ অধিকৃত দেশগুলি দখলের পর সেখানকার ভারতীয়দের শত্রুপক্ষ বলে গণ্য করবে না। তাদের স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির পূর্ণ অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। জাপানের রাজধানী টোকিও সহ অধিকৃত দেশসমূহের বেতার ঘাটিগুলি থেকে ভারতীয়

স্বাধীনতা সংঘকে তাদের বক্তব্য প্রচারের অবাধ সুযোগ দিতে হবে। এবং ঐ প্রচারের ফলে জার্মানীর বার্লিনে অবস্থানরত সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাদের সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হবে। এ ছাড়াও জাপ-অধিকৃত দেশের প্রবাসী ভারতীয়দের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহেও কোনরূপ বাধা দেওয়া চলবে না।

প্রীতম সিং এবং মেজর ফুজিয়ারার মধ্যে যেসব বিষয় আলোচনা হল তার উপর নির্ভর করে এক চুক্তিপত্র তৈরী হল। ১৯৪১ সালের ৪ ডিসেম্বর চূড়ান্ত এক বৈঠক বসল। ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের পক্ষে প্রীতম সিং এবং জাপ সরকারের পক্ষে কর্নেল তামুরা ঐ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেন। তারপর তার অনুলিপি টোকিওর জাপান সরকার এবং জাপ সামরিক বিভাগের সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

জাপ মন্ত্রিসভা আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল সাত-আট ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রে থাইল্যানড ও মালয়ে বৃটিশ বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাবে। পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশ মত জাপ বাহিনী নির্দিষ্ট দিনে থাইল্যানড এবং মালয়ের উত্তর-পূর্ব বন্দর দখল করে নিল। থাই-বাহিনী প্রথমে কিছুটা প্রতিরোধের চেষ্টা করলেও থাই-কর্তৃপক্ষ যুদ্ধ এড়াতে জাপানের কাছে নতি স্বীকার করলেন। ফলে থাইল্যানড জাপ-বাহিনীর অধীনে এল।

থাইল্যানড জাপ সরকারের দখলে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সদস্যদের তৎপরতা ও উৎসাহ দারুণ ভাবে বেড়ে গেল। ৯ ডিসেম্বর প্রীতম সিং-এর অনুগামীরা এক সভা করে নাটকীয় ভাবে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন। ঐ সভায় সর্বসম্মত এক প্রস্তাবে আরও বলা হল: মুক্তি সংঘের প্রতিনিধিরা মালয় অনুপ্রবেশ করে সেখানকার বৃটিশ বাহিনীর মধ্যে গোপন তৎপরতা শুরু করে সেনাবাহিনীর ভারতীয় সেনাদের স্বাধীনতা সংঘের পরিকল্পনার কথা প্রচারের ব্যবস্থা করুক এবং বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনারা যাতে জাপ-সেনাদের বিরুদ্ধে

অস্ত্র ধারণ না করে তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচার ব্যবস্থা জোরদার করা হোক।

১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর সকালে ব্যাঙ্কক সহরের প্রান্তসীমায় গুরুত্বপূর্ণ এক বৈঠক বসল। বৈঠকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের পক্ষ থেকে প্রীতম সিং জাপানী মেজর ফুজিয়ার সঙ্গে সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং পরবর্তী কর্মধারা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করলেন। সিদ্ধান্ত হল, জাপ সেনারা দক্ষিণ থাইল্যানড অভিমুখে যে-অভিযান শুরু করার জন্য তৈরি, স্বাধীনতা সংঘের কিছু নেতা এবং কর্মীও তাদের সামিল হবেন। জাপ সেনাদের সঙ্গে ঐ কর্মী নেতারা জাপ অধিকৃত এলাকার ভারতীয়দের সংগঠিত করবেন এবং বিভিন্ন এলাকায় তাদের নিয়ে স্বাধীনতা সংঘের একটি শাখা কেন্দ্র গড়ে তুলবেন।

প্রীতম সিংএর দিনলিপি থেকে জানা যায়, ডিসেম্বরের দশ তারিখেই বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ স্বাধীনতা সংঘের একদল কর্মী দক্ষিণ থাইল্যানডের সিংঘোড়া সহরে পৌঁছান এবং সেখানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রতীক তিনরঙা পতাকা উত্তোলন করেন। স্থানীয় প্রবাসী ভারতীয়রাও ঐ উৎসবে যোগ দেন। তারা আগে থেকেই জানতেন, জাপ সেনাদের সঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের একটি চুক্তি হয়েছে এবং সেই চুক্তি অনুসারে সংঘের নেতা ও কর্মীরা থাইল্যানড থেকে মালয় অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছেন। উৎসাহ আর উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত প্রবাসী ভারতীয়দের চোখেমুখে তখন সম্ভাব্য স্বাধীনতার স্বপ্ন।

জাপানী সেনাদের সঙ্গে স্বাধীনতা সংঘের নেতা ও কর্মীদের অভিযান অব্যাহত রইল। একের পর এক নগর গঞ্জ আর গ্রাম দখলের পর সেইসব অঞ্চলে স্বাধীনতা সংঘের শাখা স্থাপনের কাজও চলল। বহু দুর্গম বনপথ আর পর্বত অতিক্রমের তিনদিন পর জাপ সেনাদল ও সংঘের কর্মী-নেতারা থাইল্যানড সীমান্তে গিয়ে হাজির হলেন।

অভিযাত্রী ঐ দলের সঙ্গী ছিলেন জাপ মেজর ফুজিয়ারা এবং প্রীতম সিংও। তাঁরা সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ এক অঞ্চলের গোপন ঘাঁটিতে বসে পরবর্তী রণকৌশল নিয়ে শলাপরামর্শ শুরু করলেন। জাপ সামরিক বাহিনী পরবর্তী অভিযানের জন্য নির্দেশের অপেক্ষা করতে লাগল!

১৪ ডিসেম্বরের সূর্য অস্তমিত হল। বৃটিশ সেনাবাহিনীর অবস্থানের খবর আগেই এরা জানতে পেরেছিল। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরপারের দিকে নজর রাখা হয়েছিল। কেননা, জাপ বাহিনী জানত, বৃটিশ বাহিনীর দক্ষ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট, ক্যাপটেন মোহন সিং-এর পরিচালনায় অদূরবর্তী কোথাও সতর্কভাবে অপেক্ষা করছিল। সবকিছু বিচার বিবেচনা করে সুসংহতভাবে ওৎ পেতে থাকা বৃটিশ বাহিনীর ওপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে তীব্রভাবে আক্রমণ করা যায় কিনা—জাপ সেনারা গোপনে সে বিষয় শলাপরামর্শ করেছিলেন। মেজর ফুজিয়ারা এবং প্রীতম সিং যখন জাপ সামরিক বাহিনীর পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয় আলোচনায় দারুণভাবে ব্যস্ত, সেই চরম মুহূর্তে এক জরুরী গোপন সাংকেতিক বার্তা এল।

প্রেরক মালয় সীমান্তে অবস্থানরত বৃটিশ বাহিনীর পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের ক্যাপটেন মোহন সিং।

মোহন সিং! ক্যাপটেন মোহন সিং। দক্ষ সেনাপতিরূপে বৃটিশ বাহিনীর তিনি এক গর্ব। চাকরীর খাতিরে পানজাবী এই দক্ষ সেনা বৃটিশ বাহিনীতে থাকলেও, পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের সব খবরাখবরই তিনি রাখতেন! মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন, পরাধীন ভারতবর্ষের গণচেতনা ও স্বাধীনতা স্পৃহা, সুভাষচন্দ্রের স্বদেশ ত্যাগ, বার্লিনে উপস্থিতি এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান, জার্মানীতে হিটলারের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎকার ও তাঁর কর্মতৎপরতার সংবাদ তিনি নিয়মিত ভাবে রাখতেন এবং গোপনে

বার্লিন থেকে প্রচারিত সুভাষচন্দ্রের বেতার ভাষণ শুনতেন আর তার পরিণতিতে মোহন সিং-এর অন্তরাত্মা মাঝে মাঝেই নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠত। দেশমাতৃকা আর নিপীড়িত নিগৃহীত দেশবাসীর ব্যথায় তিনিও জ্বলতেন। তাই যখন তিনি জানতে পারলেন, থাইল্যাণ্ড অভিযান শেষ করে জাপ সেনারা মালয় সীমান্তে উপস্থিত এবং তাদের সঙ্গে রয়েছেন ভারতবর্ষের মুক্তিকামী শত শত প্রবাসী ভারতীয়, তখন আর তিনি মনের ক্ষোভ প্রকাশ না করে পারলেন না। বুঝলেন, ভারতবর্ষের মুক্তির যুগসন্ধিক্ষণে তাঁরও কিছু কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে। সেই পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য তিনি মেজর ফুজিয়ারার মাধ্যমে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের কর্মী ও নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শত্রু-শিবিরে অবস্থানরত মেজর ফুজিয়ারার কাছে ক্যাপটেন মোহন সিং তাঁর গোপন মনোবাসনা প্রকাশ করে সাংকেতিক ঐ বার্তা পাঠালেন।

ডিসেম্বরের ১৫ তারিখ। দিনের সূর্য এদিনও অস্তাচলের পথে। ক্রমে দিগন্ত জুড়ে ঘন অন্ধকার নেমে এল। গাছে গাছে পাখিদের কলকাকলি হল স্তব্ধ। সীমান্তের ওপারে এপারে নিশ্ছিদ্র নিস্তব্ধতা। উভয় পারেই দারুণ সতর্কতা।

সেই সতর্ক প্রহরের অন্ধকার পথ ভেদ করে আরও বেশী সতর্কতার সঙ্গে বৃটিশ শিবির থেকে চলে এলেন ক্যাপটেন মোহন সিং। বৃটিশ শিবিরের জনপ্রিয় দক্ষ সেনাপতি। তিনি মনের ক্ষোভ আর চেপে রাখতে পারলেন না।

স্বদেশভূমি ভারতবর্ষের পরাধীনতার জ্বালা তাঁকে এতদিন দগ্ধ করছিল। মেজর ফুজিয়ারা, প্রীতম সিং-এবং অন্যান্য কয়েকজন পদস্থ সামরিক অফিসারের সঙ্গে ক্যাপটেন মোহন সিং এর গোপন বৈঠক বসল। মোহন সিং প্রথমে জাপানী সেনাদের মনোভাব যাচাই করতে লাগলেন। এ প্রসঙ্গে মোহন সিং লিখেছেন : প্রথমে আমি জাপানীদের

উদ্দেশ্য এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে তাদের আন্তরিকতা ও মনোভাব অনুভব করার চেষ্টা করলাম। ভাবলাম, সত্যসত্যই যদি জাপানীরা ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য আন্তরিকভাবে সহায়ক হয়, তবে আমিও দেশের স্বার্থে বৃটেনের বিরুদ্ধে লড়াই-এ নামব এবং ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে আরও ব্যাপক সংগ্রামে লিপ্ত হব। এ বিষয়ে তাদের সাহায্য হবে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম সম্বল। সঙ্গে অবশ্য মোহন সিং সর্ত আরোপ করলেন: জাপানীদের স্থায়ীভাবে ঘোষণা করতে হবে যে, ভারতবর্ষের উপর কর্তৃত্ব করার মোহ তাঁদের নেই। এবং আমরা ভারতীয়েরাই আমাদের সংঘবদ্ধ করে স্বদেশভূমির মুক্তিযুদ্ধে অগ্রসর হব। বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধে উভয় দেশের স্বার্থেই জাপান আমাদের সক্রিয় সাহায্য করবে। গুরুত্বপূর্ণ গোপন ঐ বৈঠকে বিস্তৃত আলোচনা হল। ক্যাপটেন মোহন সিং জাপ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হলেন। তাদের বৃটিশ বিরোধী মনোভাব ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধে আন্তরিকভাবে ভারতীয়দের সাহায্যে করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মোহন সিং এবার তাঁর শেষ সর্ত আরোপ করলেন।

মেজর ফুজিয়ারা সহ অন্যান্য সামরিক অফিসারদের কাছে বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে ভারতীয়দের নেতৃত্বের প্রশ্ন তুলে বললেন, আমি বা প্রীতম সিং কেউই নন—এই বিরাট পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্য আরও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রয়োজন। এবং তা দিতে পারেন আপোষ-হীন সংগ্রামী এবং অকুতোভয় নেতা সুভাষচন্দ্র বসু—যিনি জার্মানীতে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে ভারতবর্ষের সর্বাত্মক মুক্তিসংগ্রামে প্রয়াসী। জার্মানীতে সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতি এবং তৎপরতার খবর ততদিনে পূর্ব দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। বৃটিশ বাহিনীর অন্তর্গত ভারতীয় সেনাদের মধ্যেও সুভাষচন্দ্রের তুলনাহীন জনপ্রিয়তা। মোহন সিং তাই জাপ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন রেখে বললেন, আপনারা সুভাষচন্দ্রকে জার্মান থেকে পূর্ব এশিয়ার এই রণাঙ্গনে

আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করুন। দেখবেন, তাঁর উপস্থিতির সংবাদ বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের মধ্যে কি যাদুমন্ত্রের সৃষ্টি করে। তাঁর নামে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে হাজার হাজার সেনা। এশিয়ার রণাঙ্গণে বৃটিশ বাহিনী ভেঙে চৌচির হবে, আর বৃটিশ বিরোধী চাপা ক্ষোভ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটাবে।

থাইল্যাণ্ড-মালয় সীমান্ত সহর অর্লস্টারে বসে জাপানী মেজর ফুজিয়ারা ও তাঁর দলের সঙ্গে ক্যাপটেন মোহন সিং-এর একটানা আলোচনা চলল। মেজর ফুজিয়ারা মোহন সিং-এর যাবতীয় বক্তব্য ও প্রস্তাব শুনলেন। মোটামুটি হৃদ্য পরিবেশে তাঁদের শলাপরামর্শ শেষ হল। ফুজিয়ারা আলোচনার শেষে ক্যাপটেন মোহন সিংকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সদস্য হতে অনুরোধ জানালেন। মোহন সিং তাতে খুব একটা আপত্তি করলেন না, তবে তার আগে তিনি জাপানীদের মনোভাব ও আন্তরিকতা আরও খতিয়ে দেখার নামে কিছু সময় চাইলেন।

এ প্রসঙ্গে মোহন সিং নিজেও লিখেছেন: ফুজিয়ারা এবং তাঁর সহকর্মীদের অমায়িক ব্যবহার, বিনয়ী মনোভাব, পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে আগ্রহ ইত্যাদি দেখে জাপানীদের সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। তবে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং তাঁদের আধা সরকারী প্রতিশ্রুতিতেও পুরোপুরি ভাবে আমি জাপানীদের মতিগতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারলাম না। এছাড়া প্রীতম সিং ও তাঁর সহকর্মীদের মনোভাব খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করলাম।

মোহন সিং-এর মনে আরও একটা সন্দেহ এবং সংশয় দেখা দিল। জাপ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে তিনি যদি তাঁর দলবল নিয়ে জাপ সেনাদের সঙ্গী হয়ে ভারতবর্ষের মুক্তি যুদ্ধের সামিল হন, তার ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যোদ্ধা এবং জাতীয় কংগ্রেসের

নেতাদের মধ্যে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে—তাও তিনি ভাবতে লাগলেন। একের পর এক চিন্তা এসে তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। যত সহজে তিনি বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে স্বদেশের মুক্তি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বেন ভেবেছিলেন, পরবর্তী পরিস্থিতিতে তা খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার বলে মনে করতে পারলেন না। জাপ সেনাদের অধীনে যেসব ভারতীয় যুদ্ধবন্দী ছিল, তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পরিণতির কথাও তিনি ভাবলেন। পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, অনুরূপ ক্ষেত্রে বৃটিশ বাহিনীর অন্তর্গত ভারতীয় সেনাদের বিরুদ্ধেই তাঁদের যুদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধের নামে একদল ভারতীয় সেনার হাতে বেশ কিছু ভারতীয় সেনার জীবন সংশয়।

ক্যাপটেন মোহন সিং দক্ষ সেনাপতির মত পূর্বাপর পরিস্থিতি পরিণাম বিশ্লেষণ করে দেখতে ফুজিয়ারার কাছে আরও কিছুদিন সময় চাইলেন। তাঁকে জানালেন সবকিছু ভেবে, চিন্তা করে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানাবেন।

মেজর ফুজিয়ারা অবশ্য ক্যাপটেন মোহন সিং-এর কথাবার্তা এবং যুক্তিতে খুশীই হলেন। দক্ষ সেনাপতির আন্তরিকতা সম্বন্ধে তিনিও বেশ নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর প্রীতম সিংকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সীমান্ত সহর অল´স্টার ত্যাগ করলেন।

এদিকে যখন মোহন সিং ফুজিয়ারা আলোচনা চলছিল, জাপ সেনারা তখন থাইল্যাণ্ডের সীমানা পার হয়ে মালয়ের ঘন বনজঙ্গল ভেদ করে তা দখলের জন্য অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলছিল। বৃটিশ সেনা-পতিরা জাপানী সেনাদের গতিপথ স্থির করে উঠতে পারছিল না। পায়ে হেঁটে, সাইকেলে আর সাঁজোয়া গাড়ি করে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের কর্মী-নেতারাও জাপ সেনাদের সঙ্গে মালয়ের পথে এগিয়ে চলল।

স্বাধীনতা সংঘের পক্ষ থেকে বহুদিন আগে থেকেই মালয়ে মোতায়েন

বৃটিশ সেনাদের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী প্রচার চলছিল। এছাড়া বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের প্রতি ইংরাজ সেনাদের তাচ্ছিল্য, বিমাতৃসুলভ মনোভাব ইত্যাদির ফলে ভারতীয় সেনাদের মধ্যে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ জমাট বেঁধেছিল। তাই জাপ সেনাদের ত্রিমুখী আচমকা অভিযানে যখন মালয়ের বৃটিশ সেনারা ছিন্নভিন্ন, ভারতীয় সেনাদের অধিকাংশই তখন আর সক্রিয়ভাবে তাদের সহযোগিতা করল না। বৃটিশ বাহিনীর ইংরাজ সেনাদল থেকে ভারতীয় সেনারা মূলতঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ফলে জাপ সেনাদের অভিযান আরও ত্বরান্বিত হল।

এয়ার মার্শাল ব্রুকস পোফাম ছিলেন ঐ মালয়ের বৃটিশ বাহিনীর কমানডার-ইন-চীফ। জাপানীদের আক্রমণের তোড়ে দিশাহারা। ব্রুকস সাহেব মালয় বিমান বন্দর রক্ষা করার জন্য দারুণভাবে সক্রিয় হলেন। বিমান ও স্থল বাহিনীর অধিকাংশ সেনাই সেখানে মোতায়েন করলেন। অপরপক্ষে জাপ বাহিনী জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আচমকা তীব্র আক্রমণ চালাল। মালয়ে অবস্থানকারী বৃটিশের স্থল, নৌ আর বিমান বাহিনীর মধ্যে তেমন কোন সমন্বয় না থাকায় কেউ কাউকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। জাপ সেনাবাহিনীর নৌবহরও ছিল দারুণ শক্তিশালী, সক্রিয়। জাপ নৌবাহিনী প্রিন্স অব ওয়েলস আর রিপালস নামক বিরাট দুখানি বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে দিল। যুদ্ধের গতি তীব্র থেকে তীব্রতর হল। জাপ সেনাদের অগ্রগতি অব্যাহত রইল। ব্যাঙ্ককের স্বাধীনতা সংঘের সদর দপ্তরের নির্দ্দেশে মুক্তিযোদ্ধারাও জাপ সেনাদের সঙ্গে এগিয়ে চললেন।

যুদ্ধারম্ভের মাত্র ষোল দিনের মাথায় মালয় প্রায় জাপানীদের দখলে চলে এল। বৃটিশ বাহিনীর ইংরাজ সেনারা ভারতীয় সেনাদের ফেলে যে যেমন ভাবে পারল পালাতে লাগল। পেনাঙ দ্বীপসহ পেরাক নদীর উত্তর এবং পশ্চিম অঞ্চলে জাপানী অধিকার প্রতিষ্ঠিত

হল। তারপর ২৩ ডিসেম্বর, রণকৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সহর তাইপিঙেরও পতন ঘটল। মালয় পতনের খবরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে যেমন হতাশা আর পরাজয়ের সুর ধ্বনিত হল, জাপ সেনাবাহিনী আর ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের কাছে ঐ সমাচার তেমনি আনন্দ আর বিজয় উৎসবের উল্লাস নিয়ে এল। পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রবাসী ভারতীয়দের মনে তখন দারুণ উৎসাহ আর উদ্দীপনা।

পরাজিত এবং পশ্চাদপসারণে উদ্যোগী বৃটিশ বাহিনীর শিবিরে তখন দারুণ হতাশা। বৃটিশ বাহিনীর কর্মকর্তারা পাগলা নেকড়ের মত তাদের অধীনস্থ ভারতীয় অফিসারদের উপর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রাখে। অবিশ্বাস আর হতাশায় অন্ধ সেনাপতিরা ভারতীয় সেনাদের তাচ্ছিল্য আর অবহেলার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল। ফলে সাধারণ সেনাদের মত অফিসারদের মনেও ক্ষোভ আর বিদ্রোহের আগুন দানা বাঁধে। এতদিন ধরে স্বাধীনতা সঙ্ঘের কর্মীদের প্রচারিত বক্তব্যে বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয়রা যতটা না বিশ্বাসী ছিল, ক্রমে তাদের সেই ধারণা পাল্টাতে শুরু করল। বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয়রা বুঝল, তারা ইংরাজদের ঘৃণা আর অনুকম্পার পাত্র মাত্র। বৃটিশদের সাম্রাজ্যরক্ষার স্বার্থে তাদের ওপর পশুর মত ব্যবহার করা হচ্ছে। মালয়ের বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের ক্ষোভ যখন ক্রমে ধূমায়িত হচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা গেল, বৃটিশ সেনাপতিরা তাদের শিবিরগুলি তন্ন তন্ন করে তল্লাসী চালাচ্ছে। দেখছে ভারতীয় সেনাদের কাছে বৃটিশ বিরোধী কোনও প্রচারপত্র ইত্যাদি আছে কিনা। শুধু তাই নয়—রাতারাতি তাদের কাছ থেকে বেতারযন্ত্র ইত্যাদিও কেড়ে নেওয়া হল। কারণ বৃটিশ সেনাপতিরা জানত, গোপন বেতার কেন্দ্র থেকে সুভাষচন্দ্র নিয়মিত যে বেতার ভাষণ দিচ্ছিলেন, ভারতীয় সেনারা তা শুনলে বৃটিশ বিরোধী হয়ে উঠবে। ফলে তাদের বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহের যেমন বহিঃপ্রকাশ ঘটবে,

তেমনি ভারতবর্ষের মুক্তির দাবীতে তারা হয়তো সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাবে। এইসব আশঙ্কা আতঙ্ক নিয়ে যখন মালয়ের কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন, সেই সঙ্কটময় দিনগুলিতে একদিন গভীর রাত্রে ক্যাপ্টেন মোহন সিং তাঁর কাছে গোপনে রাখা একটি বেতারযন্ত্রের কাছে কান পাতলেন। দৃপ্তকণ্ঠে কে যেন ঘোষণা করল, বার্লিন বেতার-কেন্দ্র থেকে বলছি। পরাধীন ভারতবর্ষকে বৃটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার কঠিন শপথ নিয়ে আত্মগোপন করে চলে আসা আপোষহীন সংগ্রামী নেতা, মুক্তিদূত সুভাষচন্দ্র বসু এখন ভাষণ দেবেন।

ঘোষকের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হল। তারপর সুভাষচন্দ্রের জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলঃ বৃটিশের শত মিথ্যা প্রচার সত্ত্বেও বুদ্ধিমান ভারতীয়দের বুঝতে বাকী নেই যে, এই বিশ্বব্যাপী মহাসমরে ভারত-বর্ষের একমাত্র শত্রু হচ্ছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। শতাধিক বর্ষব্যাপী এই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করে আসছে। ভারতবর্ষের মুক্তি আমাদের একান্ত কাম্য। বিশ্বব্যাপী এই মহাসমরের যুগসন্ধিক্ষণে পরাধীন মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়ের অর্থই ভারতবর্ষের মুক্তি। বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদ যদি কোনও রকমে বিজয়ী হয়, মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে তবে চিরকাল দাসত্বের জ্বালা সইতে হবে। তাই ভারতবর্ষকে আজ বেছে নিতে হবে, দাসত্ব অথবা স্বাধীনতা! এর ভেতর কোনটিকে সে বরণ করে নেবে?

বৃটেনের বেতনভোগী প্রচারকরা আমাকে শত্রুপক্ষের এজেন্ট বলে চিহ্নিত করেছে। আমার দেশবাসীর কাছে আমার নিজের কোনও সাফাই দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমি সারা জীবন অবিরাম লড়াই করেছি—আপোষের কথা মনেও স্থান দিই নি। আমার সদভিপ্রায়ের এর চেয়ে বড় সাক্ষ্য আর নেই।

সারা জীবন আমি মাতৃভূমির সেবা করেছি, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্তও আমি তাই করব। পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন, ভারতবর্ষই আমার সর্বস্ব—ভারতবর্ষের মঙ্গলই আমার মঙ্গল।

নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে যুদ্ধের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করলে আপনারা আমার বক্তব্য সমর্থন করে বলবেন—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের দিন আগত। ভারত মহাসাগরের নৌঘাঁটিগুলি ইতিমধ্যে বৃটিশের হাতছাড়া হয়েছে, পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে পরাজিত বৃটিশ সৈন্যদল বিতাড়িত হতে চলেছে!

দেশবাসী ভারতীয়গণ, তোমরা যে যেখানেই থাক না কেন, ভারতবর্ষের মুক্তিমন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে এই মহাযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ার লগ্ন আগত। বৃটিশ সাম্রাজ্য যেমন ধ্বংসের পথে, ভারতের স্বাধীনতা-সূর্যও তেমনি উদয়ের পথে। পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিসূর্য আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ঘুমিয়ে থাকার দিন শেষ হয়ে গেছে।

আমি আবার ঐতিহাসিক ১৮৫৭ সালের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ঐ বছর পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। এবার যে সংগ্রাম আরম্ভ হচ্ছে, তা আমাদের স্বাধীনতা লাভের শেষ সংগ্রাম!

রেডিও থেমে গেল। মোহন সি-এর শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। অনির্বচনীয় অনুভূতিতে সুদক্ষ এই সেনানীর সমস্ত দেহমন চঞ্চল অধীর হয়ে উঠল। সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগের রোমাঞ্চকর কাহিনীর কথা তিনি আগেই শুনেছিলেন। তিনি জানতেও পেরেছিলেন, বীর এই নেতা মাতৃভূমি ত্যাগ করে জার্মানী গিয়ে স্বদেশভূমির মুক্তির জন্য বিরাট বাহিনী গড়ে তুলতে সক্রিয়। তাই তাঁর বেতার ভাষণ মোহন-সিংএর জীবনে নতুন চেতনাবোধ জাগাল। বারংবার তাঁর কর্ণকুহরে সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতে লাগল: এটাই আমাদের স্বাধীনতা লাভের শেষ সংগ্রাম!

১৯৪১ সালের ২৭ ডিসেম্বর। মালয়ের আকাশে ততদিনে জাপ আর ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ বিজয় পতাকা উড়িয়েছে। দিনের সূর্য বিজয় গর্বে আরও উজ্জ্বল, আরও নির্মল। পরিবর্ত্তিত পরিবেশে মালয়ের প্রান্ত সীমায় আবার নতুন এক ইতিহাস সৃষ্টি হল। তাইপেঙ সহরে এসে উপস্থিত হলেন দুই নেতা—জাপানী মেজর ফুজিয়ারা এবং ভারতীয় বিপ্লবী প্রীতম সিং।

মালয় যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি বিশ্লেষণে তাঁরা ব্যস্ত। পরবর্তী অধ্যায় এবং রাজনৈতিক তৎপরতার সম্ভাব্যতা নিয়েও তাঁদের শলা-পরামর্শ চলল। দারুণ কর্মতৎপরতার মধ্যে তাঁদের তিনটি দিন কাটল। তারপর ডিসেম্বরের ৩০ তারিখে ক্যাপটেন মোহন সিং এসে উপস্থিত। তিনি মেজর ফুজিয়ারা আর বিপ্লবী প্রীতম সিং-এর সঙ্গে দেখা করলেন। এবং তাঁদের জানালেন যে, জাপানীদের সহ-যোগিতায় যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সেনাদের নিয়ে বিরাট এক মুক্তি বাহিনী গড়ে তুলতে তিনি আগ্রহী। সঙ্গে অবশ্য মোহন সিং পাঁচটি সর্ত তুলে ধরলেন। আরোপিত সর্ত পাঁচটি যথাক্রমে (১) ভারতীয় মুক্তি সেনা গড়ে তুলতে জাপানীদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা চাই (২) ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ এবং প্রস্তাবিত সেনাবাহিনীকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। (৩) বৃটিশ বাহিনীর যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যেসব ভারতীয় সেনা আছে, তাঁদের, তাঁর (ক্যাপটেন মোহন সিং) নিয়ন্ত্রণে দিতে হবে। (৪) যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যারা প্রস্তাবিত মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিচ্ছুক তাদের বন্দী শিবির থেকে মুক্তি দিতে হবে এবং যারা অনিচ্ছুক তাদেরও তাঁর অধীনে বন্দী শিবিরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে, (৫) প্রস্তাবিত মুক্তি বাহিনীকে জাপ বাহিনীর সমমর্যাদা দিতে হবে।

ক্যাপটেন মোহন সি-এর কর্মদক্ষতা এবং তাঁর আন্তরিকতা সম্পর্কে মেজর ফুজিয়ারা আগেই ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই তাঁর

দেওয়া সর্ত পাঁচটির উপর তিনি বেশ গুরুত্ব দিলেন। তারপর দু'দিন ধরে সর্তগুলির বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে তা মেনে নিতে সম্মত হলেন। শেষপর্যন্ত সর্ত অনুযায়ী যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সেনাদের দায়িত্ব ক্যাপটেন মোহন সিং-এর হাতে তুলে দিলেন।

জাপ সেনাদল কর্তৃক মালয় অধিকারের পর পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক গতি নতুন পথে মোড় নেয়। যুদ্ধবন্দীদের দায়িত্ব হাতে পেয়ে ক্যাপটেন মোহন সিং তাঁদের কিছু প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। ঐ কমিটির দায়িত্ব হল, মোহন সিং আরোপিত সর্ত অনুযায়ী ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতি ও নীতি নির্দ্ধারণ এবং ভারতীয় মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলার আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা করা।

মোহন সিং-এর নেতৃত্বে ভারতীয় যুদ্ধবন্দী সেনা প্রতিনিধিদের নিয়ে যে কমিটি গঠন করা হল, তারা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয় এবং যুদ্ধবন্দী সেনাদের নেতৃত্ব দানের জন্য শক্তিশালী এক সংগ্রামী নেতার প্রয়োজন। এবং সেই নেতৃত্ব দিতে পারেন একমাত্র সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব শুধু পূর্ব এশিয়ার বৃটিশবিরোধী অভিযানকে তরান্বিতই করবে না, সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী সকল শ্রেণীর ভারতীয়দের নৈতিক বলও বৃদ্ধি করবে। কমিটির সিদ্ধান্তে ক্যাপটেন মোহন সিং তৃপ্ত হলেন। তাঁর মনেও ঠিক একই প্রস্তাব উঁকিঝুকি দিচ্ছিল। তিনিও চাইছিলেন, বার্লিন থেকে সুভাষচন্দ্রকে এনে তাঁর হাতে নেতৃত্বভার দেওয়া হোক।

মোহন সিং-এর নেতৃত্বে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে গঠিত কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে যে ঐতিহাসিক প্রস্তাব নিলেন, ১৯৪২-এর জানুয়ারীর গোড়ায় তারা তা জাপ কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানিয়ে দিলেন। তাতে বলা হল ঃ যদি সুভাষচন্দ্রের মত একজন দেশপ্রেমিক নেতার নেতৃত্ব পাই, তাতে আমরা ধন্য হব, তাঁর মত শক্তিশালী নেতৃত্বই

আমাদের প্রয়োজন। তিনি আপোষহীন সংগ্রামী এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী এক দুর্লভ নেতা। তাঁর নেতৃত্বে যে কোনও সংগ্রামের জন্য ভারতবাসী অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। সুভাষ-চন্দ্র এমন একজন নেতা, যাঁর নাম ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপ্লবের চেতনা জাগাবে। এবং তার ফলে বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের মধ্যেও দেশাত্মবোধ সৃষ্টি করবে। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হলে ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের অধিকাংশই তাঁর সমর্থনে দাঁড়াবে। অধিকাংশ ভারতীয় সেনাই তাঁর নেতৃত্ব আর নির্দেশে শেষ রক্তবিন্দু দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাঁর নাম আমাদের মধ্যে নতুন জীবন যৌবনের প্রেরণা যোগায়। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের মহান নেতৃত্বই আমাদের কাম্য।

জাপ কর্তৃপক্ষ ক্যাপটেন মোহন সিং-এর মাধ্যমে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সেনাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। মেজর ফুজিয়ারাও এ-ধরণের একটা প্রস্তাব আশা করেছিলেন। মোহন সিংকে জানালেন, তাঁর সরকার চান ভারতের মুক্তির জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করা হোক। ক্যাপটেন মোহন সিং নৈতিকভাবে ঐ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হলেও মেজর ফুজিয়ারাকে বললেন, 'স্বেচ্ছাসেবী মুক্তিবাহিনী' নামকরণের মধ্যে কোনরকম ভারতবর্ষের জাতীয় চরিত্রের প্রকাশ নেই। তাই প্রস্তাবিত বাহিনীর নাম 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' রাখাই হবে সঙ্গত। ফুজিয়ারা মোহন সিং-এর সুপারিশ মেনে নিয়ে তাঁকে জানালেন, পূর্ব-এশিয়ায় নেতৃত্বের জন্য তাঁর সরকারও সুভাষচন্দ্রকে পেতে উদগ্রীব। তাঁরাও ঐ মহান নেতার প্রতীক্ষায়।

যুদ্ধবন্দী ভারতীয় আর তাঁদের পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে মোহন সিং ও ফুজিয়ারার সঙ্গে একদিকে যেমন আলোচনা আর পরামর্শ চলছে, জাপ সেনাদের গতিও তেমনি অব্যাহত রয়েছে। সেই গতির তোড়ে একের পর এক বৃটিশ সেনা শিবির বিধ্বস্ত, পশ্চাদপদসারণে ব্যস্ত।

পশ্চাদপদসারণ করতে করতে বৃটিশ বাহিনীর সেনারা স্লিম নদীর তীরে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে গিয়ে জাপ সেনা এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের কর্মীদের বিরুদ্ধে জোর লড়াই-এর প্রস্তুতি নিল। কিন্তু কোন বাধাই জাপ বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করতে পারল না। জাপ সাঁজোয়া বাহিনী বৃটিশ সেনাদের ব্যূহ ভেদ করে মালয়ের রাজধানী কুয়ালালামপুর দখল করল। ১৯৪২ সালের ১১ জানুয়ারী কুয়ালালামপুরে ভারতীয়দের সঙ্গে জাপ সেনারাও নিজ নিজ দেশের জাতীয় পতাকা তুললেন। বলাবাহুল্য, কুয়ালালামপুরের অভিযানে জাপ বাহিনীর পাশাপাশি ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের স্বেচ্ছাবাহিনীও জোর কদমে এগিয়ে যায়। জাপ সেনারা কুয়ালালামপুরের বিজয় পতাকা তুলবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করে, পরাজিত এবং যুদ্ধবন্দী বৃটিশ বাহিনীর মধ্যে প্রায় তিন হাজার পাঁচশ'র মতো ভারতীয় সেনা আছে। মালয় রণাঙ্গণে যারা বৃটিশের হয়ে লড়াই করেছে, তারাও জাপ সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী। ঘোষণায় অবশ্য একথাও বলা হয় যে, বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের অধিকাংশকে বিশ্বরাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞ রাখা হয়েছিল। বিশেষ করে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় জাপানীদের সহযোগিতায় প্রাবাসী ভারতীয়রা যেভাবে সমরায়োজন করে চলছিলেন, সে খবর তাদের জানতেই দেওয়া হত না। বরং নানা প্রকার ভিত্তিহীন অপপ্রচার করে ভারতীয় সেনাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করত ইংরাজ সেনাপতিরা। তাই মালয়ের প্রাণকেন্দ্র কুয়ালালামপুরে বিজয়-উৎসবের দিনে জাপ কর্তৃপক্ষ যুদ্ধ বন্দী ভারতীয়দের ইংরেজ সেনাদের কাছ থেকে আলাদা করে ফেললেন। তারপর প্রাণচঞ্চল এক সামরিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সেনাদের দায়িত্বভার তুলে দিলেন ক্যাপটেন মোহন সিং-এর হাতে।

একের পর এক দেশ থেকে পরাভূত বৃটিশ বাহিনী পিছু হটতেলাগল। থাইল্যাণ্ড এবং মালয় সম্পূর্ণভাবে জাপ সেনাদের অধিকারে এল।

সেখানকার ভারতীয়দের মনে জাগল নতুন আশা। পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনাবোধ আরও তীব্র হল। জাপানীদের সম্পর্কে বৃটিশ বাহিনী যেসব বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার করেছিল, ক্রমে তা সাধারণ মানুষের মন থেকে দূর হতে লাগল। বাস্তবক্ষেত্রে তারা দেখল, জাপ-কর্তৃপক্ষ বৃটিশ বিরোধী—এশিয়া-বাসীর তারা বন্ধু। তাদের লড়াই মূলতঃ বৃটিশ সাম্রাজ্যেবাদের বিরুদ্ধে। এছাড়া প্রীতম সিং আর মোহন সিং-এর নেতৃত্বে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের কাজকর্ম এবং জাপ বাহিনীর সঙ্গে সংঘের সদস্যদের সখ্যভাব সাধারণ মানুষের মনেও প্রীতির ভাব জাগাল। পরিবর্তিত এই পরিস্থিতি আর পরিবেশের বিস্তৃত খবরাখবর মেজর ফুজিয়ারা এবং মোহন সিং প্রীতম সিংদেরও অজানা ছিল না। তাঁরা তাই বুঝলেন, বৃটিশ বিরোধী অভিযান আরও ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী করার লগ্ন সমাগত।

জাপ কর্তৃপক্ষ আর ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের নেতাদের মধ্যে আবার শলাপরামর্শ আর আঁলাপ-আলোচনা শুরু হল। মালয়ের কুয়া-লালামপুরে জাপানের প্রতিনিধি মেজর ফুজিয়ারা এবং অন্যান্য সামরিক অফিসারদের সঙ্গে ক্যাপটেন মোহন সিং ও প্রীতম সিং এক গোপন বৈঠকে বসলেন। পরবর্তী রণকৌশলও স্থির করা হল। থাইল্যাণ্ড মালয় অভিযান সফল। সম্পূর্ণ অঞ্চল এখন তাঁদের দখলে। বার্মা এবং সিঙ্গাপুরে গিয়ে পরাজিত ইংরাজ বাহিনী আবার নতুন করে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতি-আঘাতের সুযোগ খুঁজছে। সেই সুযোগ পাওয়ার আগেই যাতে বৃটিশ বাহিনীর ওপর তীব্র আক্রমণ চালানো যায়—সে বিষয় বিস্তারিত আলোচনা হল। সামরিক বিষয়ের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে সুমাত্রা, বার্মা ও সিঙ্গাপুরের বৃটিশ বাহিনীর ওপর চূড়ান্ত ব্যাপক আক্রমণ চালানোর ব্যাপারে প্রায় সকলেই একমত হলেন। কিন্তু ক্যাপটেন মোহন সিং তাতে একটু আপত্তি করলেন। বললেন, রণকৌশলের খাতিরে প্রথম পর্যায়ে

বার্মা এবং সিঙ্গাপুরের অভিযানই যথেষ্ট—সুমাত্রা আক্রমণের গুরুত্ব আপাততঃ খুবই নগণ্য।

বৃটিশ বাহিনীর প্রবীন এবং দক্ষ সেনানায়করূপে ক্যাপটেন মোহন সিং দীর্ঘদিন পূর্ব এশিয়ার ঐ অঞ্চলের সামরিক গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাও ছিল অনেক বেশী। তাই ফুজিয়ারা সহ অন্যান্য সব জাপ বাহিনীর কর্মকর্তারা তাঁর সুপারিশ মেনে নিলেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল: জাপ বাহিনী বার্মা এবং সিঙ্গাপুরের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য তৈরী থাকবে। সঙ্গে থাকবে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের স্বেচ্ছাসেবী এবং সদ্য যুদ্ধবন্দী বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের একাংশ, যারা বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে ভারতভূমির স্বাধীনতা অর্জ্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

ক্যাপটেন মোহন সিং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সেনাদের বাছাই-এর কাজ শুরু করলেন। তিনি তাদের দুই ভাগে ভাগ করলেন। যে দলটি বার্মার পথে যুদ্ধাভিযানে পাঠাবেন স্থির করলেন, তার নেতৃত্ব তুলে দিলেন মেজর রামসরূপ সিং-এর হাতে।

আর অন্য যে দলটিকে সিঙ্গাপুর অভিযানের জন্য তৈরী করা হল তার দায়িত্বভার তুলে দিলেন ক্যাপটেন আল্লাহ দিত্তার উপর। রামসরূপ সিং এবং আল্লাহ দিত্তা উভয়েই প্রথমে বৃটিশ বাহিনীর অধীনে ছিলেন। তাঁদের রণনৈপুণ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব বৃটিশ বাহিনীর পক্ষে দারুণ সহায়ক ছিল। কিন্তু ভারতীয় এই দুই সেনানীর মনে যে বৃটিশ বিরোধী চাপা ক্ষোভ, আর স্বদেশ ভূমির মুক্তির গভীর আগ্রহ সুদীর্ঘকাল জমাট বেঁধে ছিল, পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটল।

তাঁরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন বৃটিশ বিরোধী সম্ভাব্য ভারত অভিযানের সামিল হতে। ক্যাপটেন মোহন সিংও তাঁদের উপযুক্ত মর্যাদা ও সুযোগ দিতে এগিয়ে গেলেন! পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গণে

অভাবনীয় ভাবে এই যে পালা বদলের পালা শুরু, তার মূল সূত্রপাত ১৯৪১ সালের শেষাশেষি।

১৯৪২ সালের জানুয়ারী। বৃটিশ বাহিনীর যেসব ভারতীয় সেনা মালয়ের গভীর বন-জঙ্গলে জীবনপণ লড়াই করেছিল, তাদের মধ্যে দারুণ হতাশা দেখা দিল। তারা বুঝতে পারল বৃটিশ সেনাপতিরা তাদের মৃত্যু অথবা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে ঠেলে দিয়ে নিজেদের পিঠ বাঁচাতে ব্যস্ত। মালয় বিপর্যের মুখে তারা যখন তীব্র লড়াই করছিল তখন বৃটিশ সেনা আর সেনাপতিরা তাদের মালয়ের রণাঙ্গণে ফেলে রেখে সিঙ্গাপুরের নিরাপদ আশ্রয়ে আস্তানা নিয়েছিল। তাই মালয় পতনের পর বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের মধ্যে যারা ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ অথবা জাপ সেনাদের দলে যোগ দেয়, তারা বাদে বিরাট যে বাহিনী সিঙ্গাপুরে গিয়ে ইংরাজ শিবিরে পৌঁছোয়, তাদের কাছে বৃটিশের স্বার্থ-ছলনার রূপ নগ্নভাবে প্রকাশ হতে লাগল।

১৯৪২ সালের ৩১ জানুয়ারী। মালয় থেকে পালিয়ে সিঙ্গাপুরে আশ্রয় নেওয়া সেনারা জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় আতঙ্কিত। ঐদিন তারা রণকৌশল হিসাবে মূল ভূখণ্ড থেকে সিঙ্গাপুরকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য 'জোহর কজ-ওয়ে' ভেঙে ফেলল। জাপ সেনা আর ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের স্বেচ্ছাসেবীরা যাতে সহজে সিঙ্গাপুর আক্রমণ করতে না পারে তার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীর ভারতীয় জওয়ানদের দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধের জন্য তৈরী থাকতে বলা হল।

বৃটিশ-কর্তৃপক্ষের নয়া হুকুমে ভারতীয় সেনাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিল। মালয়ের যুদ্ধে লড়াই করে তারা আগেই ক্লান্ত, অবসন্ন। তার উপর আবার আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, মালয় যুদ্ধের পর তাদের যথেষ্ট বিশ্রাম দেওয়ার ব্যবস্থা হবে।

কিন্তু নতুনভাবে যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশে তারা হতাশ হল। ফলে তাদের

মনে এবার নানা প্রশ্ন উঁকি দিতে লাগল। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ প্রতি ব্যাপারে তাদের ফাঁকি দিচ্ছেন এবং ভারতীয় যোদ্ধাদের প্রতি দুর্ব্যবহার তাচ্ছিল্যও ক্রমেই বাড়ছে। তাই তারা নতুন নির্দেশ পেলেও তেমনভাবে আর উৎসাহবোধ করল না।

রেঙ্গুনের বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের মধ্যে যখন ক্ষোভের আগুন জ্বলছে, সেই চরম মুহূর্তে ইতিহাসের গতিপথ আবার অন্য পথে মোড় নিল। ফেব্রুয়ারী ১ তারিখে জাপ কর্তৃপক্ষ সিঙ্গাপুর দখলের জন্য সেনাবাহিনীকে গোপন নির্দেশ দিলে, সঙ্গে সঙ্গে বিরাট জাপ বাহিনী জল স্থল এবং নৌ পথে সিঙ্গাপুর অভিযান শুরু করল। বৃটিশ বাহিনীও জাপ সেনাদলকে প্রতিহত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করল। কিন্তু ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের গোপন প্রচার এবং প্রকাশ্য সহযোগিতায় বৃটিশ বাহিনীর ক্ষুব্ধ ভারতীয় সেনারা তখন মূলতঃ নিস্ক্রিয় হয়ে পড়ল। জাপ বাহিনীর ত্রিমুখী অভিযানের কাছে ইংরাজ সেনারা ছত্রভঙ্গ। ফেব্রুয়ারীর ৪ তারিখে জোহোর বহড়ু 'জোহোর বহড়ু' দখল করে জাপসেনারা প্রথম ধাপে জয়লাভ করল। তারপর সমুদ্র উপকূলবর্তী বৃটিশ বাহিনীকে পঙ্গু করে দিয়ে ৮ তারিখে জাপ বাহিনী সিঙ্গাপুরের মূল ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ল। আগে থেকেই বৃটিশ বাহিনী সিঙ্গাপুরের সামরিক শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি করে রেখেছিল। তাই জাপ বাহিনীর সিঙ্গাপুর প্রবেশের মুখে তারা তীব্রভাবে পালটা আক্রমণ চালাল।

বৃটিশ সেনা আর জাপ বাহিনীর মধ্যে সাতদিনব্যাপী প্রচণ্ড লড়াই চলল। সিঙ্গাপুরের আকাশ বাতাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মত্ততায় কেঁপে উঠল। পূর্ব রণাঙ্গণের অন্যান্য এলাকা থেকে কাতারে কাতারে জাপ সেনা এসে সিঙ্গাপুরের চারদিক ঘিরে ফেলল। তার সঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীও তৎপর। ইস্তাহার, প্রচারপত্র, মাইক্রোফোন আর গোয়েন্দা চক্রের মাধ্যমে সিঙ্গাপুরের যুদ্ধরত বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে তারা বৃটিশ-বিরোধী

প্রচার জোরদার করল। তাদের প্রচারের মূল কথা ছিল: বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধে যেন ভারতীয় সব সেনা জাপ বাহিনীর পক্ষে কাজ করে। জাপানের সহায়তায় ভারতীয় বিপ্লবীরা পরাধীন মাতৃভূমির মুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ। মুক্তিযুদ্ধের এই সূচনায় চাই দলমত নির্বিশেষে সকল ভারত সন্তানের আন্তরিক সহায়তা।

একদিকে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের লড়াই, অপর দিকে প্রচার—যুদ্ধ—এই দুয়ের মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় বৃটিশ সেনাপতিরা বিচলিত ও বিভ্রান্ত হল। ক্রমে সেনা শিবিরে ভারতীয়দের চাপা ক্ষোভও প্রকাশ পেতে লাগল। তারা বুঝল, পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের জন্য তাদেরও কিছু পবিত্র দায়িত্ব আছে।

এদিকে প্রায় নিয়মিত ভাবেই ভারতীয় সেনারা গোপনে বার্লিন আর টোকিওর বেতার থেকে প্রচারিত সংবাদ সমীক্ষা শুনতেন। সুভাষচন্দ্রের ভারতবর্ষ ত্যাগ; জার্মান জাপানে তাঁর কর্মতৎপরতা, বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে জাপ সরকারের ঘনিষ্ঠতা ও চুক্তি এবং পূর্ব এশিয়ায় ক্যাপ্টেন মোহন সিং ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের অগ্রগতির নানা খবর তাদের বেশ উৎসাহিত করত। বৃটিশ প্রচারযন্ত্র এতদিন যেভাবে একপেশে মিথ্যা সংবাদ শুনিয়ে তাদের অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছিল, এবার তারা তা বুঝতে শিখল। ক্রমে সিঙ্গাপুরের বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনারা নিষ্ক্রিয় হতে লাগল। একদিকে জাপ বাহিনীর অগ্রগতি, আর একদিকে নিজেদের সেনা শিবিরের বাস্তব অবস্থা, বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে দারুণভাবে বিভ্রান্ত করল। সিঙ্গাপুর রণাঙ্গণের প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার ভারতীয় সেনার অঘোষিত অসহযোগিতায় বৃটিশ সমরনায়কদের নৈতিক বল একেবারে ভেঙে গেল।

অবশেষে অনন্যোপায় বৃটিশ সেনাপতিরা ১৯৪২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। ফলে সিঙ্গাপুর হল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতছাড়া।

ঝানু যোদ্ধা জাপ বাহিনী আর এক মুহূর্তও দেরী করল না। পরাভূত বৃটিশ সেনাদের এক হিসাব কষতে বসল তারা। বৃটিশ সেনা বাহিনীর যে পূর্ণ তালিকা তৈরী হল, তাতে দেখা গেল, ভারতীয় সেনার সংখ্যাই সর্বাধিক অর্থাৎ পয়তাল্লিশ হাজার। বাকী আঠাশ হাজারের মধ্যে পনের হাজার বৃটিশ সেনা আর তের হাজার অস্ট্রেলিয়ান। জাপ কর্তৃপক্ষ বুঝলেন, বৃটিশ সেনাবাহিনীর মূলশক্তি ভারতীয়রা। তাদের বিচ্ছিন্ন বা নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে পারলে বৃটিশ বাহিনী পঙ্গু হয়ে পড়তে বাধ্য। সেদিকে লক্ষ্য রেখে তারা নতুন রণকৌশল নিল।

সিঙ্গাপুরের পতন হয় ১৫ ফেব্রুয়ারী। আর তারপরই জাপ কর্তৃপক্ষ ক্যাপটেন মোহন সিং ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক গোপন বৈঠকে বসেন। উদ্দেশ্য, সিঙ্গাপুর দখলের পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করা।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হল, অনতিবিলম্বে জাপ বাহিনীর পক্ষে মেজর ফুজিয়ারা বন্দী বৃটিশ বাহিনীর দায়-দায়িত্ব পরাজিত বৃটিশ সেনাপতিদের কাছ থেকে বুঝে নেবেন। তারপর যথাসময়ে সেই বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের তুলে দেওয়া হবে ক্যাপটেন মোহন সিং-এর হাতে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের রাজ্যসভায় এক প্রতিবেদনে ক্যাপটেন মোহন সিং বলেছিলেন, সিঙ্গাপুরের পতনের আগে জাপ কর্তৃপক্ষ তার হাতে প্রায় দশ হাজার ভারতীয় যুদ্ধবন্দীকে তুলে দেন। সিঙ্গাপুর দখলের পর জাপানীরা আরও পয়তাল্লিশ হাজার ভারতীয় যুদ্ধবন্দীর দায়িত্বভার তাঁর হাতে তুলে দেন।

সিঙ্গাপুরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে জাপ কর্তৃপক্ষ ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের কর্মতৎপরতা দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। ঐ রাত্রেই (১৫-১৬ ফেব্রুয়ারী মধ্যরাত্রে) সিঙ্গাপুরে এক গোপন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসল। তারপর মধ্যরাত্রে ঘোষণা করা হল: একদিন পর অর্থাৎ

১৭ তারিখের ভোরে সিঙ্গাপুরের ফারার পার্কে ধৃত বৃটিশ-বাহিনীর সকল ভারতীয় সেনাদের জমায়েত হতে হবে। আর ঐ বাহিনীর অভারতীয় অর্থাৎ বৃটিশ ও অস্ট্রেলিয়ান যুদ্ধবন্দী সেনাদের উপস্থিত থাকতে হবে ঘাঁটিতে।

যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে ভারতীয় ও অভারতীয় সেনাদের এই ভাগাভাগির প্রশ্নে বন্দী শিবিরে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সাধারণ সেনাদের চেয়েও অফিসারদের মধ্যে নানা সংশয় ও আশঙ্কার ভাব জাগে। কেননা, এতদিন তারা বৃটিশ প্রচারের মাধ্যমে শুনে আসছিলেন যে জাপানী সেনারা দারুণ প্রতিহিংসাপরায়ণ, তাদের আচরণও অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তাই মনে মনে তাদের নানা আতঙ্ক ও আশঙ্কা জাগা খুবই স্বাভাবিক ছিল। মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান সিঙ্গাপুর পতনের পর বৃটিশ বাহিনীর অন্যতম সেনাপতিরূপে জাপ সেনাদের হাতে বন্দী হন এবং ঐ বন্দী শিবিরেই ছিলেন। পরবর্তীকালে এই শাহনওয়াজ খানই হয়েছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন অন্যতম সমর নায়ক এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। ফারার পার্কে জমায়েতের ঘোষণা শুনে শাহনওয়াজ খানেরও নানা সন্দেহ জেগেছিল। এ প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ঃ···আমরা সবাই (বিশেষ করে অফিসাররা) এই হুকুম শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কারণ. যুদ্ধ-আইন অনুসারে বৃটিশ ও ভারতীয় সেনাদের মধ্যে কোনও তারতম্য না রেখে সকলকেই একসঙ্গে রাখার কথা। জাপানীদের নিষ্ঠুর আচরণের কথাও আমরা আগেই শুনেছিলাম। এবার মনে হল, জাপানীদের হাতে নির্যাতন ভোগ করতে ওরা (বৃটিশরা) ফেলে রেখে সরে পড়ছেন। পরদিন ভোরে মার্চ করে আমরা ফারার পার্কের দিকে রওনা হব, এমন সময় মেজর ম্যাকডাম আরও কয়েকজন বৃটিশ অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বিদায় জানাতে এলেন। আমার সঙ্গে করমর্দন করে তিনি গম্ভীর মুখে শুধু বললেন ঃ এই-ই বোধহয় আমাদের ভিন্ন

পথে যাত্রা শুরু। তখনও পর্যন্ত অবশ্য তাঁর ঐ কথার সঠিক অর্থ আমি বুঝতে পারিনি। কারণ, জাপানীদের মনোভাব তখনও পর্যন্ত আমরা কিছুই জানি না। মনে হয়, ম্যাকডাম সাহেব সবকিছু জেনেশুনেই এ কথাগুলি বলেছিলেন।

তখন পর্যন্ত আমাদের অনেকেই মালয়ে ক্যাপটেন মোহন সিং-এর গোপন কার্যকলাপ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ার অভিপ্রায়ের কথা বিস্তৃতভাবে কিছুই জানতেন না। পদস্থ বৃটিশ অফিসাররা সবকিছু জেনেশুনেও তা একান্তভাবে গোপন রেখেছিলেন। সুতরাং জাপ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমরা যখন ফারার পার্কে গিয়ে উপস্থিত— তখনও পর্যন্ত আমরা আমাদের ভাগ্য সম্বন্ধে অনিশ্চিত ছিলাম।

বন্দীশিবিরে দ্বিধা সঙ্কোচ আশঙ্কা আতঙ্ক যতই থাক না কেন, জাপ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ লঙ্ঘন করার মত দুঃসাহস বন্দী সেনাদের ছিল না। তাই পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে নির্দিষ্ট দিনে সাজ-সাজ রব উঠল। একে অপরের দিকে তাকায়—সকলের চোখেই বোবা চাহনি। মনের কথা কেউ প্রকাশ করে না।

১৯৪২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী। সকালের সূর্য দেখতে দেখতে মাথার উপরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আরও কিছুক্ষণ কাটল। সিঙ্গাপুরের রাজপথ ধরে অবনত মস্তকে এগিয়ে চলল যুদ্ধবন্দী নিরস্ত্র সেনা-বাহিনী। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। ধ্বংসোন্মুখ সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক! সকাল গড়িয়ে দুপুর হল। তখন বেলা প্রায় দুটো। দেখতে দেখতে ফারার পার্ক পরাজিত সেনাদের ভীড়ে ভরে গেল। বিরাট পার্কের কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই নেই। নিরস্ত্র সেনারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে নতুন নির্দেশের অপেক্ষায়।

সেনা সমাবেশের সামনের দিকে একটি ছোট্ট সামিয়ানা। তার নীচে খানকয়েক চেয়ার। টেবিলের উপর একটি মাইক্রোফোন বসানো। জাপ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে মেজর ফুজিয়ারা ক্যাপটেন মোহন সিংকে

নিয়ে উপস্থিত হলেন। তার আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন কর্নেল হাণ্ট—মালয়ের বৃটিশ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের অন্যতম কর্তাব্যক্তি। মিঃ হাণ্ট, মেজর ফুজিয়ারা ও ক্যাপটেন মোহন সিংকে স্বাগত স্যালুট জানালেন। জাপানী এবং ভারতীয় দুই সামরিক নেতাও প্রত্যাভিনন্দন জানালেন। তারপর প্রথাগত ভাবে কর্নেল হাণ্ট মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। গম্ভীর ভাবে কী যেন একটু ভাবলেন। চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বৃটিশ বাহিনীর সমর নায়ক কর্নেল হাণ্ট মাইক্রোফোনের আরও নিকটস্থ হলেন। তারপর তাঁর বাহিনীর পরাজিত বন্দী সেনাদের উদ্দেশ্যে বললেন : আমরা এখন সকলেই যুদ্ধবন্দী ! বৃটিশ গভর্নমেণ্টের হাত থেকে আমি আপনাদের সকলকে আজ জাপ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিচ্ছি। আপনারা এতদিন যেমন আমাদের হুকুম—নির্দেশ মেনে চলতেন, এখন থেকে অনুরূপ ভাবে তাঁদের হুকুম মেনে চলবেন। আপনাদের কাছে এটাই আমার শেষ নির্দেশ।

পঁয়তাল্লিশ হাজার ভারতীয় সেনা—যাঁরা এতদিন ছিলেন বৃটিশ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত—তারা কর্নেল হাণ্টের নতুন নির্দেশ পেয়ে অ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়ালেন, তারপর তাঁদের চোখের সামনেই ফাইল-বন্দী একগাদা টাইপ করা কাগজ কর্নেল হাণ্ট মেজর ফুজিয়ারার হাতে তুলে দিয়ে স্যালুট জানালেন। ঐ কাগজগুলিতে পঁয়তাল্লিশ হাজার ভারতীয় যুদ্ধবন্দীর নাম, ক্রমিক সংখ্যা ও পদমর্যাদাসহ বিস্তৃত বিবরণ উল্লেখ ছিল।

গুচ্ছ-কাগজ হাতে নিয়ে মেজর ফুজিয়ারা স্বয়ং এবার মাইক্রোফোনের সামনে এসে গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন : জাপ সরকারের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সকলকে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে গ্রহণ করছি।

মেজর ফুজিয়ারার সংক্ষিপ্ত এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক বাহিনীর ব্যাণ্ড বেজে উঠল। ফুজিয়ারা একটু থামলেন। দণ্ডায়মান

সেনাবাহিনী উৎকণ্ঠিতভাবে মেজর ফুজিয়ারার দিকে তাকিয়ে। আরও কী যেন তিনি বলতে চান।

ব্যাণ্ডের বাজনা থামল। মাইক্রোফোনটা আরও কাছে টেনে নিয়ে মেজর আবার সরব হলেন। বিরাট বাহিনীর উদ্দেশ্যে বললেন. জাপান সরকারের পক্ষে একটু আগেই আমি আপনাদের নিয়ন্ত্রণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আপনারা এতদিন বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আপনারা সকলেই ভারতীয়। ভারতবর্ষ আপনাদের জন্মভূমি। এবার আমি আপনাদের দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণভার তুলে দিচ্ছি দক্ষ সর্বাধিনায়ক ক্যাপটেন মোহন সিং-এর হাতে। তিনি নিজেও ভারতমাতার এক নির্ভীক সন্তান। এখন থেকে তিনিই আপনাদের নেতা, আপনাদের নিয়ন্ত্রা। তাঁর নির্দ্দেশ আপনারা মেনে চলবেন—এই কামনা।

আবার সামরিকবাদ্য বিউগ্যল বেজে উঠল। চারিদিকে হর্ষধ্বনি। যুদ্ধবন্দী হস্তান্তরের আনুষ্ঠানিক সরকারী কাজ শেষ। মেজর ফুজিয়ারা এবার সেনা বাহিনীর উদ্দেশ্যে কিছু রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন ঃ

এশিয়ার মানুষ দীর্ঘকাল ধরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদতলে দলিত। তাদের মুক্তির উদ্দেশ্যেই জাপানের এই সমরাভিযান। জাপান এশিয়াবাসীর মুক্তিদাতা বন্ধু।

জাপান পূর্ব এশিয়াকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে আগ্রহী। জাপান চায়, পূর্ব এশিয়ার সকল দেশই সমভাবে উন্নত ও সমৃদ্ধ হোক—সাম্য ও স্বাধীনতা সকলের মূল লক্ষ্য।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হরণ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে শাসন শোষণের জাল বিস্তার করে রেখেছে, তা ছিন্নভিন্ন করে মহান ভারতবর্ষকে মুক্ত করতেই হবে।

সেই মহান কাজে ভারতীয়দেরই ব্রতী হতে হবে। তাদের এই অভীষ্ট লাভে জাপান সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতায় প্রস্তুত। সুতরাং

ভারতীয় হিসাবে আপনারা মাতৃভূমির মুক্তিযুদ্ধের জন্য শেষ রক্তবিন্দু দেবেন—এটাই জাপান দেখতে চায়।

পরাজিত বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভারতীয় সেনাদের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব নিতে গিয়ে জাপানী মেজর ফুজিয়ারা যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, অধিকাংশ সেনাই তার সারমর্ম বুঝতে পারল না। কারণ ফুজিয়ারা তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন জাপানী ভাষায় এবং তা ছিল ভারতীয় সেনাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা। একজন জাপানী অফিসার ফুজিয়ারার বক্তব্য ইংরাজিতে অনুবাদ করে শোনালেন। পরে ইংরাজি থেকে সহজ সাবলীল ভাবে হিন্দিতে মেজর ফুজিয়ারার বক্তৃতা সাধারণ সেনাদের কাছে তুলে ধরলেন কর্নেল এন, এস গিল। কর্নেল গিলও ছিলেন বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। মালয় সিঙ্গাপুর রণাঙ্গণে তিনিও জাপ বাহিনীর হাতে ধৃত হন। পরে অবশ্য কর্নেল গিল আজাদ হিন্দ ফৌজের এক অন্যতম সমরনায়করূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ফুজিয়ারার বক্তব্য শুনে অভিজ্ঞ সেনাদের মানসিকতার পরিবর্তন হল। জাপ-সেনা বা কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে এতোদিন তাদের যে ভুল বুঝানো হয়েছিল, এবার তারা তা বুঝতে পারল। এবং ফুজিয়ারার নির্দ্দেশ ও অনুরোধে তাঁরা মাতৃভূমির মুক্তিযুদ্ধের সামিল হতে আরও বেশী উৎসাহ পেল।

মেজর ফুজিয়ারার বক্তৃতা শেষে উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপটেন মোহন সিং। একটু আগেই মেজর ফুজিয়ারা ঘোষণা করেছেন, ধৃত সব সেনাদের দায়িত্ব ও নেতৃত্বভার তিনি তুলে দিয়েছেন ক্যাপটেন মোহন সিং-এর হাতে। তাই মোহন সিং উঠে দাঁড়াতে আবার সামরিক বাদ্য বেজে উঠল। তিনি প্রতীক্ষারত সেনা বাহিনীর অভিবাদন নিলেন। তারপর মাইক্রোফোনের সামনে এগিয়ে গিয়ে সরল হিন্দিতে সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে বললেন: বৃটিশ উৎপীড়নের দিন ফুরিয়ে এসেছে! এবার তাদের ঘৃণ্য শাসন ও শোষণের অবসানের

পালা। জাপানী বাহিনী আর ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সহযোগিতায় বৃটিশ বাহিনী সিঙ্গাপুর আর মালয় থেকে বিতাড়িত। বিদেশী বৃটিশ শাসকরা পশ্চাদপসরণ করে এখন ব্রহ্মদেশে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লগ্ন আসন্ন। যেসব দানব এতদিন ধরে ভারতীয়দের হৃদয়-শোণিত শোষণ করেছে, আমাদের পবিত্র কর্তব্য সেইসব নরপিশাচদের ভারতবর্ষের পবিত্রভূমি থেকে বিতাড়িত করা। আমাদের বহু বাঞ্ছিত সেই স্বপ্ন সফল করতে জাপানীরা সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দিযেছেন। এখন আমাদেরও কঠিন দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব হল চল্লিশ কোটি দেশবাসীর মুক্তির জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। পরাধীন ভারত মাতার শৃঙ্খল মুক্তির যে সুবর্ণ সুযোগ আমাদের হাতের মুঠোয়, তা আর আমরা হেলায় হারাতে পারি না। স্বদেশ মাতৃকার বন্ধন মুক্তির পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে দক্ষিণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অসামরিক ভারতীয়রা এবং বৃটিশ বাহিনী ছেড়ে আসা ভারতীয় সেনাদের নিয়ে এক বিরাট ব্যাপক ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গড়ে তুলল। এই বাহিনী এগিয়ে যাবে মাতৃভূমি ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধে। সেই আদর্শ আর নতুন রণকৌশল গ্রহণ করে এগিয়ে যাব স্বদেশ ভূমির উদ্দেশ্যে।

মোহন সিং-এর বক্তৃতা শেষে ফারার পার্কে সেনাদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা আর উৎসাহ দেখা দিল। ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনিতে চারদিক মুখর হল। বৃটিশদের প্রতি ভারতীয় সেনাদের যে কী গভীর ঘৃণা ছিল, স্বতঃস্ফূর্ত হাততালি আর হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পেল। সাধারণ সেনাদের মধ্যে মোহন সিংএর বক্তৃতা বিপুল সারা জাগালেও অফিসার মহলে বোধহয় ততটা বিশ্বাস বা প্রেরণার জোয়ার জাগাতে পারল না। সেদিনের পরিস্থিতি এবং পরিবেশ সম্পর্কে অন্যতম সেনাপতি শাহনওয়াজ খানের অভিজ্ঞতার কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

তিনি লিখেছেন: বিশেষ করে অফিসার শ্রেণীর লোকেরা ক্যাপটেন মোহন সিং-এর কথায় একেবারে সায় দিতে পারলেন না। এই বক্তৃতা শুনে আমরা একেবারে হতভম্ভ হয়ে গিয়েছিলাম। গবাদি পশুদের যেমন হস্তান্তরিত করা হয়, তেমনি করে বৃটিশদের হাত থেকে জাপানীদের হাতে এবং জাপানীদের হাত থেকে ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর হাতে এসে আমরা কয়েকজন অফিসার নিজেদের বড অসহায় মনে করতে লাগলাম।

বৃটিশরাজ ও বাহিনীর প্রতি অনুগত মেজর শাহনওয়াজ খান তখনও পর্যন্ত নতুন পরিবেশ আর কর্তাব্যক্তিদের মনোভাবের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও অবশ্য প্রকাশ্যে ক্যাপটেন মোহন সিং-এর বিরোধীতা করার মত সাহস তাঁর বা তাঁর অনুগামীদের ছিল না। তাই মনের ক্ষোভ আর সন্দেহ মনে চেপে রেখে পরবর্তী গতিপ্রকৃতির দিকে নজর রাখতে লাগলেন।

সিঙ্গাপুর বৃটিশ বাহিনীর হাত ছাড়া হয় ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ মধ্যরাত্রে, আর তার পরদিনই জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো সিঙ্গাপুর বিজয় উপলক্ষে যে ভাষণ দিলেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক। তিনি টোকিও থেকে বেতার ভাষণে বললেন: বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্ব আর নয়। পূর্ব এশিয়ার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব করবেন এশিয়ারই জনগণ। বৃটিশের শাসন-শোষণ চিরতরে বন্ধ করার জন্য এশিয়াবাসীকে জাগতে হবে—সতর্ক থাকতে হবে, তার জন্য প্রয়োজনে বৃহৎ সংগ্রাম; এমন কি যুদ্ধের মোকাবিলাও করতে হবে। ওদিকে সিঙ্গাপুর পতনের পর জাপানে বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং আতঙ্ক দেখা দিল। তারা ভাবল, ভারতের উপর নির্মম অভিযান চালিয়ে জাপ সেনারা হয়তো বৃটিশের স্থান অধিকার করতে আগ্রহী। টোকিওতে প্রবাসী ভারতীয়রা মহা উদ্বেগের মধ্যে এক বৈঠক করলেন। সেখানে স্থির সিদ্ধান্ত হল, ভারতীয় নেতাদের উদ্দেশ্যে তারা আবেদন রাখবেন, জাতীয় স্বার্থে যাতে তাঁরা জাপানের

বৃটিশ বিরোধী অভিযানের সমর্থক হন এবং ভারতবর্ষের মুক্তি লাভের সুবর্ণসুযোগ হাতের মুঠোয় তুলে নেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে জাপানে বসবাসকারী বিপ্লবী রাসবিহারী বসু সেসময় একাধিক বেতার ভাষণ দেন। ১৯৪২ সালের ২৩ মার্চ তদানীন্তন ভারতের অন্যতম বিপ্লবী বীর সাভারকারের উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে আবেদন রেখে তিনি বলেন: বৃটেন এখন চরম বিপর্যয়ের মুখে— একথা আজ সকলেরই জানা। তার এই বিপর্যয় এবং বিপদ ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। জাপান এবং তার মিত্র শক্তি, বৃটেনের শত্রু। সুতরাং বৃটিশের শত্রু শিবির প্রকারান্তে ভারতবর্ষের বন্ধুতুল্য। সেদিকটা বিবেচনা করে ভারতীয় নেতারা যেন কার্যক্রম গ্রহণ করেন। বিপ্লবী রাসবিহারী শুধু ভারতবর্ষের জাতীয় নেতাদের উদ্দেশ্যে তাঁর পরামর্শ আর আবেদন পাঠিয়েই ক্ষান্ত রইলেন না। এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে ভারতের মুক্তি আন্দোলন জোরদার করার জন্যও তিনি সক্রিয় হলেন।

সুদীর্ঘকাল জাপানে বসবাস করার ফলে জাপ সরকারের পদস্থ অফিসার এবং নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বৃটিশ বিরোধী ভারতীয় নেতারূপেই তিনি তাঁদের কাছে পরিচিত ছিলেন। তাই রাসবিহারী বসুর বেতার ভাষণ এবং উদ্যোগ আয়োজনে জাপ কর্তৃপক্ষ উৎসাহ বোধ করলেন। তিনি জাপানের কর্তা ব্যক্তিদের বুঝালেন, ভারতবর্ষের মুক্তি ব্যতীত বহুকাঙ্ক্ষিত 'মুক্ত-এশিয়ার' স্বপ্ন সফল করা সম্ভব নয়। রাসবিহারীর উদ্যোগ অত্যন্ত সফল হল। কিছু দিনের মধ্যে জাপ প্রাধনমন্ত্রী তোজো ঘোষণা করলেন: জাপানের মানুষ দেখতে চায়, ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বতোভাবে সাহায্য ও করতে তাঁর দেশ সর্বদা গভীর আগ্রহী। পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি জাপান সরকার ও তার জনগণের নৈতিক সমর্থন আছে, এ বিষয়ে যেকোন সাহায্য দিতে তাঁরা উৎসাহী।

বেতার ভাষণে জেনারেল তোজো বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে আহ্বান জানিয়ে আরও বলেন, তাঁরা যদি পূর্ব এশিয়ার জাপ অধিকৃত দেশ-সমূহের প্রবাসী ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বৈঠক ডাকেন, তবে তাঁর দেশ ও সরকার তাতে সক্রিয় সাহায্য করতে প্রস্তুত। ঐ ধরনের বৈঠকে বসে বৃটিশ পদানত পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রাম এবং পূর্ব এশিয়ায় তার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। তাতে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের কর্ম প্রচেষ্টা আরও ব্যাপকতর করে তোলাও সম্ভব।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর বেতার ভাষণ, ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলন নিয়ে তাঁর আগ্রহ, জাপানের তথা পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়রা অত্যন্ত উৎসাহবোধ করলেন। রাসবিহারী বসু আর কালক্ষেপ না করে জাপানের রাজধানী টোকিও সহরের প্রাণকেন্দ্র সানা হোটেলে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর মালয়-সিঙ্গাপুর শ্যাম প্রদেশ বোর্নিও থাইল্যাণ্ড সহ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বৈঠকের প্রস্তুতি নিলেন। রাসবিহারী বসু ১৯৪২ সালের মার্চের শেষ সপ্তাহে টোকিওর সানা হোটেলে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সদর দপ্তরে যখন বৈঠক ডাকেন, তার অনেক আগে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ভাবে পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেই প্রায় স্বাধীনতা সংঘ গড়ে উঠেছে। তাই তাদের সকল প্রতিনিধিদের নিয়ে ডাকা টোকিওর ঐ বৈঠককে প্রবাসী ভারতীয়রা সকলেই স্বাগত জানালেন।

জাপানের সরকারী কর্তৃপক্ষ ছাড়াও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বিপ্লবী রাসবিহারীকে খুব শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতেন। তাঁরাও চেয়েছিলেন রাসবিহারী বসুই পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব নিন। তাই টোকিও সম্মেলনের মাত্র দিন কয়েক আগে ২০ মার্চ

১৯৪২ জাপানের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর এক সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করলেন। সেই সভায় তাঁরা বৃটিশ-বিরোধী বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর রাজনৈতিক জীবনের প্রশংসা করেন এবং ভারতবর্ষের পরবর্তী আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সহায়তার আশ্বাস দেন।

কেউ কেউ মনে করেন, রাসবিহারী বসুর হাতে টোকিও সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা যাতে নেতৃত্বভার তুলে দেন, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই প্রভাবশালী জাপানী নাগরিকদের একাংশ এই সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। তখনও পর্যন্ত জাপ কর্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রকে পূর্ব এশিয়ার নেতৃত্বভার দিতে প্রস্তুত ছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ সুভাষচন্দ্রের প্রতি জাপ কর্তৃপক্ষ শ্রদ্ধাশীল হলেও, জাপানের প্রতি তাঁর সঠিক মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন না। তাছাড়া আপোষবিহীন সুভাষচন্দ্রের শোষণ বিরোধী মনোভাব এবং নিদারুণ ব্যক্তিত্বকে হয়তো জাপ কর্তৃপক্ষ কিছুটা ভয়ও করতেন।

যাইহোক—মার্চের শেষ সপ্তাহে টোকিওতে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের বৈঠক বসল। রাসবিহারী বসু, ডি এস দেশপাণ্ডে, এ এম নায়ার, বি ডি গুপ্ত, সি লিওম্যান, এস এন সেন, রাজ সেরম্যান, এল আর মিগলানি এবং কে, ভি, নারায়ণ জাপানের ভারতীয়দের পক্ষ থেকে বৈঠকে উপস্থিত থাকলেন। ডি এন খান এবং এম আর মল্লিক এলেন হংকঙের প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতিনিধি হয়ে। সাংহাই থেকে এলেন পিয়ারা সিং এবং ও আসমান। মালয় ও সিঙ্গাপুর থেকে প্রতিনিধিরূপে এলেন যথাক্রমে এন রাঘবন এবং এস সি গুহ, ও কে পি কে মেনন। ক্যাপটেন মোহন সিং এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল পিল বৈঠকে শুভেচ্ছা মিশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত হলেন।

টোকিও বৈঠকের শুরুতেই এক দুঃসংবাদ সকল প্রতিনিধিদের উদ্বিগ্ন করে তুলল। তাঁরা খবর পেলেন, ঐ সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু চার

ভারতীয় বিপ্লবী, প্রীতম সিং, সত্যানন্দ পুরী, কে এন নায়ার এবং ক্যাপটেন মোহম্মদ আক্রাম এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। উপস্থিত প্রতিনিধিরা শোকাহত হলেন। স্বদেশ মুক্তির মহান যজ্ঞে যেখানে শত সহস্র বীর যোদ্ধার জীবনদানের প্রয়োজন সে কথার উল্লেখ করে দুর্ঘটনায় নিহত বীর যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হল।

বৈঠক বসল। কিন্তু শুরুতেই প্রতিনিধিদের একাংশের মধ্যে রাসবিহারী বসুকে নেতা নির্বাচন নিয়ে সংশয় দেখা দিল। রাসবিহারী বসুর হাতে নেতৃত্বদানে জাপ কর্তৃপক্ষের আগ্রহে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হল। প্রতিনিধিদের অনেকের কাছেই রাসবিহারী বসু তখনও পর্যন্ত ততটা পরিচিত ছিলেন না। তাঁর কার্যকলাপ, রাজনৈতিক তৎপরতা ও নেতৃত্ব সম্বন্ধে সাধারণভাবে একটা সন্দেহ প্রায় সকল প্রতিনিধির মনেই উঁকিঝুঁকি দিল। এছাড়া কয়েকজন প্রতিনিধি যখন জানতে পারলেন, প্রায় ত্রিশ বছর ধরে রাসবিহারী জাপানে বসবাস করছেন, এবং তাঁর সহধর্মিণীও এক জাপানী মহিলা, তখন তাঁদের মনে সন্দেহটা যেন একটু বেশী ঘনীভূত হল। সকলেই প্রায় ধরে নিলেন, ভারতীয় হলেও রাসবিহারীর আনুগত্য ভারতের থেকেও জাপানের প্রতি বেশি। তিনি জাপানের হাতের পুতুল মাত্র, তাই রাস বিহারীর হাতে নেতৃত্বভার তুলে দিতে কমবেশী সকলকেই সংশয় প্রকাশ করতে দেখা গেল।

টোকিও বৈঠকে শেষপর্যন্ত চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হল না। কোনও প্রতিনিধি বললেন, থাইল্যাণ্ড সহ কয়েকটি এলাকার প্রতিনিধিরা টোকিও বৈঠকে অনুপস্থিত। তাই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আরও ব্যাপক আকারে একটি বৈঠক ডেকে পরবর্তী কালে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যবস্থা হোক। এছাড়া জাপানের সহযোগিতা নেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত হবে, জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা

তা কতখানি অনুমোদন করবেন—ইত্যাদি বিষয়েও প্রশ্ন দেখা দিল। শেষঅবধি স্থির হল, তিন মাস পর অর্থাৎ ১৯৪২-এর জুনে ব্যাঙ্ককে দ্বিতীয় বৈঠকে আরও বিস্তৃত আলোচনার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

স্থির হল, ব্যাঙ্ককের বৈঠক বসবে জুনের ১৫ তারিখে। চলবে নয় দিন অর্থাৎ ২৩ তারিখ পর্যন্ত। প্রস্তাবিত ঐ বৈঠককে আরও ব্যাপক করার জন্য আলোচনা হল। টোকিও বৈঠকে যেসব দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকতে পারেন নি, তাদেরও যাতে আনা সম্ভব হয়, তার জন্য যোগ্য ব্যবস্থা হল। টোকিও বৈঠকে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্বামী সত্যানন্দ পুরী প্রীতম সিং সহ থাইল্যাণ্ড থেকে যাঁরা যাত্রা করেছিলেন, বিমান দুর্ঘটনায় তাঁদের মৃত্যু হওয়ায় সেখানকার প্রতিনিধিদের উপস্থিতির কথাও বিশেষ ভাবে আলোচিত হল। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যাতে ব্যাঙ্কক বৈঠকে স্বাধীনতা সংঘের সংবিধান ও বিভিন্ন কর্মসূচী নেওয়া সম্ভব হয়, সেদিকটায় বিশেষ দৃষ্টি রাখা হল। টোকিও বৈঠক খুব তাড়াহুড়া করে ডাকা হওয়ায় সকলকে ঐ বৈঠকে আনা সম্ভবও হয়নি। তাই ব্যাঙ্ককে যাতে জাপান, সংহাই, হংকং, ফিলিপাইন, বোর্নিও, জাভা, সুমাত্রা, মালয়, বার্মার ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে যুদ্ধবন্দী প্রতিনিধিদেরও যাতে উপস্থিত রাখা যায় তা নিয়েও আলোচনা হল।

টোকিও বৈঠকে মোটামুটি ভাবে স্বাধীনতা সংঘের সংবিধানের একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরী হল। সকলেই একমত হলেন যে ব্যাঙ্কক বৈঠকেই সংঘের সাংবিধানিক দিক ও পরবর্তী কর্মসূচী স্থির করে দেখতে হবে। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা সংঘের সাংগঠনিক দিক জোরদার করার গুরুত্ব সকলে অনুধাবন করলেন।

টোকিও বৈঠক স্থির করলেন, পরবর্তী কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার জন্য পাঁচ সদস্য নিয়ে একটি 'কাউন্সিল অব অ্যাকশান' গঠন

করবেন। ঐ কাউন্সিলই হবে স্বাধীনতা সংঘের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিচালক-পরিষদ। তাঁরা সবদিক খতিয়ে দেখে যেকোনও সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত রূপ দেবেন।

প্রস্তাবিত কাউন্সিল অব অ্যাকশন অর্থাৎ শীর্ষ পরিচালক পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হলেন রাসবিহারী বসু। আর চারজন সদস্য যথাক্রমে কে, পি, কে, মেনন, মেজর মোহন সিং, এন, রাঘবন এবং লেফটানেন্ট কর্নেল জি, ও, গিলানি।

মার্চের শেষ সপ্তাহে টোকিও বৈঠক শেষ হল। প্রতিনিধিরা যে যার দেশে ফিরলেন। তিন মাস পর জুনে আবার তারা ব্যাঙ্ককে মিলবেন। সেখানে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের পরবর্তী বৈঠক। কিন্তু তার আগেই ভারতবর্ষ থেকে নানা সংবাদ তারা পেতে লাগলেন। সারাদেশের মানুষ তখন বৃটিশের নাগপাশ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় অধীর। ইংরাজ শাসনের অবসান দাবি করে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার দাবীতে মুখর। দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জাতীয় কংগ্রেস, জাগ্রত দেশবাসীর চেতনাবোধকে স্বাগত জানিয়ে সুষ্ঠ সংহত ভাবে আন্দোলন পরিচালনা করতে উদ্যোগী।

১৯৪২-এর ১ মে। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি এক ঐতিহাসিক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তাতে বলা হল—ইংরাজ ভারত ত্যাগ না করলে ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা হবে।

জাতীয় কংগ্রেসের ঘোষণায় ইংরাজ সরকার বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হল। দেশব্যাপী চলল ধরপাকর। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ আন্দোলন ও জাগ্রত জনতার দাবীসমূহ সুদূর পূর্ব এশিয়ার জাপ অধিকৃত দেশগুলির বেতার থেকে নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা হল। এই সংবাদ প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করল। স্বাধীনতা সংঘের নেতারা এই সুযোগের অপব্যবহার করলেন না। পূর্ব-এশিয়ার সকল প্রান্তে তাঁরা স্বাধীনতা সংঘ আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

দেশ এবং বিদেশের চারদিকে যখন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ, সেই পরিস্থিতিতে ব্যাঙ্কক বৈঠকের প্রস্তুতিও জোর কদমে এগিয়ে চলল।

ঐতিহাসিক ব্যাঙ্কক বৈঠক। পূর্ব এশিয়ার সকল দেশের ভারতীয় প্রতিনিধিরা উপস্থিত হলেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো সহ বিদেশমন্ত্রী ঐতিহাসিক বৈঠকের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছাবাণী পাঠালেন। এছাড়া জার্মান সরকারের মন্ত্রী-প্রতিনিধি ডঃ ই, ওয়েগুলার এবং ইতালীর মন্ত্রী-প্রতিনিধি সিগনর গুইডো ফ্রোলা বৈঠকে উপস্থিত থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতিকে স্বাগত জানিয়ে নিজ নিজ সরকারের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার কথা ঘোষণা করেন।

ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে মোট পয়ত্রিশটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব ব্যাঙ্কক বৈঠকে গৃহীত হল। এক প্রস্তাবে সিদ্ধান্ত হল—পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের মুক্তির জন্য সংগঠিত সংঘগুলি ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের আওতায় আসবে। এছাড়া টোকিও বৈঠকে সংঘের সংবিধানের যে খসড়া তৈরী করা হয়েছিল, ব্যাঙ্কক বৈঠকে গণতান্ত্রিক পথে তারও চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হল।

ব্যাঙ্কক বৈঠকে সর্বমোট পঁয়ত্রিশটি প্রস্তাব গৃহীত হলেও, একটি প্রস্তাবে বলা হয়, ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ অবিলম্বে বিরাট এক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হোক। প্রস্তাবিত সেনা-বাহিনীর নাম হবে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'। ভারতীয় সেনা এবং প্রয়োজনে প্রবাসী বেসামরিক ভারতীয়দের মধ্য থেকেও উক্ত ফৌজের জন্য লোক নিয়োগ করা হোক।

এখানে উল্লেখ্য, টোকিও বৈঠক শেষে ক্যাপটেন মোহন সিং স্থির করে ফেলেছিলেন, এটাই উপযুক্ত সময়। তাই তিনি টোকিও থেকে ফিরে পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় সামরিক বাহিনী গড়ায় উদ্যোগী হলেন। সিঙ্গাপুরে জাপ সেনাবাহিনীর হাত থেকে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের

দায়িত্ব বুঝে নিয়ে তিনি আগেই সিঙ্গাপুরের 'মাউণ্ট প্লেজাণ্ট' নামক স্থানে তাঁর সদর দপ্তর খুলেছিলেন।

প্রায় সাতদিন বৈঠক চলার পর ১লা জুলাই প্রতিনিধিরা এক গুরুত্ব-পূর্ণ আলোচনা শুরু করলেন। স্থির হল, টোকিও বৈঠকে স্বাধীনতা সংঘ পরিচালনার জন্য পাঁচ সদস্যের শীর্ষসমিতি 'কাউন্সিল অব অ্যাকশান' গঠন করা হয়েছে, তার সদস্যদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করে সুনির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে। হলও তাই। অনেক পরামর্শ সুপারিশের পর—অর্থ, যোগাযোগ, পরিবহন, শিক্ষা ও গোয়েন্দা দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হল কাউন্সিলের সভাপতি রাসবিহারী বসুর হাতে। কে, পি, মেনন পেলেন তথ্য ও প্রচার দপ্তরের দায়িত্ব। ত্রাণ চিকিৎসা ও বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ভার নিলেন এন, রাঘবন। লেফটান্যান্ট কর্নেল গিলিয়ানির উপর অর্পিত হল সামরিক বিভাগের ভার আর ক্যাপটেন মোহন সিংকে নির্বাচিত করা হল প্রস্তাবিত আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক।

৯ই জুলাই। ব্যাঙ্কক বৈঠকের শেষ দিন। এদিনের বৈঠকে ভারত-বর্ষে কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের ব্যাপক প্রস্তুতি ও তার সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা চলল। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন তীব্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে ইংরাজ সরকার যে তীব্র দমন নীতির আশ্রয় নেবে, বৈঠকে উপস্থিত প্রতিনিধিদের তা অনুমান করতে অসুবিধা হল না। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে যখন গণ-আন্দোলনে বিদেশীশক্তি বিপর্যস্ত ও বিব্রত হবে, তখন পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়ও স্বাধীনতা সংঘের তৎপরতা ব্যাপকতর করা হবে। ঘরে বাইরে সর্বত্র বৃটিশবিরোধী শক্তি কাজে লাগিয়ে বিদেশী শাসকদের হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হবে।

এ প্রস্তাবে সকলেই সায় দিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সদস্যই নিজ নিজ বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্তব্য করলেন, ভারতবর্ষের বাইরের যেকোন

সংগ্রাম বা যুদ্ধ পরিচালিত হবে, ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশিত পথে। এ প্রসঙ্গে কাউন্সিল অব অ্যাকশনের অন্যতম সদস্য রাঘবন এক প্রস্তাব তুলে বললেন, ভারতবর্ষের সঙ্গে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সংগ্রামী ভারতীয়দের সঙ্গে একটা সংযোগসেতু রাখা যেমন প্রয়োজন—তেমনি প্রয়োজন ভারতীয় যোদ্ধাদের মধ্যে প্রত্যেকটি সংবাদ বিনিময় করা। তিনি তাই স্বাধীনতা সংঘের প্রচার দপ্তরের মাধ্যমে প্রতিদিন একটি সংবাদ বুলেটিন প্রকাশের সুপারিশ করলেন। তাঁর সুপারিশে সকল প্রতিনিধি সায় দিলেন। তারপর থেকে প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য প্রতিদিন একটি করে সংবাদ বুলেটিন প্রকাশ হতে লাগল। আর ভারতবর্ষের গণ-আন্দোলন এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সংগ্রাম ও যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একাধিক বেতার-কেন্দ্রের সাহায্য নেওয়া হল। এভাবেই পরাধীন ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের ভারতীয় মুক্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী সুসংহত ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে উঠল।

ব্যাঙ্কক বৈঠক যখন শেষ হল, ভারতবর্ষের আকাশে তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের ঝড় পুঞ্জীভূত। জাতীয় কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাব মতো ভারতবাসীদের পক্ষে মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। বিদেশী শাসকদের উদ্দেশ্যে বললেন: "কুইট ইণ্ডিয়া"—ভারত ছাড়ো।

মহাত্মাজীর রণহুঙ্কারে কেঁপে উঠল বৃটিশ শাসনের ভিত। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ জালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বাইরে যখন বিপর্যস্ত, ভারতবর্ষেও তখন তার এক দুঃসহ অবস্থা। কিন্তু তাতেও তারা দমল না। মদমত্ত বিদেশী শাসকদল ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর উপর। প্রথম দফায় মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সহ, জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের গ্রেপ্তার করে কারান্তরালে পাঠানো হল। ইংরাজ শাসকদের স্পর্দ্ধিত ঐ

ব্যবস্থায় দেশে বিক্ষোভের বহ্নি জ্বলে উঠল। চারদিকে একই ধ্বনি : ইংরাজ তুমি ভারত ছাড়ো। স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অভূতপূর্ব প্রকাশ! দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন তীব্রতর হল। প্রতিবাদ প্রতিরোধ, বিক্ষোভ বিদ্বেষে সারাদেশ জেগে উঠল। শাসক শ্রেণীও বসে রইল না। স্বাধীনতার দাবী যত প্রবল হল, তারাও মরীয়া হয়ে উঠল। কাতারে কাতারে গ্রেপ্তার করেও বিদেশী শাসক নিশ্চিত থাকতে পারল না। বৃটিশ সেনারা নগর গ্রাম গঞ্জে পাইকারী হারে গুলিগোলা চালাল। হাজার হাজার মুক্তিকামী মানুষ মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ল। ক্ষুব্ধ ভারতাত্মা তাতেও শান্ত হল না। সারা ভারত জুড়ে মৃত্যুঞ্জয়ের মুক্তিগান শুরু হল। দিশাহারা বিদেশী শাসক ভারতবাসীর মৃত্যুজয়ী শপথের ব্যাপকতা দেখে বিস্ময়ে বিচলিত হল। ১৯৪২-এর ১২ আগস্ট, ব্যাঙ্কক ক্রনিকাল নামক পত্রিকায় জার্মান থেকে পাঠানো সুভাষচন্দ্র বসুর সংক্ষিপ্ত বাণী প্রচার করা হল। তাতে তিনি লিখলেন : আমাদের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামের সিংহনাদ শোনা যাচ্ছে। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকেই সর্বস্ব ত্যাগের মধ্যে দিয়ে ঐ স্বাধীনতা সংগ্রামকে সফল করতে হবে। পরদিন ১৫ আগস্ট ঐ পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করে বলা হল, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পাঁচশ নিহত ও কম করে তিন হাজার আহত।

শুধু দেশে নয়, বিদেশেও চলল তার প্রতিক্রিয়া। তখন যে বৃটিশ বাহিনী ছিল, তার ভারতীয় সেনারা মহাত্মা গান্ধী সহ অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর বৃটিশ সরকারের নিপীড়ন আর দমনের খবর পৌঁছুতে লাগল, তখন সেখানে দারুণ উত্তেজনা দেখা দিল। মালয়েও উত্তেজনা দেখা দিল। মালয়-সুমাত্রা, সাংহাই-এর বিভিন্ন নগরে বৃটিশ বিরোধী বিক্ষোভ

মিছিল আর সভা শুরু হয়।

পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রবাসী ভারতীয়রাও বিক্ষোভ আর প্রতিবাদ মিছিলে মুখর হল। ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সংবাদ বুলেটিন প্রতিদিন ভারতবর্ষের সর্বশেষ পরিস্থিতি ও এশিয়ায় তার প্রতিক্রিয়ার সংবাদ প্রচার শুরু করল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে এবং বৃটিশের দমন নীতির বিরুদ্ধে দক্ষিণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ব্যাপক জনমত সৃষ্টি হল। সেই উত্তেজক পরিস্থিতি আর অভাবনীয় সমর্থন সহানুভূতির মধ্যে ক্যাপটেন মোহন সিং খুঁজে পেলেন এক নতুন ইতিহাসের হাতছানি। তিনি বেশ বুঝলেন, এখনই আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ার ঐতিহাসিক লক্ষ্য তাঁর হাতের মুঠোয়। ঝানু যোদ্ধা আর রণ-কৌশলী ক্যাপটেন মোহন সিং এই সুবর্ণ সুযোগ আর হাত ছাড়া করলেন না।

ব্যাঙ্কক বৈঠকে আগে থেকেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল, পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য বিরাট এক সেনাবাহিনী গড়ে তোলা হবে, আর তার নামকরণ হবে আজাদ হিন্দ ফৌজ। ব্যাঙ্কক বৈঠকের আগে পর্যন্ত প্রায় বিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবী প্রস্তাবিত আজাদী ফৌজে যোগ দেওয়ার জন্য নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করেছিল। তাই আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ঐ বিশ হাজার স্বেচ্ছা-সেবী এবং সাধারণ কর্মীদের দুই ভাগে ভাগ করা হল। উদ্দেশ্য, স্বেচ্ছাসেবীদের ভিন্নভাবে তৈরী করা। শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তাদের সেনাজীবনের বিভিন্ন দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা।

আজাদী বাহিনী গড়ার খবর যখন সংবাদ হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, তখন প্রবাসী ভারতীয় এবং তার সমর্থকদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিল। এবং আজাদী বাহিনীতে নাম লেখাতে তরুণ যুবাদের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া পড়ল। দেখতে দেখতে বিয়াল্লিশের জুলাই এবং আগস্ট শেষ হতে চলল। ব্যাঙ্কক সম্মেলনের শেষে ঘটনার পর ঘটনা। অগাস্টের শেষে, প্রায় চল্লিশ

হাজার যুদ্ধবন্দীও সর্বসম্মত ভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়ে তারা ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের সামিল হবেন। এই যুদ্ধবন্দীদের সকলেই ছিলেন ভারতীয়। বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থেকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে মাত্র মাস কয়েক আগে এরা সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড, মালয় এলাকায় জাপানীদের হাতে বন্দী হন। তারপর জাপান কর্তৃপক্ষ ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের নেতা ক্যাপটেন মোহন সিং-এর হাতে এদের দায়িত্বভার তুলে দেন।

সর্বমোট ষাট হাজারের চল্লিশ হাজার দক্ষ সেনা আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্তর্ভুক্ত হলেন। চল্লিশ হাজার যুদ্ধবন্দী ছিলেন বৃটিশ বাহিনীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষ ভারতীয় জওয়ান। স্বদেশের মুক্তির স্পৃহা তাঁদেরও দারুণভাবে উৎসাহিত করল। সুদীর্ঘকাল বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে থেকে বৃটিশ নায়কদের দুর্ব্যবহার আর তাচ্ছিল্যের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদের মন প্রাণকে আগে থেকেই বিষিয়ে রেখেছিল। এবার আজাদ হিন্দ ফৌজের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা শুনে, তাঁরা অনুভব করলেন, বিদেশীর চাকুরির চেয়ে স্বদেশ সেবার মূল্য অনেক বেশি। তাই স্বদেশভূমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবনপণ সংগ্রামের জন্য তারা অধীর হয়ে উঠলেন।

চল্লিশ হাজার সেনা ও বিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গড়ে কর্তৃপক্ষ প্রথমে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচার শুরু করলেন। দিনের পর দিন সেনা শিবিরে চলল রাজনৈতিক দীক্ষা আর স্বদেশ সেবার তাৎপর্য ব্যাখ্যার পালা। স্বাধীনতা সংঘের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ সেনা শিবিরে একের পর এক ভাষণ দিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য যেমন ব্যাপক ভাবে প্রচার করতে লাগলেন, তেমনি সেনা ও স্বেচ্ছাসেবীদের মনোভাবও যাচাই করে দেখতে লাগলেন। পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য যেসব নেতা জীবন দিয়েছেন, ফাঁসির মঞ্চে হাসি মুখে প্রাণ দিয়ে যারা স্বাধীনতার গান গেয়েছেন, তাঁদের জীবনবেদ তুলে ধরে বিরাট বাহিনীর মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুললেন। সেনা ও

স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের, প্রায় সকল প্রদেশেরই লোক ছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃস্টান হলেও তারা যে সকলেই ভারতবাসী! ভারতবর্ষ যে তাদের সকলেরই মাতৃভূমি। তা স্মরণ করিয়ে সবরকম বিভেদ-বিভ্রান্তি সংস্কার ভুলে সকলকে ভারতবাসীরূপে শপথ নেওয়ার আহ্বান জানানো হল। শুধু কথা নয়, কাজেও তাঁরা তা প্রমাণ করতে লাগলেন। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টানদের একসঙ্গে বসিয়ে পান ভোজের, সকল সম্প্রদায়ের উৎসবই ঐক্যবদ্ধ ভাবে পালন করার ব্যবস্থা হল। স্বাধীনতা সংঘের নেতারা হিন্দু, মুসলমান, শিখ হয়েও একে অপরের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠলেন। এসব দেখে সেনা-স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে জাতীয় সংহতির ভাব দারুণভাবে জেগে উঠল। আজাদ হিন্দ ফৌজের শিবিরে ধ্বনিত হল এক মন এক প্রাণ একতার এক অনির্বচনীয় সুর।

জাপ বাহিনী পরাভূত বৃটিশ বাহিনীর কাছ থেকে যেসব অস্ত্রশস্ত্র অধিকার করেছিল, সুদীর্ঘ কয়েকমাস তা গুদামজাত অবস্থায় পড়েছিল। জাপ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের নেতাদের অনুরোধ জানিয়ে বললেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে অধিকৃত অস্ত্র-শস্ত্র এবং যুদ্ধবন্দীদের সহায়তায় এক ডিভিশন সেনা গড়ে তুলতে পারেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ার প্রাথমিক প্রস্তুতির খবর পেয়েই জাপ কর্তৃপক্ষ ঐ অনুরোধ জানান বলে স্বাধীনতা সংঘের নেতারা মনে করেন। বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে তখন জাপানের যুদ্ধ চলছিল। তাই আজাদ হিন্দ ফৌজে এক ডিভিশন সশস্ত্র বাহিনী গড়া এবং তার জন্য বৃটিশের কাছ থেকে উদ্ধার করা অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ায় জাপানী আগ্রহের মধ্যে হয়তো একটা কূটনৈতিক চাল ছিল। হয়তো জাপ কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির ফলে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এবং সেনাবাহিনীর উপর সেই সংবাদ দারুণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে এবং তার ফলে বৃটিশ বাহিনীর

কাছে তা হবে একটা নৈতিক আঘাতের সামিল।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ কর্তৃপক্ষও প্রস্তাবিত আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করার করার পর তার পরবর্তী কর্মপদ্ধতির ব্যাপক প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন। জাপ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার আশ্বাসে তাঁরা উৎসাহও বোধ করলেন। আজাদী বাহিনীর জন্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি অ্যাক্ট নামে তাঁরা একটি সামরিক বিধি তৈরীর জন্য উদ্যোগী হলেন। তাঁদের নির্দেশে লেফটেনাণ্ট ডি, সি, নাগ আর্মি-অ্যাক্টের খসড়া তৈরী করলেন এবং সেই সঙ্গে আজাদী ফৌজের সেনাদের হাতে, খরচার মত কিছু ভাতা দেওয়ারও সিদ্ধান্ত হল।

১৯৪২ সালের ১ সেপটেমবর ঐতিহাসিক এই দিনে আজাদ হিন্দ ফৌজের 'প্রথম ডিভিশন' সেনাবাহিনী গড়া হল। ষোল হাজার সশস্ত্র সেনা সহ প্রায় তিন শ' অফিসার ঐ ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত হন। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম ডিভিশন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হলেন ক্যাপটেন মোহন সিং। চিফ-ইন-স্টাফের দায়িত্ব পেলেন লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল কিয়ানি। প্রথম ডিভিশনের অধীন তিনটি গেরিলা রেজিমেণ্ট রাখা হল। তার নামকরণ হল যাক্রমে গান্ধী গেরিলা রেজিমেণ্ট, নেহরু গেরিলা রেজিমেণ্ট এবং আজাদ গেরিলা রেজিমেণ্ট।

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম ডিভিশন সেনাবাহিনী গঠনের পর তার কর্মতৎপরতা দারুণভাবে বৃদ্ধি পেল। যারা আজাদী বাহিনীতে যোগ দিলেন, তারা তো সামরিক শিক্ষা পেলেনই, তাছাড়া যেসব প্রবাসী ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ, তথা আজাদ হিন্দ ফৌজের আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে এগিয়ে এলেন, তাদেরও ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হল। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে মালয়ের কোয়েলামপুর এবং পেনাঙে দু'টি শিক্ষাকেন্দ্র গড়া হল। অসামরিক এবং প্রশাসনিক শিক্ষায় প্রবাসী ভারতীয়দের তৈরী করে তোলার ব্যাপক আয়োজন চলল। উদ্দেশ্য, আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত অভিযানের সামিল হয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত

অসামরিক ভারতীয়রা তাদের কাজে নানাভাবে সাহায্য ও সহায়তা করবেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজ ইতিমধ্যে এক সুসংগঠি সেনাবাহিনীরূপে প্রতিষ্ঠিত। মোহন সিং-এর নির্দেশে আজাদী বাহিনীর সেনাদের হিন্দী ভাষায় প্রয়োজনীয় হুকুম দেওয়ার রীতি প্রচলিত হল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তেরঙা পতাকাই হল আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি পতাকার প্রতীক।

১৯৪২-এর আগস্টের পর থেকে পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলন সারা দেশে প্রাণের জোয়ার আনল। প্রবাসে গড়া আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনারা প্রতিনিয়ত ভারতবর্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের খবর পান। গান্ধীজীর বাণী—'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ধ্বনি তাদের কানেও পৌঁছল। ভীত বিহ্বল ইংরাজ সরকার গান্ধী-নেহরু সহ ভারতবর্ষের সব নেতাদের রাতারাতি কারাবন্দী করে আন্দোলন দমনে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু তাতেও আন্দোলন কমল না, বরং আরও ব্যাপক হল। দেশ নেতাদের গ্রেপ্তারের খবরে সকল রাজ্যের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ ইংরাজ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করার আগে তিনি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আবেদন রেখে বললেনঃ নেতাদের আদেশের আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। নিজেদের বুদ্ধিতে যা ভাল মনে কর, করে যাও। ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কর। ভারতবর্ষের এই সংগ্রামী কাহিনী, দমন নিপীড়ন আর নেতাদের বাণী যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গড়ে ওঠা আজাদ হিন্দ ফৌজের শিবিরে গিয়ে পৌঁছতে লাগল, প্রতিটি সেনা তখন বৃটিশ-বিরোধী যুদ্ধের জন্য তৈরী। অধীর আগ্রহে তারা ভারত অভিযানের জন্য প্রতিক্ষারত।

অপর দিকে বার্লিন বেতার থেকে ভেসে আসতে লাগল নেতাজী

সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর। তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ঃ ভারতবর্ষে এগিয়ে গিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করতে হবে। ভারতের অভ্যন্তরে কারাবন্দী গান্ধীজীর আহ্বান, আর ভারতত্যাগী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বার্লিন বেতার থেকে প্রচারিত বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর আজাদী বাহিনীর প্রতিটি সেনাকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য উন্মাদ করে তুলল। আজাদ হিন্দ বাহিনী যখন ভারত-অভিযানের জন্য প্রস্তুত, ঠিক সেই চরম মুহূর্তে, আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকজন অফিসারের মনে জাপ বাহিনীর কিছু কাযকলাপ সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিল।

এছাড়াও বিভিন্ন সূত্রে তাঁরা জানতে পারলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম হোতা জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দও জাপানের রাজ্য সম্প্রসারণ নীতির ঘোর বিরোধী। তাঁরা জাপানের সহযোগীতায় ভাবী পথে এগিয়ে গেলেও, জাতীয় কংগ্রেস তথা ভারতের মানুষ হয়তো তাদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাবেন না। আজাদী ফৌজের কয়েকজন নেতার মনে এধরণের একটা দ্বন্দ্ব দেখা দিল। এ প্রসঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের তদানীন্তন অন্যতম নায়ক শাহনওয়াজ খান লিখেছেন ঃ এইসব নানা কারণে আমরা উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়লাম। কোন পথ অনুসরণ করব, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আসল কথা, জাপানীদের নিয়ে যদি আমরা ভারতবর্ষে গিয়ে উঠি, তবে দেশবাসী আমাদের অভ্যর্থনা করে নেবে, না মুখে থুথু দেবে— এ সম্বন্ধে সংশয় জাগছিল। আমাদের মনের অবস্থা যখন এরূপ, সেসময় জেনারেল মোহন সিং কর্নেল গিলকে কয়েকজন নির্বাচিত বিশ্বস্ত অফিসারসহ ব্রহ্ম সীমান্তে পাঠিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য, এঁরা গোপনে ভারতবর্ষে প্রবেশ করবেন। কথা ছিল, তাঁরা ভারতবর্ষের সংস্পর্শে এসে সেখানকার সত্যিকারের অবস্থা আমাদের জানাবেন। গোপনে সংবাদ পাঠানোর উপযোগী বেতারযন্ত্রও তাঁদের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল।

সীমান্তে উপস্থিত হবার পর দলের একজন নামকরা অফিসার

বিশ্বাসঘাতকতা করে বৃটিশদের দলে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেককে ধরিয়ে দিলেন। বিশ্বাসঘাতক ঐ নেতা ক্যাপটেন মোহন সিং-এর একজন অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। শোনা যায়, ভারতবর্ষে চলে এসে তিনি তাঁর সিঙ্গাপুর থেকে পলায়নের অনেক অলীক রোমহর্ষক কাহিনীর কথা বলেছেন। আসার সময় ঐ নেতা আজাদ হিন্দ ফৌজের অতি গোপন অনেক তথ্যপূর্ণ নথিপত্র তিনি নিয়ে আসেন।

বেচারা কর্নেল গিল, যার নেতৃত্বে নির্বাচিত কয়েকজন বিশ্বাসী অফিসার ভারতে প্রবেশ করে গোপন সংবাদ সংগ্রহের অভিযান করেছিলেন, উক্ত অফিসারের চরম বিশ্বাসঘাতকতায় সব চেষ্টা ত্যাগ করে শেষঅবধি সিঙ্গাপুরে ফিরে এলেন। তারপর থেকে জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতাদের সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। এবং ক্রমে এই অবিশ্বাস জাপ সেনা ও আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে সন্দেহ ও ভুল বুঝাবুঝির মাত্রা বাড়তে লাগল।

জেনারেল শাহনওয়াজ খানের এই স্মৃতিচারণ থেকে স্পষ্ট যে জাপ কর্তৃপক্ষ আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির পেছনে তখনও পর্যন্ত সত্যিকারের কোন যুক্তি ছিল না। কিন্তু দিন দিন এই সন্দেহ এতই প্রবল হল যে, পরস্পর এই দুই বন্ধু-বাহিনীর মধ্যে অবিশ্বাসের গাঢ় ছায়া নেমে এল। মালয়ের স্বাধীনতা সংঘের অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ রাঘবন। তিনি জাপানীদের নানা কার্যকলাপের প্রতিবাদ করায় বিয়াল্লিশের নভেম্বর মাসে জাপ সেনারা পেনাঙে তাঁর বাসভবনে রাঘবনের মত বিশিষ্ট স্বাধীনতা যোদ্ধাকে আটক রাখল। প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করল। জাপ সেনাদের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা ক্রমে মুখর হল।

আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার প্রাথমিক প্রয়াসে শেষ প্রহরে আচমকা এক সঙ্কট ঘনীভূত হল। স্বাধীনতা সংঘের কর্মপরিষদ সর্বশেষ পরিস্থিতি খতিয়ে

দেখতে সিঙ্গাপুরে এক জরুরী সভায় বসলেন। অনেক বিশ্লেষণের পর সিদ্ধান্ত হল, ব্যাঙ্কক বৈঠকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে জাপান সরকারের কাছ থেকে সুষ্টস্পভাবে জানতে চাওয়া হবে, তারা তা সরকারী ভাবে সমর্থন করেন কিনা। করলে সরকারী ভাবে তা স্বাধীনতা সংঘকে জানাতে হবে। আরও বলা হয়, দুই সপ্তাহের মধ্যে যদি জাপান সরকারের কাছ থেকে ঐ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন জবাব না মেলে, তবে স্বাধীনতা সংঘ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙে দেওয়া হবে।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো স্বাধীনতা সংঘের উদ্বেগের কথা জানতে পেরে এক বিবৃতি প্রচার করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন ঃ ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা জাপানের নেই। বরং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভেই তাঁর সরকার বিশেষ ভাবে আগ্রহী।

স্বাধীনতা সংঘের কর্মকর্তারা তোজোর ঘোষণায় খুশি হতে পারলেন না। সিঙ্গাপুরে দায়িত্বরত জাপ সরকারের প্রতিনিধি জেনারেল ইয়াকুরোর মারফৎ স্বাধীনতা সংঘ কর্মপরিষদের গৃহীত প্রস্তাবগুলি দাবী-পত্ররূপে জাপ প্রধানমন্ত্রী তোজোর কাছে পাঠালেন। তাতে তিনটি প্রধান সর্ত উল্লেখ করে বলা হল—

(ক) ব্যাঙ্কক বৈঠকের গৃহীত প্রস্তাবসমূহ সরকারী ভাবে জাপান সরকারকে অনুমোদন করতে হবে।

(খ) আজাদ হিন্দ ফৌজ ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের ব্যাপারে জাপান সরকারের বা জাপ সেনা বাহিনীর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

(গ) ভারতীয় সকল যুদ্ধবন্দীদের জেনারেল মোহন সিং-এর নেতৃত্বাধীন রাখতে হবে। জাপান সরকার এবং জাপ বাহিনীর কোনও কাজে তাতে ব্যবহার করা যাবে না।

এই দাবীর সমর্থনে জেনারেল মোহন সিং আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের নিয়ে এক বৈঠক করলেন। সেখানেও স্থির হয়,

জাপ সরকার যদি ঐ দাবীগুলি না মানেন, তবে তাঁরা আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙে দেবেন।

আজাদী বাহিনীর অফিসারদের নিয়ে যে বৈঠক করা হল, তাতে জাপানীরা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হল। তারা জানতে পারল, জেনারেল মোহন সিং-এর এই নেতৃত্ব তৈরীর পেছনে কর্নেল গিলের সক্রিয় ভূমিকা আছে এবং তিনি মোহন সিং-এর অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহচর। জাপ কর্তৃপক্ষ ১৯৪২ সালের ৮ ডিসেম্বর বৃটিশের গুপ্তচর অভিযোগে কর্নেল গিলকে অবশেষে গ্রেপ্তার করল। এর ফল হল বিষময়। আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার এবং সেনাদের মধ্যে যেমন বিক্ষোভ আর উত্তেজনা দেখা দিল, স্বাধীনতা সংঘের কর্ম-পরিষদেও তেমনি এর প্রতিবাদ উঠল। কর্ম-পরিষদের সকল সদস্য একসঙ্গে পদত্যাগ করলেন। তাঁদের ধারণা হল, জাপান সরকারের মুখ ও মনের মধ্যে কোনও মিল নেই।

ওদিকে স্বাধীনতা সংঘের কর্ম-পরিষদের সভাপতি রাসবিহারী বসু এই ঘটনাস্রোতে বিব্রত বোধ করলেন। তিনি পরিষদের সদস্যদের এবং মোহন সিংকে ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করে বললেন, জাপানে গিয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে তিনি আলোচনা করলে হয়তো ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটাতে পারবেন। কিন্তু তাঁর সেই আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতিতে কেউই খুশি হতে পারলেন না।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। রাসবিহারী বুঝলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরাট উদ্যম-উৎসাহ বিপর্যয়ের মুখে। তিনি জেনারেল মোহন সিং-এর কাছে এক জরুরী পত্র পাঠিয়ে লিখলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের উচ্চ পর্যায়ের কয়েকজন অফিসারকে তিনি যেন সিঙ্গাপুরে শ্রীবসুর বাসভবনে পাঠান। শ্রীবসু তাদের সমস্ত বিষয়টা বুঝিয়ে বলবেন।

জেনারেল মোহন সিং রাসবিহারীর পত্রের কোনরূপ গুরুত্ব দিলেন না। বরং কঠিন ভাষায় তিনি পত্রের উত্তরে লিখলেন, কোন

অফিসারই শ্রীবসুর সঙ্গে দেখা করতে রাজী নন। আর রাজী হলেও তিনি তাদের কাউকেই শ্রীবসুর কাছে পাঠাবেন না।

রাসবিহারী বসু তখনও স্বাধীনতা সংঘের সভাপতি। তাঁর মতে, আজাদ হিন্দ ফৌজের মূল দায়-দায়িত্বও তাঁর। তাই তিনি মোহন সিং-এর এই জবাবে বেশ উত্তেজিত হলেন। সিঙ্গাপুরের জাপ কর্তৃপক্ষকে ক্ষুব্ধ রাসবিহারী বসু অনুরোধ করলেন, তারা যেন অবিলম্বে জেনারেল মোহন সিংকে গ্রেপ্তার করে।

জাপ সেনারাও এতদিন জেনারেল মোহন সিং-এর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়েই ছিল। তাঁরা মোহন সিং-এর বেপরোয়া মনোভাবকে বরদাস্ত করতে পারত না। সুতরাং রাসবিহারী বসুর নির্দেশ পেয়ে তারা সেই সুযোগ হাতছাড়া করল না।

১৯৮২ সালের ২০ ডিসেম্বর জাপানী জেনারেল ইয়াকুয়ো রাসবিহারী বসুর অনুরোধ মত জেনারেল মোহন সিংকে তলব করে পাঠান এবং গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করেন।

জেনারেল মোহন সিং আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, জাপানীদের মনমত কাজ না করলে অথবা তাদের অপ্রিয় কাজের সমালোচনা করলে তাঁকে তারা গ্রেপ্তার করবে। তাই তিনি তাঁর অনুগামী অফিসার এবং সেনাদের সব বুঝিয়ে চূড়ান্ত পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। তাই জেনারেল মোহন সিংকে গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দের সেনাবাহিনী ও অফিসাররা তার প্রতিবাদে অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে দলীয় ব্যাজগুলি পর্যন্ত পুড়িয়ে দিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম হোতা এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের অগ্রণী নেতা মোহন সিংকে গ্রেপ্তারের কিছুদিনের মধ্যে সিঙ্গাপুরের কাছে 'সেণ্ট জন' দ্বীপে পাঠানো হয়। সমুদ্র-ঘেরা নির্জন নিঃসঙ্গ দ্বীপে তাঁকে একটি বাংলোয় রাখা হয়। তাঁর সঙ্গে সাতজন অফিসার দুইজন দেহরক্ষী সহ কয়েকজন আরদালি ও পাচক পাঠানো হয়। জাপ সেনাদল কর্তৃক আজাদ

হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক ক্যাপটেন মোহন সিং-এর গ্রেপ্তারের বিষময় ফলস্বরূপ বিদেশে গড়ে ওঠা বিরাট আজাদী বাহিনীর প্রথম উদ্যোগ সর্বতোভাবে ব্যহত হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজ অচিরেই ভেঙে যায়। জাপানীদের সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের ভুল বুঝাবুঝি উভয় দেশের সমর নায়কদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, তার এই পরিণতিতে দু' পক্ষই শেষপর্যন্ত হতাশ হন।

রাসবিহারী বসু তখনও অবশ্য নিজেকে স্বাধীনতা সংঘ তথা আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্তাব্যক্তি বলে ঘোষণা করতে থাকেন। তিনি দাবী তোলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙে দেওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে। অন্য কারোর নেই।

রাসবিহারীর মনে তখনও আশার আলো। তিনি তখনও ভারতবর্ষের মুক্তিবাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজকে কাগজ-পত্রে বাঁচিয়ে রেখে চলেছেন। উদ্দেশ্য, জাপ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে আজাদী ফৌজকে আরও জোরদার করা এবং ভারতবর্ষের মুক্তি অভিযানের ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের বিপর্যয়ে পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। জাপানের সঙ্গে আঁতাত এবং সমঝোতা নীতিগত প্রশ্নে আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতাদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগতির প্রথম পর্যায় ব্যর্থ হল বলা চলে। ফলে, একদিন যারা বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধের জন্য স্বেচ্ছায় আজাদী ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন, তারা নিদারুণ হতাশায় অস্ত্র ত্যাগ করলেন। প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যেও নেমে এল অনিশ্চয়তা আর হতাশার অন্ধকার।

১৯৪৩-এর জানুয়ারী মাসের প্রথম দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত চলল এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি।

অভিজ্ঞ রাজনীতিক এবং প্রবীণ বিপ্লবী রাসবিহারী বসু বুঝলেন,

এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি ভারতের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতির পক্ষে নিদারুণ হাণিকর।

২৬ জানুয়ারি। পরাধীন ভারতবর্ষের সকল মানুষ প্রতি বছর এই পুণ্য দিনে স্বদেশমুক্তির শপথ নিতেন।
তাই এ দিনটি পরিচিত ছিল স্বাধীনতা দিবসরূপে। ১৯৪৩ সালের ২৬ জানুয়ারী পুর্ব এবং দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা এই দিনটি বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করল। বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের শপথ নিয়ে নানা অনুষ্ঠানে তাঁরা স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাণী পাঠ করল। জাপানের রাজধানী টোকিও থেকে বেতারে এই অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ প্রচার করা হল। এছাড়া জাপ সরকার বেতারে এক বিশেষ প্রতিবেদন প্রচার করে পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের তাৎপর্য ও সমর্থনসূচক বক্তব্যও প্রচার করেন। জাপ বেতারের এই প্রচার প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে আবার নতুন উৎসাহ জাগাল।
রাসবিহারী বসু এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তিনি চার সদস্যের এক কমিটির কথা ঘোষণা করলেন। তার উদ্দেশ্য, আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে উৎসাহবোধ জাগানো এবং যেসব সেনাপতি সেনারা আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্তর্দ্বন্দ্বে নিরস্ত্র হয়ে বসে পড়েছিলেন, তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের তাৎপর্যের কথা বুঝিয়ে বলা। এছাড়া বিভিন্ন স্তরের সেনাপতি ও সমরনায়কদের সঙ্গে বৈঠক করে সাধারণ সেনাদের মনোভাব খতিয়ে দেখা।
চার সদস্যের এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন মেজর জেনারেল জে, কে, ভোঁসলা। বাকী সদস্য মেজর জেনারেল এম, জেড কিয়াজি, লেফটেন্যাণ্ট কার্নেল লোগনাথন এবং মেজর প্রকাশ চাঁদ।
বলাবাহুল্য, রাসবিহারী কর্তৃক ঘোষিত এই কমিটির সদস্যদের কর্ম-

তৎপরতা এবং প্রচারের ফলে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মনোভাবের পরিবর্তন দেখা দিল। মোহন সিং-এর গ্রেপ্তারের পর জাপ সরকার সম্বন্ধে তাদের মধ্যে যে সন্দেহ সংশয় দেখা গিয়েছিল, তারও পুনর্মূল্যায়ণ শুরু হল। পরিবর্তনশীল এই পরিস্থিতিতে আরও একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল।

সেটা ১৯৪৩-এর ৪ ফেব্রুয়ারী।

জেনারেল তোজো জাপানের প্রতিনিধিসভায় ঘোষণা করলেনঃ ভারতবর্ষের উপর রাজনৈতিক বা সামরিক প্রভাব বিস্তার করার বিন্দুমাত্র মোহ বা বাসনা জাপান সরকারের নেই। জাপানও ভারতবর্ষকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে পেতে চায়। এবং তার প্রয়োজনীয় সকল রকমের সহযোগিতায় জাপ সরকার প্রস্তুত।

জেনারেল তোজোর এই ভাষণ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলে ভারতীয়দের মধ্যে তার সুফল দেখা দিল। ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের পক্ষ থেকে তোজোর বিবৃতিকে স্বাগত জানিয়ে বলা হল, যারা মনে করতেন, জাপান ভারতবর্ষে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে আগ্রহী, তাদের সেই ধারণা যে কতটা ভিত্তিহীন, এই প্রকাশ্য সরকারী ঘোষণাই তার প্রমাণ দেয়। ঐক্যবদ্ধ এবং বৃহত্তর ও শক্তিশালী এশিয়ার স্বপ্ন যে জাপানের লক্ষ্য—তোজোর বিবৃতি তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত!

জাপ প্রধানমন্ত্রী তোজোর বিবৃতির ফলে হতাশ ভারতীয়রা আবার নতুন উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এল। রাসবিহারী এই সুযোগে আজাদ হিন্দ ফৌজ নতুন করে সাজাতে উদ্যোগী হলেন। পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সর্বত্র আবার নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হল।

১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রবাসী ভারতীয়রা মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিতে যখন ব্যস্ত সেই চরম মুহূর্তে তারা জানতে পারল, স্বদেশভূমিতে মহাত্মা গান্ধী তিন সপ্তাহব্যাপী অনশনের

শপথ নিয়েছেন। উদ্দেশ্য, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার উৎপীড়ন আর দমন নীতির প্রতিবাদ জানানো। এই সংবাদ প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে দারুণ উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করল। সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ বিরোধী বিদ্বেষ আরও হাজার গুণ বেড়ে গেল। ওদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার এবং সাধারণ সেনাদের উদ্দেশ্যে এক বার্তায় রাসবিহারী বসু বলেন, মহাত্মাজীর অনশনের ফলে ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রাম এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার প্রতীক্ষায়। আশা করি, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা এই চরম মুহূর্তে বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হতে আর দ্বিধা বোধ করবে না।

খবরের কাগজে, বেতারে সর্বত্র গান্ধীজীর অনশনের সংবাদ। চারদিক তোলপাড়, ক্ষোভ, আন্দোলন আর উদ্দীপনা।

২৩ ফেব্রুয়ারী জাপ সরকারের প্রচার দপ্তরের পক্ষে কিয়াও ওকমুরা টোকিওতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করলেন: মহাত্মাজীর অনশন এবং তাঁর শারীরিক অবনতি শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। মূলতঃ তা সমস্ত ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর চিন্তার বিষয়। জাপান সরকার এবং জাপ জনগণও এই মহান নেতার অনশনের সংবাদে উদ্বিগ্ন।

উল্লেখ্য, মাত্র এক মাস আগে ডিসেম্বরের শেষে মোহন সিং-এর গ্রেপ্তারের পর আজাদ হিন্দ ফৌজে ভাঙনের হতাশার যে সুর উঠেছিল, ঘটনা পরম্পরায় বিশ্বরাজনীতির অভাবিত পরিণতিতে তা মুহূর্তেই দূর হয়ে গেল। নিরস্ত্র সেনারা আবার সশস্ত্র হলেন, আজাদী বাহিনী আবার সুগঠিত হতে লাগল। পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা পেল নতুন উৎসাহ। জাপানের মনোভাব এবং কার্যকলাপ তাদের মনের সব দ্বিধা সংশয় দূর করে দিল। অস্বস্তিকর পরিবেশ আর পরিস্থিতির মধ্যে সুকৌশলে রাসবিহারী বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে হাত দিলেন।

রাসবিহারী বসু যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠনের কাজে সক্রিয়,

জাপ কর্তৃপক্ষ তখন তাঁকে সাহায্য করতে আবার এগিয়ে এলেন। বুঝতে পারলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম পর্যায়ের ভাঙন আর ক্যাপটেন মোহন সিং-এর গ্রেপ্তারের পরিণতি জাপান সরকারের আন্তরিকতা সম্পর্কে ভারতীয়দের মনে সংশয় আর সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। শুধু মাত্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বার্থে নয়, বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে জাপ সেনাদের অভিযান সার্থক করার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের পুনর্গঠন প্রয়োজন। তাই জাপ সরকার নতুন করে আবার আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ার ব্যাপক প্রচারের কাজ শুরু করলেন। ফেব্রুয়ারির গোড়ায় জাপ সরকারের পক্ষে জেনারেল ইয়াকুরো সিঙ্গাপুরের বিদদারি শিবিরে আজাদ হিন্দ ফৌজের পদস্থ সেনানায়কদের নিয়ে এক বৈঠকে বসলেন। প্রায় তিনশ সেনা-নায়ক ঐ বৈঠকে যোগ দিলেন। বৈঠকে জেনারেল ইয়াকুরো জাপ সরকারের মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন, তাঁর সরকারের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভুল বোঝাবুঝির ফলে উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য উভয়পক্ষের মধ্যে চাই আন্তরিক ঐক্য আর সমঝোতা।

ইয়াকুরো বলেন, ব্যাঙ্কক বৈঠকে বিভিন্ন দেশের ভারতীয় প্রতিনিধিরা আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ার জন্য যে প্রস্তাব নিয়েছিলেন, সেইভাবেই তা গড়া হোক। ভারতের স্বাধীনতার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ যে আন্দোলন বা সংগ্রাম করতে চান, জাপ সরকার তার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিশীল। তার প্রমাণ, ভারতবর্ষের মুক্তির উপায় আলোচনা করার জন্য স্বাধীনতা সংঘের প্রতিনিধিরা যখন ব্যাঙ্ককে সম্মেলন করার আগ্রহ প্রকাশ করেন জাপ সরকার তা সানন্দে সেইসব ব্যবস্থা করে দেন। সেখানে ভারতীয় প্রতিনিধিরাই একটি কর্ম-পরিষদ গঠন করে রাসবিহারী বসুকে সভাপতি পদে বসান। পরে ভারতীয় প্রতিনিধি কর্তৃক নির্বাচিত রাসবিহারী বসুই ক্যাপটেন মোহন সিংকে আজাদ হিন্দ

ফৌজের নেতৃত্বভার দেন। জেনারেল মোহন সিং আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্তৃত্ব পেলেও তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছায় তিনি ঐতিহাসিক ঐ বাহিনী ভেঙে দিতে পারেন না। তার জন্য সভাপতির অনুমতি প্রয়োজন। যদি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কোনওরকম অসুবিধা থাকে, তবে তিনি নেতৃত্ব পদ ছাড়তে পারেন কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠানের বিপর্যয় ঘটাতে পারেন না। ফৌজ ভাঙার অথবা তা বিপর্যস্ত করার চেষ্টা বিদ্রোহেরই সামিল।

জেনারেল ইয়াকুরোর এই ভাষণ উপস্থিত অফিসারদের মধ্যে নতুন করে চিন্তার সুযোগ এনে দেয়। যারা মোহন সিং-এর গ্রেপ্তারে ক্ষুব্ধ ছিলেন, তাদের মনেও পরিবর্তনের বরফ গলতে শুরু করে।

বৈঠক শেষ হওয়ার পর অফিসাররা নিজ নিজ কাজে চলে যান। জেনারেল ইয়াকুরোর পরদিন ভোরে মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খানকে তাঁর বাংলোয় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানান।

জাপানীদের অভিসন্ধি সম্পর্কে প্রথম থেকেই জেনারেল শাহনওয়াজ খানের মনে সন্দেহ ছিল। জেনারেল ইয়াকুরোর সঙ্গে যখন তাঁর আলোচনা চলে, তখন তিনি তাঁর সন্দেহের কথা চেপে রাখেন না। বরং খোলাখুলি সব বলে নানা যুক্তির ব্যবহারে নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন।

মেজর ইয়াকুরোর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে শাহনওয়াজ খান পরে নিজেও লেখেন: ভালভাবে কী করে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়া যায়, সে সম্বন্ধে তিনি আমার পরামর্শ জানতে চাইলেন। তিনি নিজেও অবশ্য বললেন, আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠনের কাজ এমনভাবে করা দরকার, যাতে সকল শ্রেণীর ভারতীয় স্বেচ্ছায় তাতে যোগ দিতে উৎসাহ বোধ করেন।

শাহনওয়াজ খান ইয়াকুরোর সঙ্গে একমত হন এবং ইয়াকুরোর কাছে তিনটি প্রস্তাব রাখেন।

প্রথম প্রস্তাব: আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠনের কাজে সকল হতে

হলে প্রথমে জাপান সরকারকে ঘোষণা করতে হবে যে ভারতবর্ষের মুক্তিলাভের পবিত্র সংগ্রাম, ন্যায় ও সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। জাপান কোন কারণে তাদের স্বার্থে ঐ বাহিনীকে ব্যবহার করবে না।

দ্বিতীয়তঃ জোর করে বা ভয় দেখিয়ে কাউকে আজাদ হিন্দ ফৌজে যুক্ত করা চলবে না। স্বেচ্ছায় যারা স্বাধীনতা লাভের আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে যোগ দেবেন, তাদের সাদরে গ্রহণ করতে হবে। যারা আজাদী বাহিনীতে আসতে অনিচ্ছা প্রকাশ করবে, তাঁদের উপর কোনও রকম চাপ সৃষ্টি বা দুর্ব্যবহার করা চলবে না।

তৃতীয় এবং সর্বশেষ প্রস্তাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐ প্রস্তাবে বলা হয়, পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়া হবে। তাই ঐ বাহিনীকে শুধুমাত্র প্রচারক দল না করে, এক অপরাজেয় দুর্জ্জয় সুসজ্জিত সেনাবাহিনীতে পরিণত করতে হবে। আর ঐ বাহিনী পরিচালনার জন্য জার্মানে অবস্থানরত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মত মহান ব্যক্তিকে আনবার সব ব্যবস্থা করতে হবে। নেতাজীর নেতৃত্ব ব্যতীত ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধ সফল করা অসম্ভব। জাতি ধর্ম নিবিশেষে সকল ভারতীয়ই তাঁর নেতৃত্বের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষারত।

জেনারেল ইয়াকুরো একজন দক্ষ সমরনায়ক। জেনারেল শাহনওয়াজ খানের আন্তরিক প্রস্তাব এবং পরামর্শ তিনি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দিলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে শাহনওয়াজ খানকে মোটামুটি ভাবে ইঙ্গিত দিলেন যে, জাপান সরকার বালিন থেকে নেতাজীকে পূর্ব এশিয়ায় আনবার সর্বরকম ব্যবস্থার জন্য আন্তরিক ভাবে সক্রিয় হবে।

ইয়াকুরোর প্রতিশ্রুতি পেয়ে শাহনওয়াজ খান তার উত্তরে বলেন: নেতাজী সত্য সত্যই সিঙ্গাপুরে আসছেন, এরূপ বুঝলে বহু সংখ্যক অফিসার ও সেনা স্বেচ্ছায় আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেবেন। তাঁর

নেতৃত্ব প্রতিটি ভারতবাসীর মনে প্রাণে নতুন প্রেরণার সঞ্চার করবে। সকলে মুহূর্তে ভেদাভেদ ভুলে মাতৃভূমির মুক্তিমন্ত্রে মৃত্যুপণ করে স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তবে নেতাজী যতদিন না সিঙ্গাপুরে আসছেন, ততদিন সেনাবাহিনীর লোকদের সিঙ্গাপুর থেকে অন্য কোথাও সরানো চলবে না।

শাহনওয়াজ খানের প্রস্তাবে জেনারেল ইয়াকুরো সম্মতি জানালেন সঙ্গে সঙ্গে শাহনওয়াজ নিজেও আজাদ হিন্দ ফৌজে যুক্ত হওয়ার অঙ্গীকার করলেন। তারপরেই জেনারেল ইয়াকুরো তাঁকে ডিরেক্টর অব মিলিটারি ব্যুরোর 'চীফ অব জেনারেল স্টাফ' বলে ঘোষণা করলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের ইতিহাসে আবার নতুন যুগের সূচনা হল।

জেনারেল ইয়াকুরোর বুঝতে বিলম্ব হল না যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রাণ সঞ্চারের জন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতি এবং নেতৃত্ব অপরিহার্য। ক্যাপটেন মোহন সিং-ও আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ার প্রথম উদ্যোগে, ১৯৪১ সালে, মেজর ফুজিয়ারার কাছে নেতাজীর নেতৃত্বের সুপারিশ করেছিলেন। পর বছর ১৯৪২ সালে সিঙ্গাপুর এবং টোকিও বৈঠকেও তাঁর নেতৃত্বের দাবী জানিয়ে স্বাধীনতা সংঘের নেতা, আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাবাহিনী এবং প্রবাসী ভারতীয়রা একই মর্মে প্রস্তাব নিল। পরে ১৯৪৩ সালের ব্যাঙ্কক বৈঠকেও সব প্রতিনিধি একবাক্যে নেতাজীর নেতৃত্বের জন্য গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। এসব ঘটনা জাপ জেনারেল ইয়াকুরোর অজানা ছিল না। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব এবং প্রভাব যে ভারতীয়দের উপর কতখানি গভীর তা তাঁর আগে থেকেও জানা ছিল। শেষ অবধি তিনি স্থির বিশ্বাসে পৌঁছুলেন যে, বৃটিশ বিরোধী লড়াইয়ের জন্য ভারতীয় জওয়ান এবং সাধারণ মানুষ নেতাজীর নেতৃত্বে জীবন দান করে ধন্য হতে চান।

জাপ জেনারেল ইয়াকুরোর জাপ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার

আগে আজাদ হিন্দ ফৌজের সভাপতি রাসবিহারী বসুর সঙ্গে এক বৈঠকে বসলেন এবং নানা মহল থেকে নেতাজীর নেতৃত্বের দাবীর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলেন।

রসবিহারী বসু জেনারেলকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানালেন, আজাদী বাহিনী গড়ার কাজে তাঁর যে ব্যর্থতা, তা দূর করে নেতাজী সুভাষের ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্ব এই ঐতিহাসিক সংস্থাকে আরও ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করতে পারবে এ বিশ্বাস তাঁরও আছে।

পরবর্তী সময়ে এ প্রসঙ্গে জেনারেল ইয়াকুরো সবিস্ময়ে মন্তব্য প্রকাশ করে লিখেছেন: রাসবিহারী ছিলেন এক মহান নেতা। অকথ্য ত্যাগ স্বীকার আর কল্পনাতীত বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে তিনি যে ঐতিহাসিক আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়েছিলেন, এক কথায় সানন্দে নিঃসর্তে তাঁর নেতৃত্বভাব অপব একজন নেতার হাতে তুলে দিতে সম্মত হলেন!

এই সময় জাপ সরকারের আরেক পদস্থ সামরিক নেতা লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল আরিসুয়ে সিঙ্গাপুর পরিদর্শন করছিলেন। জেনারেল ইয়াকুরো তাঁর কাছে নেতাজী প্রসঙ্গ তুললে, আরিসুয়ে রাসবিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর মতামত ও পরামর্শ জানতে চান। বাসবিহারী তাঁকেও অনুরোধ করেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জার্মান থেকে যেন নেতাজী বসুকে পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গণে আনার ব্যবস্থা করা হয়। তাতে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ার মূল উদ্দেশ্য আশাতীত ভাবে সফল হবে। সেনাবাহিনীও হবে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ।

রাসবিহাহী বসুর এই কথায় জাপ লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল আরিসুংেও অবাক হলেন। তাঁর মনে অবশ্য সন্দেহ দেখা দিল, নেতাজী বসু পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গণে এলে হয়তো দুই বসুর মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে আবার ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হবে। ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগতি দারুণ ভাবে ব্যহত হবে! জাপ জেনাবেল রাসবিহারী বসুকে তাঁব আশঙ্কাব কথাটা খোলাখুলি ভাবে জানাতে দ্বিধা করলেন না।

তিনি এ বিষয় রাসবিহারীর সুস্পষ্ট মনোভাব জানতে চাইলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাসবিহারী আরিস্মুয়ের কাছে একটি সম্মতিপত্র লিখলেন। তাতে তিনি জানালেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র যদি সত্য সত্যই পূর্ব এশিয়ায় আসেন, তবে তার মহান নেতৃত্ব নিয়ে কোথাও কোন প্রশ্নই উঠবে না। বয়সে আমি তাঁর চেয়ে প্রবীণ হলেও, সানন্দে আমি তাঁর নেতৃত্বাধীন থেকে মাতৃভূমির মুক্তি যুদ্ধের সামিল হব। নেতাজী বসুর সুমহান নেতৃত্ব জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর একান্তভাবে কাম্য।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরিস্মুয়ে রাসবিহারীর বক্তব্যের মধ্যে আন্তরিকতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত খুঁজে পেলেন। তাঁর আশঙ্কা দূর হল। আর বিপ্লবী রাসবিহারীর প্রতি আস্থা এবং শ্রদ্ধাও গেল বেড়ে। আরিস্মুয়ে আর কাল বিলম্ব না করে সিঙ্গাপুর থেকে জাপানের রাজধানী টোকিও যাত্রা করলেন। তারপর জাপ সরকারের কাছে আজাদ হিন্দ ফৌজের পুণর্গঠন প্রসঙ্গে সর্বশেষ পরিস্থিতির কথা জানিয়ে জার্মানী থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে পূর্ব এশিয়ায় আনার প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করতে পরামর্শ দিলেন।

উল্লেখ্য, পূর্ব এশিয়ার জাপ সামরিক দলের অফিসার জেনারেল ইয়াকুরোও ইতিপূর্ব এক গোপন পত্রে নেতাজী বসুকে বার্লিন থেকে আনানোর সবরকম ব্যবস্থা করতে পূর্ব এশিয়ায় জাপ সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন।

জেনারেল ইয়াকুরো এবং জেনারেল আরিস্মুয়ের মত দু' দু'জন জাঁদরেল যুদ্ধ বিশারদের গোপন রিপোর্ট পেয়ে জাপ সরকার নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝতে পারলেন। কিন্তু বিশ্ব রাজনীতি এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি বিবেচনা করে জার্মান থেকে জাপান বা পূর্ব এশিয়ায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে আসবার ব্যবস্থা করা নিয়ে দারুণ সমস্যায় পড়লেন।

জাপান সরকারী বেসরকারী ভাবে নানা তথ্য সংগ্রহ শুরু করলেন।

কোন পথে কীভাবে শত্রুপক্ষ বৃটিশ-আমেরিকার টহলদারী সেনা-বাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে সুদূর জার্মান থেকে নেতাজী বসুকে জাপানে নিয়ে আসা যায়, তার নানা পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু জাপ সরকার কোনমতেই জার্মান থেকে নেতাজীকে আনানোর মত গোপন অথচ নিরাপদ পথের সন্ধান পেল না। জার্মান জাপানের মধ্যেকার সুদীর্ঘ আকাশ স্থল আর জল পথের সর্বত্রই শত্রুপক্ষের সতর্ক প্রহরা। নানা সূত্রে জাপ সরকার যেসব তথ্য পেলেন, তা' থেকে জানা গেল, যে পথে যেভাবেই নেতাজীকে আনার ব্যবস্থা করা হোক না কেন, তাতেই নেতাজীর জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে। শেষ অবধি জাপ সরকার অবশ্য একটা গোপন পথের সন্ধান পেলেন। জার্মান থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে জাপানে বা পূর্ব-এশিয়ায় আনতে হলে সমুদ্রের অতল দেশের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ডুবো জাহাজ বা সাবমেরিন চেপে অত্যন্ত গোপনে তাঁকে আনবার ব্যবস্থা করতে হবে। ঐ পথে আনা হলে তাঁর মৃত্যুর সম্ভাবনাও শতকরা পঁচানব্বই ভাগ। কারণ, যে সমুদ্রের জলের নীচ দিয়ে তাঁকে আনতে হবে, সেই সমুদ্রের উপর বৃটিশ আর আমেরিকার অজস্র রণতরী প্রহরারত, যান্ত্রিক নিশানায় গভীর সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে সাবমেরিনের গতিবিধি বোঝা তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। তবু তারা চেষ্টার ত্রুটি করবেন না।

আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব দিতে বার্লিন থেকে পূর্ব এশিয়ায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সম্ভাব্য আগমনের সংবাদ সকল ভারতীয় তথা এশিয়াবাসীর মনে তীব্র প্রেরণা ও উৎসাহ সৃষ্টি করল। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে প্রবীন বিপ্লবী ও রাজনীতিক রাসবিহারী একটুও দ্বিধা করলেন না। নতুনভাবে তিনি ভাঙা আজাদ হিন্দ ফৌজকে সুসংগঠিত ও সুসংহত করার উদ্যোগ নিলেন। তিনি বুঝলেন, নেতাজী এসে পৌছুবার আগেই স্বাধীনতা সংঘ এবং

আজাদ হিন্দ ফৌজকে সুশৃঙ্খল করে তোলা দরকার। তার জন্য চাই বিশেষ ক্ষমতা।

রাসবিহারী বসু এবার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজের হাতে কিছু বিশেষ ক্ষমতা তুলে নিতে চাইলেন। তিনি পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়, স্বাধীনতা সংঘ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনা প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন ডেকে সেখানে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন। সিদ্ধান্ত মত ১৯৪৩-এর এপ্রিল মাসে চারদিন ব্যাপী এক প্রতিনিধি সম্মেলনেরও আয়োজন করা হল।

১৯৪৩-এর এপ্রিল। সাতাশ থেকে ত্রিশ! এই চারদিন সিঙ্গাপুর শহরে প্রতিনিধি সম্মেলন বসল। প্রতিনিধিরা ঐক্যবদ্ধ প্রস্তাবে রাসবিহারীর হাতে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ তথা আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিচালনার চূড়ান্ত দায়িত্বভার তুলে দিলেন। ব্যাঙ্কক সম্মেলনে ইতিপূর্বে তিন সদস্যের যে কাউন্সিল অব অ্যাকশন গঠন করা হয়েছিল, এই সম্মেলনে সেই কাউন্সিলকে সভাপতির পরামর্শদাতা সমিতিতে রূপান্তর করলেন। অর্থাৎ রাসবিহারীর ক্ষমতা আরও বাড়ানো হল। এবং সর্বসম্মত প্রস্তাবে বলা হল, সভাপতি রাসবিহারী যদি মনে করেন, তবে তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর উত্তরসূরী নির্বাচন করতে পারবেন। প্রতিনিধি সম্মেলন রাসবিহারীর হাতে সর্বাত্মক ক্ষমতা তুলে দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধকে দ্রুততর করার পথ সুগম করে দিলেন।

সিঙ্গাপুরের এই প্রতিনিধি সম্মেলনে জাপ প্রতিনিধি কর্নেল ইয়া মামাতো আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন। কর্নেল ইয়া মামাতো ছিলেন জার্মানের বার্লিন সহরে জাপ সরকারের একজন সরকারী প্রতিনিধি। বার্লিনে তার সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব হয়। মনে করা যেতে পারে, পূর্ব এশিয়ায় নেতাজীকে আনা এবং সাধারণের মধ্যে নেতাজী সম্বন্ধে উৎসাহ উদ্দীপনা ও আস্থার মনোভাব জানানোর জন্যই নেতাজীর বিদেশী জাপানী বন্ধু ঐ

অফিসারকে আনন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সম্মেলনের ফাঁকে সভাপতি রাসবিহারী বসু কর্নেল ইয়ামামাতোর সঙ্গে পূর্ব এশিয়ার সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং নেতাজীর নেতৃত্ব যে কতটা অপরিহার্য তাঁকে বুঝিয়ে বলেন। যাতে তিনি বার্লিন ফিরে গিয়ে নেতাজীর কাছে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার কথা সবিস্তারে জানান—সেই মর্মেও তাঁকে অনুরোধ করেন।

জাপ প্রতিনিধি কর্নেল ইয়ামামাতো হয়তো নেতাজীর পূর্ব এশিয়ায় আসবার আগ্রহের কথাও রাসবিহারীকে জানিয়েছিলেন। তাই প্রতিনিধি সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে সভাপতি রাসবিহারী বসু নাটকীয় ভাবে ঘোষণা করেন: বিশ্বের এই উত্তপ্ত রণাঙ্গণে খুব শীঘ্রই নেতাজীর আসবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের সকলের এই আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুই হবেন আমার উত্তরসূরী। মহান এই নেতার হাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের পবিত্র দায়িত্ব ভার তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত ও ধন্য হতে চাই।

রাসবিহারীর ঘোষণা প্রতিনিধি সম্মেলনকে আনন্দমুখর করল। সম্মেলন প্রাঙ্গণে মুহুর্মুহু নেতাজী সুভাষ আর রাসবিহারীর নামে জয়ধ্বনি উঠল। জাপ প্রতিনিধি কর্নেল ইয়ামামাতো নিজেও নেতাজীর নামে ভারতীয়দের আনন্দ উত্তেজনায় বিস্মিত হলেন। নেতাজী যে ভারতীয়দের কাছে কতটা প্রিয়, তাঁর উপস্থিতি মুক্তি যুদ্ধের সাফল্যের প্রয়োজনে যে কতখানি অপরিহার্য তা কর্নেল ইয়ামামাতো সরেজমিনে হৃদয়ঙ্গম করলেন।

৩০ এপ্রিল ১৯৪৩।

সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা সংঘের প্রতিনিধি সম্মেলনে, সংঘ তথা আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব প্রবীণ বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর হাতে তুলে দেওয়া হল। সর্বসম্মত প্রস্তাবে আরও বলা হল,

রাসবিহরী বসু যদি কখনো মনে করেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের পবিত্র দায়িত্ব ও নেতৃত্বের পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন প্রয়োজন, তবে তিনি স্বয়ং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চূড়ান্ত ব্যবস্থা করার অধিকারী হবেন।

রাসবিহারী বসুই প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন। সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর সমবেত প্রতিনিধিরা প্রবীণ বিপ্লবীকে নতুন করে অভিনন্দিত করলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বময় ও চূড়ান্ত কর্তৃত্ব পেয়েও প্রবীণ বিপ্লবীর চোখমুখে আবেগ-উচ্ছ্বাসের ভাব দেখা গেল না। ভাবগম্ভীর রাসবিহারী এবার উঠে দাঁড়ালেন। যে প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁকে সুউচ্চ ও সম্মানীয় পদে প্রতিষ্ঠিত করলেন, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি আবেগহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন : আপনারা আমাকে যে সম্মানে ভূষিত করলেন এবং পবিত্র দায়িত্বভার দিলেন, আমি মনে করি, সে সম্মান এবং দায়িত্বভার গ্রহণের যোগ্যতা ভারতবর্ষের একজনেরই আছে। আমাদের সকলের বাঞ্ছিত সেই বীর নেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের হাতে এই পবিত্র দায়িত্বভার অর্পণ করে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। তিনিই হবেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বময় অধিনায়ক।

বিপ্লবী রাসবিহারীর বক্তব্য সমবেত প্রতিনিধিদের মধ্যে নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করল। দেশান্তরী সুভাষচন্দ্রের কাবুল হয়ে মস্কো এবং সেখান থেকে জার্মানীর বার্লিনে উপস্থিতির দুঃসাহসিক অভিযান পর্বের কাহিনী তাঁদের জানা ছিল। তারা জানতেন, বার্লিনে স্বাধীন বেতারকেন্দ্র গঠন এবং ইউরোপ-আফ্রিকার রণাঙ্গণে পর্যুদস্ত বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় জওয়ানদের নিয়ে তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন এবং সুদূর প্রসারী পরিকল্পনার কথা। আপোষহীন নেতা নেতাজীর বৃটিশবিরোধী মানসিকতা, হিটলার, মুসোলিনী সহ বিশ্বনায়কদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র অজানা ছিল না। অতএব, রাসবিহারী বসুর সংক্ষিপ্ত ঘোষণা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটল।

প্রতিনিধি সম্মেলন যখন নেতাজীর নেতৃত্ব কামনায় অধীর, বিপ্লবী

রাসবিহারী যখন তাঁর হাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের পূর্ণ দায়িত্ব তুলে দিয়ে পরাধীন মাতৃভূমির স্বাধীনতাযুদ্ধ ত্বরান্বিত করতে আগ্রহী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র তখন গোপন পথের দুঃসাহসিক পথিক। একমাত্র সহযোগী আবিদ হাসানকে সঙ্গী করে তিনি তখন ইউরোপের মাটি ছেড়ে মহাসমুদ্রের অতল জলপথ ধরে সাবমেরিন যোগে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উদ্দেশে গোপন যাত্রায় ব্রতী। সেখান থেকে জাপানের সহায়তায় বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সামরিক অভিযান করার পরিকল্পনায় অধীর উন্মুখ।

মাত্র দু'মাসের ব্যবধান।
এর মধ্যে অনেক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হল। নেতাজীর জাপান যাত্রা এবং টোকিও পৌঁছবার আগাম আভাস বোধহয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু জানতে পেরেছিলেন। সিঙ্গাপুরে প্রতিনিধি সম্মেলনে তিনি নেতাজীর নেতৃত্বের স্বপক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে ঘোষণা রেখেছিলেন, সেই বাঞ্ছিত নেতৃত্বের কামনায় তিনিও জাপ সরকারের মাধ্যমে নানাভাবে নেতাজীর পূর্ব এশিয়া আগমনের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছিলেন। সেই সূত্রেই হয়তো নেতাজীর টোকিও আগমনের সম্ভাব্য একটা তারিখ তিনি জানতে পারেন।
১৯৪৩-এর ২ জুন। সিঙ্গাপুরে নিজের বাংলোয় বিপ্লবী রাসবিহারী এক নৈশ ভোজসভার আয়োজন করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের পদস্থ কয়েকজন অফিসারকে তিনি ঐ ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানান।
নির্দ্দিষ্ট আমন্ত্রিত অফিসাররা যথারীতি রাসবিহারী আয়োজিত ভোজসভায় উপস্থিত হলেন। যথাযথ ভোজপর্বও শুরু হল। রাসবিহারী ঐ ভোজসভায় উপস্থিত অফিসারদের জানালেন, পরদিন অর্থাৎ ৩ জুন, তিনি জাপানের রাজধানী টোকিও যাত্রা করছেন।
অফিসাররা তাঁর এই যাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রকাশ

করলেন। কিন্তু রাসবিহারী সরাসরি তার কোনও উত্তর দিলেন না। শুধু বললেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্ধুদের জন্য এক গুরত্বপূর্ণ উপহার আনতেই তাঁর এই টোকিও যাত্রা।

নেতাজী জাপান পৌঁছুলেন জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে। জাপানের রাজধানী টোকিওতে নেতাজীর বীরোচিত সম্বর্দ্ধণা হল। যেদিন নেতাজী টোকিও পৌঁছুলেন, সেদিনই তিনি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে বলেন : প্রথম মহাযুদ্ধে বৃটিশরা আমাদের দেশের নেতাদের ভাঁওতা দিয়ে রেখেছিল। আমরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমাদের সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। আমরা বেশ ভালভাবেই জানি, আগামী একশ' বছরের মধ্যে আর এমন সুযোগ ফিরে আসবে না। এই সুযোগের সদ্ব্যহায় আমাদের করতেই হবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের কৃষ্টি ধ্বংস করে নৈতিক অধঃপতন এনে আমাদের দরিদ্র জাতিতে পরিণত করেছে। হৃদয়ের রক্ত দিয়ে আমাদের তা থেকে মুক্ত হতে হবে। মাতৃভূমিকে করতে হবে স্বাধীন। যে শত্রু আমাদের অস্ত্রাঘাত করেছে, অস্ত্রাঘাতই হবে তার প্রত্যুত্তর। অহিংস অসহযোগকে এবার হিংসাত্মক সংগ্রামে পরিণত করতে হবে। দলে দলে এই অগ্নিদীক্ষা গ্রহণ করলে তবেই হবে পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তি।...

নেতাজীর বক্তব্যে জাপান সরকার প্রীত হলেন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গণে তখন বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে জাপ সেনাদের প্রচণ্ড লড়াই চলছিল। বৃটিশ বিরোধী নেতা নেতাজীর টোকিও উপস্থিতি অতএব, জাপ সরকারকেও উৎসাহিত করল। এই পটভূমিকায় নেতাজী জাপ প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারপর জাপানের সামরিক অফিসারদের সঙ্গেও চলে তাঁর শলাপরামর্শ। প্রধানমন্ত্রী তোজো এবং পদস্থ সামরিক অফিসাররা নেতাজীর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হলেন। আপোষহীন এই নেতার স্বদেশে এবং বিদেশের আনুপাতিক ঘটনা প্রবাহের সব খবরই তাঁরা রাখতেন।

নেতাজীর যুদ্ধ পরিকল্পনার কথা শুনে জাপ সামরিক নেতৃবৃন্দ তাঁকে সকল প্রকার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। অতএব স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রয়োজনীয় অস্ত্র-উপকরণ নৈতিক সাহায্য দিয়ে সার্বিক সহযোগিতার জন্য নেতাজী জাপ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন রাখলেন। প্রধানমন্ত্রী তোজোকে নেতাজী বুঝাতে সক্ষম হলেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'সহায়তার অর্থ এশিয়ার একটি বৃহৎ ভূখণ্ড থেকে বৃটিশ সরকারকে উচ্ছেদ করে একটি প্রাচীন মহান দেশের কোটি কোটি মানুষের সমর্থন লাভ।
তোজো এবং তাঁর সরকার, নেতাজীর অকাট্য যুক্তি, স্বদেশ বিচার, নিষ্ঠায় মুগ্ধ হলেন। স্বদেশে এক সময় জাতীয় কংগ্রেসের তাঁর সভাপতি নির্বাচিত হওয়া, তারপর বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে অসংখ্যবার কারা নির্যাতন বরণ ইত্যাদির বিস্তৃত তথ্য ইতিমধ্যে জাপ সরকারের হস্তগত হয়েছিল। অতএব, দক্ষিণ-পূর্ব রণাঙ্গণে জাপ সেনাবাহিনী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের জওয়ানদের বৃটিশ বিরোধী যৌথ অভিযানের চূড়ান্ত পরিকল্পনায় প্রধানমন্ত্রী তোজো এবং তাঁর সরকার নিঃসর্ত সম্মতি জানালেন।

নেতাজীর শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতিপর্ব প্রায় শেষ। ১৯৪১-এর গোড়ায় রহস্যজনক ভাবে সুভাষচন্দ্র ভারত সীমান্ত পেরিয়ে কাবুল হয়ে মস্কোয় পৌঁছেছিলেন। তারপর মস্কো থেকে বার্লিন। বার্লিনে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রস্তুতি শেষ করে জাপানের টোকিও সহরে বসে নেতাজী তাঁর স্বপ্ন এবং চূড়ান্ত পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দিতে ব্রতী হলেন। মাত্র আঠাশ মাসের মধ্যে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতাকামী এক সন্তান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে ইউরোপ এশিয়ার আকাশে ধুমকেতুর মত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেন। এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকার বিভিন্ন রণাঙ্গণের পর্যুদস্ত বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় জওয়ানদের

সুসংগঠিত করে তদানীন্তন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাড়াশী অভিযানের রণকৌশল রচনা করলেন।

নেতাজীর চোখে মুখে তখন রণ-উন্মাদনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি এবং সম্ভাব্য পরিণতির সুযোগে পরাধীন মাতৃভূমিকে বৃটিশ-শক্তির হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে সামরিক অভিযানের স্বপ্নে তখন নেতাজী বিভোর। তিনি জানতেন, একটি যুদ্ধ মানেই অজস্র জীবন বলি, রক্তের বন্যা। নেতাজীর বিশ্বাস, পরাধীন মাতৃভূমির মুক্তির জন্য জীবন-রক্ত বিসর্জনের প্রয়োজন অনিবার্য। এবং বলিদানের এই পবিত্র পূজার আর এক নাম স্বাধীনতা যুদ্ধ।

১৯৪৩, ২৯ জুন। অতএব এক বেতার বক্তৃতায় ঘোষণা করলেন: পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়দের সাহায্যে আমি এমন এক শক্তিশালী বিরাট সেনা বাহিনী সুসংগঠিত করে তুলতে সক্ষম হব, যে বিরাট সেনাবাহিনী অনায়াসে ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করতে সক্ষম হবে।

যাত্রা শুরুর বিজয় শঙ্খ বেজে উঠেছে। প্রতিটি ভারতবাসীকে এবার যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হতে হবে। স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের দেহ থেকে যখন রক্ত ঝরতে শুরু করবে, একমাত্র তখনই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হবে।…

সুভাষ থেকে নেতাজী ঃ সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী।

সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম ওড়িশার কটক সহরে-১৮৯৭, ২৩ শে জানুয়ারি। পিতা জানকী নাথ ও মাতা প্রভাবতী বসুর ষষ্ঠ পুত্র এবং পরিবারের নবম সন্তান। সুভাষকে পাঁচ বছর বয়সে এই সহরের একটি স্কুলে ভরতি করা হয়।

১৯১৩ সালে, অর্থাৎ মাত্র পনের বছর বয়সে ম্যাটি্রকুলেশন পরীক্ষা দেন এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইতিমধ্যে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও ভাবধারায় সিক্ত হন। পরাধীনতার গ্লানি তাঁকে রাজনীতি সচেতন করে তোলে। এই মানসিকতা নিয়ে সুভাষচন্দ্র কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হন। এসময় তিনি অধ্যাপক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সান্নিধ্যে আসেন। ১৯১৪ সালে গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে ধর্ম বিশ্বাসী তরুণ এক বন্ধুকে নিয়ে গয়া-কাশী, বৃন্দাবন মথুরা-হরিদ্বার হৃষীকেশ ইত্যাদি তীর্থ ভ্রমণ করে বাঞ্ছিত কোনও গুরুর সন্ধান না পেয়ে আবার কলকাতা ফেরেন। তারপরই তিনি টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন। সুভাষ যখন রোগশয্যায়, তখন প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা।

১৯১৫ সালে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং দর্শন-শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি, এ ক্লাসে প্রেসিডেন্সি কলেজেই ছাত্রজীবনের পরবর্তী অধ্যায় শুরু। ইতিমধ্যে সন্ত্রাসবাদী বহু নেতার সঙ্গে পরিচয়। ইংরাজ অধ্যাপক ঈ, এফ, ওটেন সাহেব ভারতীয়দের উদ্দেশে কটুক্তি করায় সুভাষের প্রতিবাদ। তাঁরই নেতৃত্বে ছাত্র ধর্মঘট, ছাত্র

আন্দোলন এবং নানা উত্তেজনা। কলেজ কর্তৃপক্ষ ও বিদেশী শাসকদের রোষ পড়ল সুভাষের উপর। শাস্তিস্বরূপ কলেজ থেকে তিনি হলেন বহিস্কৃত।

কিছুদিনের জন্য আবার কটকে মা বাবার কাছে। কলকাতায় ফিরে স্যার আশুতোশ মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে পুনরায় কলেজে ভর্তির চেষ্টা। এবার স্কটিশচার্চ কলেজে ভরতির সুযোগ। একসঙ্গে পড়াশুনা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স ফোর্সে (টেরিটোরিয়াল আর্মি) যোগদান। ফোর্ট উইলিয়ামের কাছে ছিল তাঁর শিক্ষা শিবির। খাকি পোষাক, কাঁধে রাইফেল নিয়ে সৈনিক জীবনের হাতেখড়ি। সেই সুবাদে ফোর্ট উইলিয়ামে যাতায়াত। যুগপৎ ছাত্র ও সৈনিক জীবন। ১৯১৯ সালে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়ে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এই পরীক্ষায়ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার। পুঁথিগত বিদ্যা, সামরিক শিক্ষা এবং রাজনৈতিক সচেতনতার সমন্বয়ে তরুণ সুভাষচন্দ্রকে আরও উচ্চ-শিক্ষায় উদ্দীপ্ত করল। একসৃপেরিমেণ্টাল সাইকোলজি নিয়ে এম, এ ক্লাসে ভরতি। অবশেষে পিতা জানকীনাথ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎ বসুর পরামর্শে আই, এ, এস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বিলাত যাত্রা।

সুভাষচন্দ্রকে বিলাত পাঠানোর প্রস্তুতি যখন শেষ, তখন পাঞ্জাবের জালিলিওয়ানাবাগে নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সারা দেশে তীব্র উত্তেজনা। সেই পরিস্থিতিতেই ১৯১৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর সুভাষের উদ্বিগ্ন মনে লণ্ডন যাত্রা। এবং ক্যামব্রিজে ছাত্রজীবন শুরু।

১৯২০ সালের জুলাই, ক্যামব্রিজে ভরতির মাত্র দশ মাসের মধ্যে তিনি আই, এ, এস পরীক্ষায় বসলেন। ফল বেরুতে দেখা গেল সুকঠিন এই পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থানের অধিকারী।

আই এ এস পরীক্ষায় পাশ করেও বৃটিশ সরকারের অধীনে

কোন চাকুরী না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। লণ্ডন থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস আর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুকে চিঠি লিখে তাঁর মনোবাসনা ব্যক্ত। অগ্রজ শরৎচন্দ্রকে লণ্ডন থেকে লেখেন : সিভিল সার্ভিস পদ সবরকম ঐহিক সুখ এনে দিতে পারে। কিন্তু এইসব পার্থিব সুখ মানুষের আত্মার বিনিময়ে নয়,…জাতীয় এবং আধ্যাত্মিক উচ্চাশা কিছুতেই সিভিল সার্ভিস পদের নানাবিধ ব্যবস্থার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে সমান তালে চলতে পারে না।…

…যদি চিত্তরঞ্জন দাস বর্তমান এই বয়সে তাঁর সর্বস্ব ত্যাগ করতে পেরে থাকেন, এবং জীবনের সমস্ত রকমের অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে পেরে থাকেন, তাহলে আমার মতো একজন যুবক, নিশ্চয়ই যার সাংসারিক জীবনের কোনরকম পীড়াদায়ক দায়িত্বই নেই, সে নিশ্চয়ই সব কিছু ত্যাগ করতে অধিকতর সমর্থ হবে।…

আমার দৃষ্টির সামনে রয়েছে অরবিন্দ ঘোষের জীবনের উজ্জ্বল আদর্শ। আমি মনে করি, আমিও নিশ্চয়ই সেই আদর্শের অনুসরণ করে তেমনি সবকিছু ত্যাগ করতে পারি।

আমাদের একটি জাতি গড়ে তুলতে হবে। এবং একটি জাতি গড়ে উঠতে পারে শুধুমাত্র হ্যাম্পডেন ও ক্রমওয়েলের আপোষহীন আদর্শবাদ দ্বারা।

আমি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছি যে, এখন আমাদের বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ একেবারে বাতিল করে দেওয়ার সময় এসেছে।…

১৯২১ সালের ১৬ জুলাই। মাত্র তেইশ বছর পাড় হয়েছেন। বোম্বাই বন্দরে এসে ভিড়ল তাঁর জাহাজ! লণ্ডন থেকে পৌঁছেই সুভাষ বোম্বাই-এর লাবুরনুম রোডের বাসভবনে মহাত্মা গান্ধীর শরণাপন্ন হলেন। তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সারা ভারত তখন প্লাবিত। প্রবীণ গান্ধী আর তরুণ সুভাষের একান্তে অন্তরঙ্গ আলোচনা। গান্ধীজীর নির্দ্দেশে কলকাতা গিয়ে সুভাষের

দেশবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সেই থেকেই তিনি পরিপূর্ণ রাজনৈতিক নেতা।

১৯২১ সালের ১০ ডিসেম্বর। দেশবন্ধুর অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রও পুলিশের হাতে ধৃত। স্বদেশী করার অভিযোগে তাঁরা অভিযুক্ত। ছয় মাসের কারাজীবন প্রেসিডেন্সি জেলে।

১৯২২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে বন্যাত্রাণে এবং 'বাংলার কথা' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ। তার কিছুদিনের মধ্যে স্বরাজ্য দলের মুখপত্র ফরোয়ার্ড পত্রিকার ম্যানেজারের পদ গ্রহণ। ১৯২৪ সালের মার্চে দেশবন্ধু কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত। মাত্র ২৭ বছর বয়সে সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার পদে আসীন।

১৯২৪ সালের ২৫ অক্টোবর সুভাষচন্দ্র আবার ধৃত। পুলিশের সন্দেহ, সুভাষচন্দ্র দেশব্যাপী গোপনে বৃটিশ বিরোধী সংগঠন গড়ে তুলছেন। প্রথমে আলিপুর সেনট্রল জেলে, তারপর বহরমপুর হয়ে তাঁকে মান্দালয় জেলে পাঠানো হল। প্রায় আড়াই বছর বন্দীজীবন। অবশেষে ১৯২৭-এর মে মাসে স্বাস্থ্যের কারণে মুক্তিলাভ।

১৯২৮ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সহ বিশিষ্ট নেতাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র ইণ্ডিয়ান ইনডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠনে উদ্যোগী। এই বছর মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। এই বছরই কলকাতায় বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব, ১৯২৯-এর ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতবর্ষকে ডেমিনিয়ন স্টেটাস দিতে বৃটিশ সরকারকে রাজী হতে হবে। সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে সুভাষের দাবী, ডেমিনিয়ন স্টেটাস নয়, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হবে। ভোটাভুটিতে তরুণ সুভাষের প্রস্তাব বাতিল। তাঁর পক্ষে ভোট পড়ে ৯৭৩ এবং গান্ধীজীর পক্ষে ১৩৫০।

১৯২৯-এর ৩ সেপ্টেম্বর আবার গ্রেপ্তার। অভিযোগ, ১২ আগস্ট নিখিল বঙ্গ রাজনৈতিক নির্যাতিত দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা পরিচালনা এবং বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, সাম্রাজ্যবাদ শক্তি নিপাত যাক, ইত্যাদি ধ্বনি তোলা। ১৯৩০-এর ২৩ সেপ্টেম্বর আলিপুর সেনট্রাল জেল থেকে মুক্তি লাভ।

১৯৩০—কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত।

১৯৩১-এর ১৮ জানুয়ারী বহরমপুর থেকে মালদা যাত্রা। মালদায় তাঁর প্রবেশ নিষেধ করে আইন জারী। অমান্য করায় গ্রেপ্তার এবং সাতদিন মালদা জেলে হাজতবাস। মুক্তি পেয়েই কলকাতা প্রত্যাগমণ। ২৬ জানুয়ারী স্বাধীন দিবসের শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য কলকাতায় আবার ধৃত। ৬ মাস প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দীজীবন।

১৯৩২-এর ২ জানুয়ারী। বোম্বাই-এর সহরতলী স্টেশন কল্যানে গ্রেপ্তারবরণ। জব্বলপুর সেনট্রাল জেলে আটক। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মাদ্রাজে স্থানান্তরিত। তারপর উত্তর প্রদেশের বলরামপুর হাসপাতালে পুলিশ প্রহারায় শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ফুসফুস সম্পর্কিত রোগ ধরা পড়ায় অন্তরীণ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য সুভাষের ইউরোপ যাত্রা।

অনুমতি না নিয়ে কলকাতা প্রত্যাবর্তন করায় ১৯৩৪ সালে পুনরায় গৃহে অন্তরীণ। কিছুদিন পর বড় রকমের অপারেশনের জন্য পুনরায় ইউরোপ যাত্রা।

১৯৩৫ সালে রোমে এশিয় ছাত্র সংঘের অনুষ্ঠানে ভাষণ দান। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সাইনর মুসোলিনী। তারপর আয়রল্যাণ্ড সদর এবং আইরীশ নেতা ডি ভ্যালেরা সহ সেখানকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরিচিতি লাভ। সুভাষের বয়স তখন ৪০।

৮ এপ্রিল, ১৯৩৬। লণ্ডন থেকে জাহাজ যোগে ফিরার পর বোম্বাই বন্দরে পুনরায় সুভাষচন্দ্র ধৃত। সেখান থেকে আলিপুর সেনট্রাল জেল, কার্শিয়াং জেলে বন্দীজীবন যাপন। পুনরায় অসুস্থ হয়ে

পড়লে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত। ১৯৩৭ সালের ১৮ মার্চ মুক্তি।

১৯৩৮। গুজরাটের হরিপুরার কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত। কংগ্রেস সভাপতি রূপে সুভাষচন্দ্রের একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন। তিনি তাঁর উদ্বোধন করেন এবং সভাপতিত্ব করেন জওহরলাল নেহরু। পরের বছর সুভাষচন্দ্রের পুনরায় কংগ্রেস সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কিন্তু মহাত্মাজী তাতে অসম্মত। গান্ধীজীর বাঞ্ছিত প্রার্থী গান্ধীজীর অনিচ্ছা থাকা সত্বেও সুভাষের ডঃ পট্টভি সীতারামিয়ার সঙ্গে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এবং পরাজিত সীতারামিয়ার পরাজয়কে গান্ধীজী নিজের পরাজয় বলে ঘোষণা করলেন। জাতীয় কংগ্রেসে বামপন্থী এবং দক্ষিণ পন্থী রাজনীতির সূচনা।

কংগ্রেসে রাজনৈতিক বিরোধ সৃষ্টি। সব দিক খতিয়ে সুভাষচন্দ্রের অবশেষে সেচ্ছায় কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা।

১৯৩৯। মে মাসে কংগ্রেসের ভেতরে সুভাষের নেতৃত্বে বাম ঘেঁষা রাজনীতির সমর্থণে আলাদা একটি ব্লক সৃষ্টির কথা ঘোষণা। নতুন ব্লকেরনামকরণ হল ফরোয়ার্ড ব্লক। এ বছরই সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু। ফরোয়ার্ড ব্লকের সহায়তায় সুভাষচন্দ্রের দেশব্যাপী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের ডাক। বিশ্ব-পরিস্থিতির সুযোগে বৃটিশ শক্তিকে বিপর্যস্ত করে স্বাধীনতা লাভের সক্রিয় পন্থার চিন্তা শুরু।

২ রা জুলাই, ১৯৪০। পুনরায় গ্রেপ্তার বরণ। তাঁর বিরুদ্ধে ফের রাজদ্রোহের অভিযোগ। সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন, বৃটিশ রাজের দম্ভের জ্বলন্ত প্রতীক কলকাতা ময়দানের হলওয়েল মনুমেণ্ট ধুলিস্যাৎ করবেন। মহম্মদ আলি পার্কে বৃটিশ বিরোধী বক্তৃতা, ফরোয়ার্ড-ব্লক পত্রিকায় সরকার বিরোধী নিবন্ধ রচনা এবং মনুমেণ্ট ভাঙার জন্য শোভাযাত্রা পরিচালনার দায়ে বহু সহকর্মী সহ ধৃত।

আলিপুরে কারাজীবন শুরু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিস্তার ততদিনে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। বিশ্বরাজনীতি ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তার রাজনৈতিক সুযোগ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি। কারাগারে বসেই বলিষ্ঠ ঘোষণা: বেআইনীভাবে তাঁকে আটক রাখার নৈতিক অধিকার বৃটিশ সবকারের নেই। তার প্রতিবাদে আমরণ অনশন শুরু।

২৯ নভেম্বব থেকে ৫ ডিসেম্বর-১৯৪০। ৭ দিনের অনশনে সুভাষ কারাগারে অসুস্থ। বৃটিশ শাসকরা তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতিতে আতঙ্কিত। নানাভাবে তাঁকে খাদ্য গ্রহণের চেষ্টা ব্যর্থ। তারপব আলিপুরের প্রেসিডেন্সি জেল থেকে অসুস্থ সুভাষচন্দ্রকে শর্ত সাপেক্ষে এলগিন রোডের বাসভবনে স্থানান্তর এবং সেখানে গোয়েন্দা পুলিশ প্রহবায় অন্তবীণ বাখার কঠোর ব্যবস্থাবলম্বন।

১৯৪১, ১৭ জানুযাবী। মধ্যরাত্রেব কিছু পর এলগিন বোডের বাসভবন থেকে অতি সন্তপ ণে রহস্যজনকভাবে ধানবাদের উদ্দেশে গোপন যাত্রা।

২৬ জানুয়াবী, বৃটিশ ভারতের সীমা অতিক্রম। ঐ দিনই সর্বপ্রথম কলকাতার বাসভবন থেকে তাঁর রহস্যজনক অন্তর্ধানের সংবাদ প্রচারিত। ২৯ জানুয়ারী শরৎচন্দ্র বসুর উদ্দেশে উদ্বিগ্ন গান্ধীজীর তারবার্তা: আমি উদ্বিগ্ন—খবরের কাগজে বহস্যজনক সংবাদ পড়লাম। সঠিক খবরের জন্য উদগ্রীব। সত্বর জানান। রবীন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্র-প্রসাদ প্রমুখেরও মহা উদ্বেগেব সঙ্গে বিবৃতি প্রচার।

৩১ জানুয়ারী—সকালে কাবুলে উপস্থিত। ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিন থেকেই কাবুলের রুশ এবং জার্মান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু। ইতালীয় পাশপোর্ট সংগ্রহ, এবং আফগানিস্থান থেকে রাশিয়ার পথে ইউরোপ যাত্রার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

১৭ মার্চ কাবুলে শেষ দিন অতিক্রান্ত। সন্ধ্যায় ক্রেশিমির বাসভবনে নৈশভোজে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে উত্তমচাঁদ, ভগৎরাম তলওয়ার প্রমুখের

গোপন পরামর্শ।

১৮ মার্চ ১৯৪১, ভোররাত্রে কাবুল ত্যাগ—সীমান্ত পার হয়ে রাশিয়ার পথে যাত্রা। ২০ মার্চ রাশিয়ায় পদার্পণ। জার্মান পথপ্রদর্শক ডঃ ওয়েলারের সহায়তায় মস্কোর উদ্দেশে যাত্রা শুরু। ২৭ মার্চ সুভাষচন্দ্রের মস্কোয় উপস্থিতি। আগে থেকেই তিনি মস্কোর সহায়তার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এবিষয়ে কাবুলের রুশ দূতাবাসের সঙ্গেও যোগাযোগ করে আসেন। কিন্তু মস্কোয় কোন রকম সাহায্য ও সহায়তার প্রতিশ্রুতি আদায়ে ব্যর্থ। একদিন এক রাত্রি অপেক্ষা করেও যখন কোনোরকম আশার আলো দেখতে পাননা, তখন সুভাষচন্দ্র তাঁর পরবর্তী পরিকল্পনার কাজে এগিয়ে যান—২৮ মার্চ মস্কো থেকে বিমান যোগে জার্মানীর বার্লিনে গিয়ে পৌঁছান।

জার্মানীতে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু। মার্চ-এপ্রিল-মে এই তিন মাস সরকারী পর্যায়ে নানাভাবে যোগাযোগ। ১৯৪১-এর ২৯ মে, জার্মানীর বিদেশমন্ত্রী হিটলারের সহযোগী বিরেনট্রাপর সুভাষচন্দ্রকে সর্বপ্রকার সাহায্যের সহযোগীতার প্রতিশ্রুতি দান। ১৯৪১-এর অক্টোবর। বার্লিনে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম শুরু। ২ নভেম্বর তাঁর প্রথম বৈঠক। ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব। বৈঠকে চারটি সিদ্ধান্ত।

(ক) জয়হিন্দ হবে ভারতের মুক্তি যোদ্ধাদের রণধ্বনি (খ) জাতীয় নেতা সুভাষচন্দ্র বসু হবেন নেতাজী রূপে অভিহিত (গ) 'জনগনমণ' হবে ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত এবং (ঘ) স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা হবে হিন্দুস্থানী।

১৯৪১-এর ডিসেম্বর। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিস্তার। বিশ্বযুদ্ধে জাপানের যোগদান।

২৪ ডিসেম্বর। ভারতবাসীর উদ্দেশে নেতাজীর বক্তৃব্য প্রচারের জন্য বেতারকেন্দ্র খোলার অনুমতি লাভ।

২৫ ডিসেম্বর। বার্লিনে সকল প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারে সভা। ফ্রানকেনবার্গে সামরিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত ভারতীয় জওয়ানদের প্রথম দলকে বিদায় সম্বর্দ্ধণা।

২৬ ডিসেম্বর। আনহলটার রেল স্টেশনে বার্লিনে বসবাসকারী ভারতীয়দের জমায়েত। ফ্রানকেনবার্গের উদ্দেশে যাত্রাকারী তরুণ জওয়ানদের বিদায় অনুষ্ঠান। সাশ্রুনয়নে নেতাজীর ঐতিহাসিক ভাষণ দান ও বিদায় অভিবাদন জ্ঞাপন।

৭ জানুয়ারী-১৯৪২—বার্লিনে নেতাজীর তত্বাবধানে আজাদ হিন্দুস্থান বেতার কেন্দ্রের কাজ শুরু।

৮ ফেব্রুয়ারী। সিঙ্গাপুরের পতন। জাপ সেনাদের কাছে বৃটিশ বাহিনীর আত্মসমর্পণ। বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় জওয়ানদের পৃথকীকরণ এবং ১৭ তাবিখে ফারার পার্কে ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান বৃটিশ সেনাপতির কাছ থেকে জাপ সমরনায়ক মেজর ফুজিয়ারা কর্তৃক ধৃত ভারতীয় জওয়ানদের দাযিত্বভার গ্রহণ এবং একই অনুষ্ঠানে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের প্রতিনিধি ক্যাপটেন মোহন সিং-এর হাতে তাদের দায়িত্বভার অর্পণ।

২৭ ফেব্রুযাব—বার্লিনের আজাদ হিন্দুস্থান বেতার কেন্দ্র থেকে নেতাজীর ঐতিহাসিক ভাষণদান। বৃটিশ বাহিনীর গর্বের দুর্গ সিঙ্গাপুর পতনের পটভূমিকায় বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের জন্য ভারতীয়দের উদ্দেশে আহ্বান।

যুদ্ধের গতি এবং জাপানের অগ্রগতি খতিয়ে দেখে নেতাজীর ভারতবর্ষের মুক্তি অভিযানের জন্য তাঁর পূর্ব এশিয়ায় উপস্থিতি প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি। বার্লিনের জাপ রাষ্ট্রদূত ওসীমার সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন এবং পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা জাপান সরকারের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ শুরু।

২০ এপ্রিল। পুনরায় বেতার ভাষণ। দেশবাসীর উদ্দেশে নেতাজীর আহ্বান: ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়। ১৯৪২

হোক তার শেষ স্বাধীনতা যুদ্ধ।...

২৮ জুন। হিটলারের সঙ্গে নেতাজীর সাক্ষাৎ। নেতাজীর ব্যক্তিত্ব-দেশপ্রেম ও বীরত্বে হিটলার মুগ্ধ।

১৯৪২-এর জুন মাসে ইউরোপে গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশে নেতাজীর নির্দ্দেশ তেরাঙা পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে মাতৃভূমির মুক্তি সংগ্রাম করতে হবে।...

৮ ফেব্রুয়ারি—ভোরে বার্লিনের লেহর্টাব বানহোক থেকে কীল বন্দর গামী ট্রেনে যাত্রা শুরু। তার আগে মেজদা শরৎচন্দ্র বসুর উদ্দেশে পত্র রচনা।

৯ ফেব্রুয়ারি—খুব ভোরে কীল এর এক হোটেলে তাঁর ঘুম ভাঙল। সাবমেরিনের নির্দ্দিষ্ট ক্যাপটেন খুব ভোরে এসে হাজির। নেতাজীর সঙ্গে উইলহেলম্ কেপলার, নাম্বিযার, ওয়ার্থ এবং আবিদ হাসানের সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত যাত্রা। নেতাজী আবিদ হাসানকে সঙ্গী করে সাবমেরিনে চাপলেন। তারপর চোখের পলকে তাঁদের নিয়ে মহা সমুদ্রের অতলে তা' তলিয়ে গেল। শুরু হ'ল দুঃসাহসিক অভিযান —ইউরোপ ছেড়ে এশিয়ার পথে যাত্রা। প্রায় সাড়ে তিনমাসব্যাপী গোপন এই সাবমেরিন যাত্রায় প্রথমে ম্যাদাগাসকার উপকূল, সেখান থেকে অপেক্ষামাণ একটি জাপ সাবমেরিনে চেপে মালয়ের পেনাং যান। পেনাং থেকে বিমান যোগে জুন মাসের গোড়ায় জাপানের টোকিওতে পৌঁছোন। ১৯৪৩-এর জুন। টোকিও রেডিও নেতাজীর জাপান উপস্থিতি ও গভীর অভ্যর্থণা লাভের সংবাদ প্রথম ঘোষণা করে ২১ জুন টোকিও রেডিও থেকে সর্বপ্রথম নেতাজীর ভাষণ প্রচার।

জার্মানী থেকে জাপান যাত্রার গোপন প্রস্তুতি। প্রকাশ্যে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের কাজকর্ম ও প্রস্তুতিপর্ব অব্যাহত। নেতাজীর সম্ভাব্য পূর্ব এশিয়া যাত্রার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ গোপণ রাখা হল।

ডিসেম্বর-১৯৪২। সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে দেখতে নেতাজীর ভিয়েনা

যাত্রা। পুনরায় বার্লিন প্রত্যাবর্তন। ইতিমধ্যে দঃ পূর্ব এশিয়ার পথে জাপান যাত্রার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৯৪৩। জানুয়ারির গোড়ায় নেতাজীর নির্দ্দেশে ভিয়েনা ছেড়ে বার্লিন আগমন। স্ত্রী এমিলির সোদিয়েন স্ট্রাসের বাসভবনে নেতাজীর অবস্থান।

২৩ জানুয়ারি, ১৯৪৩। নেতাজীকে ঘিরে তাঁর জন্মদিনের অনুষ্ঠান। হাতে আঁকা দেশবন্ধুর একটি ছবি নেতাজীকে উপহার দান।

২৬ জানুয়ারি—বার্লিনের এয়ারফোর্স হাউসে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান। প্রবাসী ভারতীয় ও জার্মানীর বিশিষ্ট ব্যক্তি-বর্গের উপস্থিতি। জার্মান ভাষায় নেতাজীর ভাষণ দান।

২৮ ফেব্রুয়ারি—কয়িনস্‌ব্রুকের শিবিরে আজাদ হিন্দ সৈনিকদের সমাবেশে নেতাজীর ঐতিহাসিক ভাষণ। তিনি জানতেন এটাই ছিল তাদের কাছে তাঁর শেষ বক্তৃতা। তিনি তা' গোপন রাখেন। ভাবাবেগে তিনি পনের মিনিটের স্থলে ছু'ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা করেন এবং শেষে অভিবাদন গ্রহণ করেন।

জাপ প্রধানমন্ত্রী তোজো সহ জাপ সামরিক অফিসারদের সঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। নেতাজীকে স্বাগত জানাতে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সিঙ্গাপুর থেকে টোকিও উপস্থিতি। রাসবিহারীর সঙ্গে নেতাজীর সিঙ্গাপুর যাত্রার জন্য ১ জুলাই—১৯৪৩ নির্দ্দিষ্ট। দুই ইঞ্জিনের একটি বিশেষ জাপ বিমানও নেতাজীর যাত্রার জন্য প্রস্তুত। নেতাজীর এই ঐতিহাসিক সিঙ্গাপুর যাত্রার সঙ্গী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন রাসবিহারী বসু, নেতাজীর সহযোগী সচিব আবিদ হাসান, কর্নেল ইয়ামামোটা প্রমুখ।